

উত্তম মাধ্যম

সংস্কৃতির আনাচেকানাচে বিহার করলেন

চন্দ্রিল ভট্টাচার্য



উত্তম মাধ্যম

চন্দ্রিল ভট্টাচার্য



প্রতিভা স □ কলকাতা

UTTAM MADHYAM
collection of newspaper columns
by Chandril Bhattacharya

কপিরাইট

চন্দ্রিল ভট্টাচার্য

প্রথম প্রকাশ

বইমেলা জানুয়ারি ২০০৯

প্রকাশক

বীজেশ সাহা

প্রতিভাস

১৮/এ, গোবিন্দ মণ্ডল রোড

কলকাতা- ৭০০০০২

দূরভাষ : ২৫৫৭-৮৬৫৯

মুদ্রক

বইপাড়া পাবলিকেশনস্ (প্রিন্টিং বিভাগ)

১৮/এ, গোবিন্দ মণ্ডল রোড

কলকাতা- ৭০০০০২

দূরভাষ : ৬৫৪৪৮৯৮

প্রচ্ছদ

উপল সেনগুপ্ত

দাম

২০০ টাকা

উৎসর্গ

চার্লি চ্যাপলিন

আমাদের প্রকাশিত লেখকের অন্য বই
ধূর ধূর এ পরবাসে কে থাকবে

উত্তমমাধ্যম প্রথম বেরিয়েছিল ১৩ এপ্রিল, ২০০৩। শেষ বেরোয় ১৬ মার্চ, ২০০৮। তিন সপ্তাহ অন্তর প্রকাশিত হত, কিছু এদিক ওদিক হয়ে, মোট ৬৩টি বেরিয়েছে। প্রতিটিই এখানে সংকলিত হল। ‘সংস্কৃতি’ কথাটিকে সাধারণত আমরা যেমন বুঝি, তার চেয়ে কিঞ্চিৎ প্রসারিত অর্থে ধরে, কিছু সামাজিক নীতি ও প্রবণতারও সমালোচনা করা হয়েছে। ‘আনাচেকানাচে বিহার’ কথাটার মধ্যে তার দ্যোতনা গোড়া থেকেই ছিল। কিন্তু সিনেমা, সিরিয়াল, বিজ্ঞাপন বা সমাজবথেড়া— কোনও কিছুই শংসা/নিন্দে তক্ষুনি-তক্ষুনি পড়ার যে আমোদ, দিন-মাস-বছরের ব্যবধানে তা অনেকটাই মিইয়ে যেতে বাধ্য। সুতরাং, সাম্প্রতিকতা-আক্রান্ত লেখাগুলি নিজগুণে পড়বেন, প্রার্থনা।

কৃতজ্ঞতা

আনন্দবাজার পত্রিকার ‘রবিবাসরীয়’ যখন নতুন করে সাজানো হচ্ছে, আমার ঊর্ধ্বকর্তা রংগন চক্রবর্তী আমাকে বলেন একটি মাসিক ‘মিডিয়া রিভিউ’ কলাম লিখতে। নামটাও উনিই দেন : উত্তমমাধ্যম। মজ্জাগত আলস্য ও ভীকৃতাবশে আমি কিঞ্চিৎ ‘ন্যা ন্যা’ বাগালেও, রংগনদা তা উড়িয়ে দেন ও ‘লেখ বলছি!’ অনুজ্ঞায় আবদ্ধ করেন। কলাম প্রকাশিত হওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দুর্বোধ্যতা, অবিনয়, চালবাজি, দেখানেপনা, বৃক্ষপাকামির অভিযোগ সবেগে উত্থিত হয় ও সম্পাদকীয় বিভাগের প্রধান (ফের আমার ঊর্ধ্বকর্তা) অনির্বাক চট্টোপাধ্যায় এ সব কিছুরকে আদৌ আমল না দিয়ে, পরম ও স্থিত প্রশ্রয়ে আমাকে আমার খেলা খেলতে দেন। এমনও হয়েছে, কোনও লেখা-জনিত অশান্তির আঁচ উনি পূর্ণ নিজগায়ে নিয়েছেন, আমাকে তার আভাস দিয়েছেন মাত্র। আর রংগনদা তো হেডিং থেকে ছবি-বাছাই, শব্দসাপ্লাই থেকে ছন্দমিলন— যেখানেই ধন্দে পড়ে কাতর চাউনি হেনেছি, তক্ষুনি ত্রাণ করেছেন। রংগনদা না থাকলে উত্তমমাধ্যম কোনও দিন লেখা হত না, অনির্বাকদা না থাকলে কোনও দিন ছাপা হত না।

এঁরা ছাড়া, প্রতিটি উত্তমমাধ্যম মুদ্রণের আগে এক জন পড়েছেন ও ওই কলামের মতোই পটাং পটাং হল হাঁকিয়েছেন। তাঁর ‘প্রথম প্যারাটা জঘন্য’, ‘শেষটা তো কিস্যু হয়নি’, ‘এ বোঝে কার বাবার সাধ্য’ খুবই কাজে এসেছে। আমার সেই অবৈতনিক কিন্তু অপরিহার্য উপদেষ্টা সঞ্চারী মুখোপাধ্যায়কে কৃতজ্ঞতা জানাই।

বরাদ্দ জায়গা যতটা ছিল, সাধারণত আমি তার দ্বিগুণ ত্রিগুণ লিখতাম। কাটতে কাটতে যখন জিভ বেরিয়ে গেছে, ছবি যথাসম্ভব ছোট করে লেখাটা আঁটিয়ে দেওয়ার আকুল আর্জি নিয়ে ডিজাইনারদের কাছে হাজির হতাম। সেই প্রভূত অন্যায় আদার যাঁরা প্রায়ই মেনেছেন, সেই ইন্দিরা বসু ও প্রবীর দাস-কেও কৃতজ্ঞতা।

চন্দ্রিল ভট্টাচার্য

সূচীপত্র

নাকের বদলে অস্কার পেলাম	১৩	ডগ বাছতে গাঁ উজাড়	৪১
কাঁটা হেরি ক্ষান্ত কেন	১৬	ছিঃ, ঐ, ঐ২	৪৪
কায়াহীনের কাহিনি	১৯	শুচিবায়ু বয় বেগে	৪৭
কোথাও গোপন কোথাও ওপন	২২	যাঁহা বাহান্ন তাঁহা ছাপ্পান্ন?	৫০
শুধু গয়না দিয়ে হয় না	২৫	পোজিশন ধর্মজিরাফ	৫৩
রে পালোয়ান, দর্শনের আলো আন	২৮	ইঙ্গমার ও বঙ্গমার	৫৬
বিশ্ববীণা 'বি ফ্ল্যাট'-এ বাজে	৩২	চোপ! কলচর চলছে	৬০
বালি, কালী, অল ইন ফ্যামিলি	৩৫	কীসে আর ক্লিশে!	৬৩
ফোক শ্লোক কোক শাস্ত্র	৩৮	হেরোর কী গেরো	৬৬

রং মানেই রাইট?	৬৯	কিছু রগরগে কিছু রুগরুগে	১০৪
ওহে মনস্টারতম	৭৩	মুখ্য হতে দুঃখু কই?	১০৮
ভূতের ভূত? ধুত!	৭৬	হও হে সাধ্যখোলা	১১১
বড়দা-ঘাতক স্পর্ধা	৭৯	খুচখাচ গপশপ	১১৫
জোর বাজার = মিডিয়োকার	৮২	বাঙালি বাথরুম যায় না	১১৮
পুল সে পুশ-তক	৮৫	দুই হজুরের গপ্পো	১২১
মরবে ইঁদুর বেচারী	৮৮	সন্দীপন পাঠশালা	১২৫
হও হে ডেঞ্জারসিক	৯১	হেজিমনি-মাসিমনি	১২৮
যদি বলি মন + হরমোন	৯৫	বহুরূপে সম্মুখে তোমার...	১৩২
জয়তু বাঙালিস্তান	৯৮	যে জন ছকের বাহিরে	১৩৫
কাঁচিমাঝা কেরানি	১০১	ডেমোক্রেসি টিভির ডিম	১৩৯

কান আজি দু'কান কাটা	১৪২	পেছনে নেকড়ে? ১৭৭
বিশ্বকাপাকাপি	১৪৫	ধার করা ধারালো ১৮১
কাজু-ক্রিশমিশ	১৪৮	১ ডিলান ৭ অ্যাক্টো ১৮৪
তোমার সহি কই?	১৫১	কবি সে দোকলা কাঁদে ১৮৮
পুজোয় গাঁধী মুন্না চড়ে	১৫৪	সোলি দেও গ্লোরিয়া ১৯১
জোলি কে পিছে	১৫৭	সিরিয়ালের বাচ্চাকাচ্চা ১৯৫
ঔচিত্য, বউ-চিত্ত	১৬১	সকলকে পুজোর :-) ১৯৮
হাবিজাবি মনখারাবি	১৬৫	কলার তোলা ছবি ২০১
প্লুটো জগন্নাথ	১৬৮	মৌল বাদানুবাদ ২০৪
গুডাগার্জেন	১৭১	হ্যাপ্পি হাতাহতি ২০৭
এই অ্যাক পুরাতন	১৭৪	ন্যানোতম ক্যালি নেই! ২১০

রশোমনকেমন ২১৩

না কে র ব দ লে অ স্কা র পে লা ম

নাক ডুমা ডুম ডুম। বলছেন নিকোল কিডম্যান। এ বছর ‘সেরা অভিনেত্রী’র অস্কার পেলেন। অস্কার অবশ্য আপাতদৃষ্টিতে ছোটপর্দার কেউ না, কিন্তু বড়ভাইয়ের পার্বে স্টার মুভিজ, এইচ বি ও-র তুর্কি নাচন দেখলেই সে ভুল আছড়ে ভাঙবে। অস্কারপ্রদান দেখানো হল সরাসরি, পরেও রিপিট, মাইকেল মুর কর্তৃক বুশের মুণ্ডপাতের চেয়ে অধিক চক্ষু চড়কগাছ হল নিকোল মহোদয়ার নাকের আখ্যানে। এমনিতে অস্কার পাওয়ার একটি মেড-হজি আছে। প্রায় প্রতি বছরেই লেগে যায়। কোনও না কোনও ভাবে প্রতিবন্ধী/ব্রাত্য/অস্টেবাসীর রোলে অভিনয় করুন। প্যারালিসিস রোগী, পাগল, ড্রাগখোর, এড্‌স-আক্রান্ত, নিদেন পক্ষে বেশ্যা, থুড়ি, যৌনকর্মী। না পারলে, বাস্তব জীবনে আনুন মেগা-সাইজ বঞ্চনা। গতবারের অস্কার অনুষ্ঠানকে পলিটিকালি ইনকারেক্ট শয়তান নিন্দুকগণ ‘কৃষ্ণগঙ্গ উন্নয়ন প্রকল্প’ বলেছিলেন, সব প্রধান পুরস্কারই অ্যাফ্রো-আমেরিকানদের কুক্ষিগত হওয়ায়। সত্যি, সিমপ্যাথির চেয়ে বড় লোভ আর আছে?

আমাদের নিকোল দেবী এমনিতে তো সর্বার্থে সম্পন্না, কিন্তু প্রাণবল্লভ টম ক্রুজ জোর করে ডিভোর্স করে দিলেন ২০০১ সালের গোড়ার দিকে, তখন তিনি আবার গর্ভিণী। অনেক কাকুতি করেছিলেন, নির্বিকার ক্রুজ-বাবাজি তখন পেনিলোপে ক্রুজ-এর কোমর জড়িয়ে পদবি-তুতো প্রেমের একেবারে চরকিবাজি লাগিয়ে দিয়েছেন। মনোবেদনায় মিসক্যারেজ হয়ে গেল। তার পর ‘দ্য আওয়ার্স’ ছবিতে মেক-আপ শিল্পীদের বদান্যতায় নাক-পরিবর্তন! কৃত্রিম নাসিকা পরে আজ অবধি কেউ বিদগ্ধ অভিনয় করেছেন কি না হু নোজ, কিন্তু নিজের নাক কেটে নিজের যাত্রা-রঙ্গ এমত কেউ রচেন বলে মনে তো পড়ে না। দু’খানি নাক বাতিল করে এই তৃতীয় নাসানির্বাচন, প্রতি দিন আড়াই ঘণ্টা লাগত শুধু বস্তুটিকে সেট করতে। পরিত্যক্ত বউ, ভূণভ্রষ্ট মা, নাসারিক্ত অভিনেত্রী, দেখান তো মশাই হেন কন্সনেশন! চোখের জলের অ্যাফ্রোডিসিয়াক কখনও মার যাবে না মাঝারিয়ানার উদযাপনে। সৌরভ ভাল খেললে যেমন তাঁর মেয়ে বড় পুতুল পায়, তেমনই নাক-উঁচু স্বামীর দুর্ব্যবহারের কম্পেনসেশন দেয় অ্যাকাডেমি অব মোশন পিকচার্স।



সারা মাসব্যাপী অস্কারজয়ী ছবি দেখানোর মহোৎসব হল স্টার মুভিজ আর এইচ বি ও-তে, বিগত দিনের ছবিগুলি এখন কিঞ্চিৎ ধীর মনে হয়। তবু ‘একজরসিস্ট’ বা ‘ফরেস্ট গাম্প’ মাঝে মাঝেই দেখতে পাওয়ার চেয়ে বড় আশীর্বাদ

আর কী আছে? তবে ছোটবেলায় ‘বেন-হর’ পড়ে বড়বেলায় ক্রমাগত ‘বেন-হার’ বলতে বড় অস্বস্তি ঘটে। যাকগে, যিশুকে আগাগোড়া পিছন থেকে দেখিয়েছে, সে চমক তো চিরকালীন?



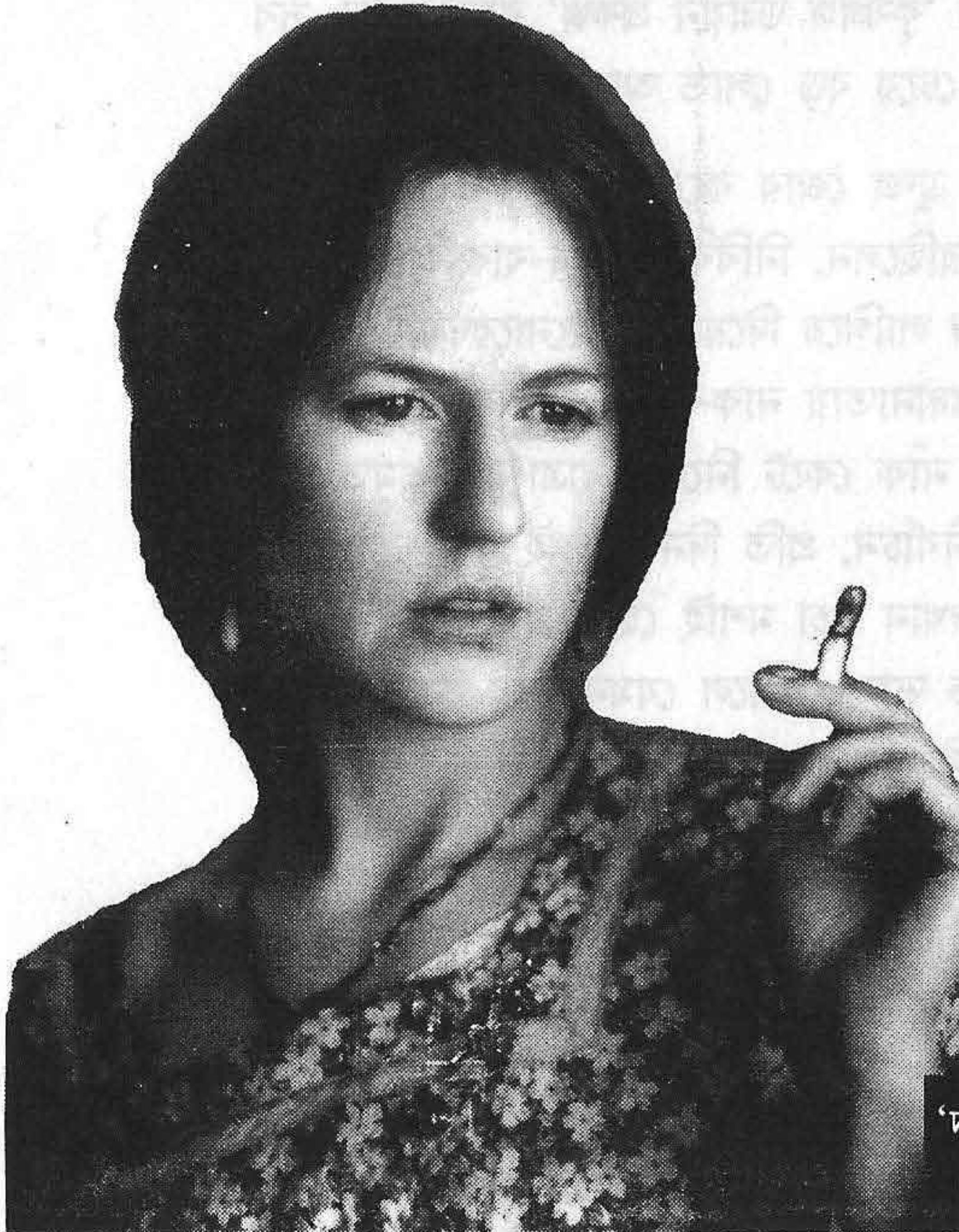
একতা কপূরকে রক্ষণশীলতার ধ্বজাধারী বলতে কারও কলম কাঁপে না, ও দিকে তুলসী যে মঙ্গলসূত্র ছিঁড়ে ফেলেছে সে খবর রাখেন? বিয়ের পঁচিশ বছর পূর্তি পালন করতে গিয়ে সে বেচারির ফুটি হবে কী, স্বামী যে কুড়ি বছর ধরে দ্বিচারণের আন্তর্জাতিক চক্রান্ত হাসিল করছেন। অষ্ট্রেলিয়ায় তাঁর সমান্তরাল সংসারের কথা জানাজানির জেরেই তুলসীর সাক্ষ্য বিদ্রোহ, মন্দিরপ্রাঙ্গণে হোমাগ্নি নির্বাপণ এবং থরোথরো লেকচার শেষ হতেই হাততালি বাজাতে বাজাতে প্রবেশ স্বামীর ও-পক্ষ পুত্রের এবং তার নাম, কী আবার, করণ! ‘স্বাভিমান’-এর কথা মনে পড়ে যায়, দুনিয়ার পরিত্যক্ত পুত্রদের বেদব্যাস যে কী হাল করে দিয়ে গেলেন। একটি বই নাম মোর নাই রে। একতা দেবী জিন্দাবাদ, একে তো তাঁর চম্পুকাব্যে মোচড়ের অভাব নেই, তদুপরি এ দেশে সীতা-সাবিত্রীর পরেই সর্বাধিক রেটিংযুক্ত নারী স্বহস্তে বিবাহচিহ্ন করিল ছিন্ন! এক পুণ্য রাত্রির সাড়ে দশটায় নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার অধিকার শেষাবধি দিলেন এক নারীই, দুষ্ঠু লোকেরা যাঁকে অ্যাডিন বলত বিজেপি।



সি টি ভি এন কিন্তু টিভি-টেলিফোনে এমন বিয়া দিয়েছে, মূর্তি তার যুগলসন্মিলনে নিত্য সুপারহিট। চিত্ররূপময় এফ এম যেন বা। সকল ধরনের বিশেষজ্ঞ স্টুডিয়োতে পালা করে হাজির, ফোন-ইন করে আপনি সমস্যার কথা জানালেই হাতে-গরম সাজেশন। চুল পড়ে যাচ্ছে কিংবা ফেং-শুই মতে টেবিল সাজাতে চান, কুস্ত লগ্নে জন্মে এ বছর ব্যবসায় ঝাঁপাবেন কি না, টিভিতে সংবাদপাঠের জন্য কেমনে গলা কাঁপাবেন, রেইকি কী ভাবে ভ্যানিশ করবে হাড়জ্বালানে কোমরব্যথা, মুশকিল-আসানের এই হটমেলা দারুণ জনপ্রিয়, উপযোগীও বটে।



‘খোঁজখবর’ প্রাণপণ প্রগাঢ় অনুষ্ঠান। পয়লা এপ্রিলের এপিসোডে কৃষ্ণকিশোরবাবু পাড়লেন এক ভারী কথা, বাস্তু-ফেং শুই-জ্যোতিষ আদি জনপ্রিয় শাস্ত্রগুলি



‘দ্য আওয়ার্স’-এ নিকোল কিডম্যান, নকল নাক পরে

অবৈজ্ঞানিকতার দায়ে নির্বাসিত হচ্ছে, নিষিদ্ধ করে দিচ্ছেন পশ্চিমবঙ্গ সরকার। যথারীতি উত্তেজক ও তীক্ষ্ণ প্রোগ্রাম হল, ক্যামেরা আক্রমণের মহড়াও বাদ গেল না, থানাপুলিশ অবধি অনায়াসে গড়াল এবং পর্ব শেষ হলে নিজস্ব ভঙ্গিতে কৃষ্ণবাবু ভাঙলেন, ইহা ছিল এপ্রিল ফুল। সকলেই স্তম্ভিত ও হরষিত। ওই দিন স্টার স্পোর্টস-এর ‘স্পোর্টসলাইন’ অনুষ্ঠানেও অনুরূপ কাণ্ড, সেখানে বলা হল লালুপ্রসাদ যাদব হয়েছেন ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের প্রেসিডেন্ট। এমন সিরিয়াসলি মশকরা করার জন্য এঁদের শতক সাধুবাদ প্রাপ্য, মাইক দেখলেই যে জাতির গালফোলা গান্ধীর্যের বান ডেকে যায় তাঁদের রামগরুড়পনা কিঞ্চিৎ কমলে মঙ্গল।



দর্শকামীদের জন্য দারুণ সুখবর, বাংলা চ্যানেলগুলো শুরু করল প্রাপ্তবয়স্ক উঁকিঝুঁকি। এ বলে ‘একান্ত গোপন’ তো ও বলে ‘চুপিচুপি’। রাত্তিরের দিকটা আর কেবল চ্যানেলের অনুগ্রহে বাঁচতে হবে না, আমাগো নিজস্ব মজা বিকশিত হতিছে। অচিরেই লালপাড় বিকিনি পরা বঙ্গললনাগণ নববর্ষের আবাহন করবেন, এ দৃশ্যের কল্পনায় হৃদপিণ্ড দ্বিগুণ ধাবমান।



পিঁপড়ের পেট টিপে গুড় বের করার মতো চিতাবাঘের গলা হাঁটকে এঁটো ‘মাউন্টেন ডিউ’ বের করার অ্যাড কিংবা তাকে ব্যঙ্গ করে ঝাড়ি কে পিছে ‘ডু’ সারার স্পাইটীয় উইটকে টপকে টিভির কোল জুড়ে এল বিবেক ওবেরয়-ঐশ্বর্য রাই খচিত কোকা কোলার বিজ্ঞাপন। তাঁদের কেচ্ছারঞ্জিত কেমিস্ট্রি দেখার অনুভূতি বোঝাতে পারে শুধু আর এক বারংবার বিজ্ঞাপনের স্লোগান: ‘হুরিবাবা!’

১৩ এপ্রিল, ২০০৩



কাঁটা হেরি ক্ষাত্ত কেন

শেফালি জরিওয়ালা নাম এখনও যাঁরা শোনে ননি, তাঁদের জ্ঞাতার্থে বলি, শুধু এক প্যান্টালুন-নির্মাতা দর্জির ভুলে এই নয়া মিস শেফালি রক্ষণশীল ভারতের ব্যারিটোন গ্রীবায একটি সুচারু ও মোক্ষম কাঁটা ফুটিয়ে ছেড়েছেন। ‘কাঁটা লগা’ নামক রি-মিক্স গানটির মিউজিক ভিডিয়োয় উনি যে প্যান্ট পরে নাচেন, তা অত্যন্ত হিসেবি অনবধানে কোমর থেকে পিছলে কিঞ্চিৎ নীচে নেমে টাইট ও থিতু, নিম্নাঙ্গের অন্তর্বাসটিও, সুতরাং, আংশিক দৃশ্যমান। এই নিয়েই ভয়াবহ তর্ক, ছিছিষ্কার এবং শেষমেশ মিউজিক ভিডিয়ো সেন্সর করার সিদ্ধান্ত অচিরে লাগু হওয়ার সম্ভাবনা। কিন্তু চোখ খোলা রাখলে বোঝা যাবে, ইদানীং প্রায় সমস্ত মিউজিক ভিডিয়োতেই ভারতীয় নারীরা তাঁদের ধড়ফড়ে ও সতেজ যৌনতার তুলকালাম উদযাপন করছেন। আমার শরীরের দুর্দান্ত আবেদন কোনও জড়োসড়ো সংকোচের ব্যাপার নয়, বরং তা আমার গৌরব এবং নির্ঘাত ব্যবহার করব ধারালো গুপ্তির মতো, এই অপরাধবোধহীন সরাসরি ঘোষণা ক্রমাগত মধ্যবিত্ত বেক্ষপনার কলজে শুকিয়ে দিচ্ছে। নারী যদি অকুণ্ঠায় পর্নোগ্রাফি পড়তে শুরু করে, তা হলে গৃহদেবতার কুলুঙ্গিটি অবধি নড়ে উঠবে যে। অশালীনতার মাপটাও ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। ‘বাবুজি জরা ধীরে চলো’ ভিডিয়োতে ইয়ানা গুপ্তা টান মেরে এক নৃত্যরত পুরুষের বারমুড়া খুলে দেন (ভেতরে আন্ডারওয়্যার ছিল, ভয় নেই), ‘মেরি সোনি/আ যা পিয়া’-তে শাইলা লোপেজকে পুরুষসঙ্গী শাড়ি পরতে সাহায্য করেন বিপজ্জনক ঘনিষ্ঠতায়, ‘চড়তি জওয়ানি কেচাপ মিক্স’-এ এক জন পরীর নিতম্ব ভূষিত করে স্রেফ একটি ফুলকাটা স্বচ্ছ আবরণ। উক্ত অঙ্গ ক্যামেরার সামনে সাড়ম্বরে আন্দোলিতও হয়। তা হলে ‘কাঁটা’র বেলায় এত হৈ-হুল্লোড় কেন? অন্তর্বাসটি দেখা যাচ্ছে বলে? সম্ভবত ওই বস্ত্রটি আদৌ না পরলে এত গগুগোল হত না। কালে কালে যদি এ দেশে কেউ অন্তর্বাসটিকে উন্টে আদত পোশাকের উপর বহির্বাস হিসেবে ব্যবহার করতে শেখেন, যা নাগাড়ে করে থাকেন ম্যাডোনা ও অরণ্যদেব, তা হলে সেন্সর বোর্ডের কর্তারা কেমন ছাদের সমান লাফ দেন দেখার ইচ্ছে রইল।



ভয়াবহ গরম পড়েছে এবং একইসঙ্গে সত্যজিৎ ও রবীন্দ্রনাথ পুজোর মরসুম। অনেকেরই মাথা গুলিয়ে গেছে। ই-টিভি তো ‘দুই মহা-পরিচালক’ বলে সত্যজিৎ রায় ও স্বপন সাহাকে বারংবার প্রোমোর মাধ্যমে একাসনে বসিয়ে, পালা করে আজ ঐর তো কাল ওঁর ছবি দেখিয়ে উভয়কে একই প্যাকেজবন্দি করে উত্তরাধুনিক চ্যানেল হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত

করেছেন। এর আগেও ঋত্বিক ঘটক ও অঞ্জন চৌধুরীকে একসঙ্গে জুড়ে সমান তামাশা ঘটিয়েছেন তাঁরা। অবশ্য আপত্তির কী আছে, সকলেই বাজারের জন্য ছবি করেন, এ বার তোমার বিনোদন তুমি বেছে নাও। নিঃশর্ত মার্কেটবশ্যতার কালে সকলই পণ্য, নিখাদ আর্ট বা আঁতলেমোর জন্য অযথা সম্মান বরাদ্দ রাখাই গাড়লপনা, কুসংস্কার। এই সত্য উপলব্ধি ও প্রচারের জন্য ওঁদের অবিলম্বে সেমিনারে নিয়ে গিয়ে সম্বর্ধনা দেওয়া উচিত, একটি করে ‘এক মলাটে রবীন্দ্রনাথ ও শোভা দে-র বাছাই রচনাসংগ্রহ’ উপহার দিতে হবে কম্পালসরি পুষ্পস্তবকটির সঙ্গে। সত্যজিৎ বেঁচে থাকলে বোধহয় উদাস হয়ে পাইপ কামড়াতেন, ঋত্বিক যে ছড়মুড়িয়ে গালাগাল শুরু করতেন কোনও সন্দেহ নেই। ভদ্রলোক বলেছিলেন ‘ভাবো, ভাবো, ভাবা প্র্যাকটিস করো’, এমন নির্ভাবনার দিন আসবে বুঝতেই পারেননি। আজকের সর্বব্যাপী মহান জগাখিচুড়ির জলসায় ‘চারুলতা’ আর ‘অসুখ’-এর দৃশ্য ইন্টারকাট করে ‘রবিপক্ষের শুরু’ও ঘোষণা হচ্ছে দেখলাম। একটাই ঝামেলা, এর পর হাজার হাজার লোক যদি ভাবে ‘অপু ট্রিলজি’ মানে হল ‘পথের পাঁচালী’, ‘বাবা কেন চাকর’ আর ‘সন্তান যখন শত্রু’, তা হলে? কেউ কেউ আবার ‘অপু কেন চাকর’ও বলে ফেলতে পারে বাড়তি উৎসাহে। সোনার বাংলার সোনার তরী তখন কোন কূলে ভিড়বে কে জানে।



সুমন চট্টোপাধ্যায়ের ঔদ্ধত্যে এক সময় সকলে মুগ্ধ ছিলাম, এখন কবীর সুমনের বিনয় একেবারে অসহ্য মনে হচ্ছে। গরমে নয়, অনির্বচনীয় অমায়িকতায় তিনি গলে গলে পড়ছেন ‘তারা চ্যানেল’-এ রাত দশটা থেকে এগারোটা, সোম থেকে বৃহস্পতি। ভাবলে অবিশ্বাস্য মনে হয়, এই ভদ্রলোকটিই কি পর্দা খোলার সঙ্গে সঙ্গে আটপৌরে জিন্স ও ক্যাজুয়াল শার্টে দ্রুতপায়ে মঞ্চে ঢুকে বিনা ভনিতায় সিঙ্গেসাইজারের সুইচটি অন করে দিতেন? তার পর গানের ফাঁকে ফাঁকে তাঁর অতুলনীয় ও নির্ভীক বাগ্মিতায় বহু প্রতিষ্ঠিত ভিমরুলের চাকে ছুড়তেন অব্যর্থ পাটকেল? আমরা স্তম্ভিত হয়ে দেখতাম তাঁর সদর্প শাদূলসঞ্চার। আজ যাঁকেই অনুষ্ঠানে আনছেন, তাঁর চরণকমলে চিরাশ্রয় লাভ করলে যেন বাঁচেন। এমত বাঙালিসুলভ প্রণতিপ্রবণতায় তাঁকেও খেল? চাঁচাপোঁছা মুখটিতে ‘আমি তোমাদেরই লোক’ বিজ্ঞাপন



কাঁটা-কন্যা শেফালি জরিওয়ালা

প্রকটতম নিয়নের মহিমায় উজ্জ্বল। প্রতি কথায় বার বার ‘আজ্ঞে’, শুনতে না পেলেই ‘মার্জনা করবেন’, এতটুকুও ঘোরালো প্রশ্নের আগে ‘হয়তো ছেলেমানুষি হয়ে যাচ্ছে’, ‘আমার না মাথায় সব সময় এ সব ঘোরে’, ‘মানে আমি অন্যের সুবিধের জন্য বলছি’ ইত্যাকার আগাম ক্ষমাপ্রার্থনা তাঁকে অযথা বিনয়ের বৈষণ্য বানিয়ে ছেড়েছে। সাধারণ ফোন-কল শুনেই ‘অভিনন্দন, চমৎকার বলেছেন’ বলে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠা তো আছেই। আরোপিত মৃদুতাকে এমনিতেই কথ্যভাষায় ন্যাকামি বলে, তার ওপর হাস্যকর সাধুভাষা প্রয়োগ ব্যাপারটিকে আরও বে-আক্ৰ করেছ। কেবল অপারেটর অতিথির কাছে তাঁদের ব্যবসার ‘শিথিল পরিসংখ্যান’ চাইলে বা কারও সামান্য কথার ‘মাধুর্যের রেশ ধরে’ পরের কথায় গেলে বাঙালিরা অন্তত মানে বুঝতে পারবে না।



এসে গেল তিন-চার রকম এফ এম চ্যানেল এবং দিন কয়েকের মধ্যেই দিব্যি জনপ্রিয়। যে ছিদ্র দিয়ে এঁরা ঢুকে পড়লেন তা হল আকাশবাণী এফ এম-এর আড়ষ্ট গোঁড়ামি। হেমন্ত ও মান্নার লিস্টিভুক্ত কয়েকটি গান ছাড়া বাংলায় কোনও গান জন্মায়নি, গজাতে পারে না, এই তত্ত্বে যাঁরা বিশ্বাসী; যা কিছু নতুন তাই লঘু, খেলো ও পরিত্যাজ্য, এই ধারণায় যাঁরা অনুষ্ঠানের পর অনুষ্ঠানে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বাজিয়ে চলেছেন একই প্রাচীন গৎ; মহান বস্তুও পৌনঃপুনিকতায় একঘেয়ে হয়ে ওঠে এই সাধারণ বোধ যাঁদের মাথার ত্বক ভেদ করে ঢোকে না; তাঁরা অগত্যা ‘হেথা নূতনের খেলা আরম্ভ হয়েছে’ মর্মে ঠেলা খেয়ে ফরমান জারি করেছেন, এ বার থেকে বাংলাভাষী উপস্থাপকের সঙ্গে থাকবেন হিন্দি-ইংরেজি মেশানো খিচুড়ি ভাষায় দড় এক আধুনিক বকচ্ছপ, যাঁর দাপটে বাই অর্ডার প্রিয়মান থাকতে হবে বঙ্গপুঙ্গবকে। এতে যে শ্যামও যাবে, কুলও রইবে না, কে বোঝাবে? সমস্যাটাকে তো ধরাই হল না, উন্টে উপসর্গটিকে ভাবা হল প্রধান লক্ষণ। ছিল ন্যাকামির আখড়া, হবে ট্যাশপনার আশ্রম। পরম ঘোমটা থেকে চরম খ্যামটায় ডিগবাজি মানুষের ভাল করেনি কখনও, এই বলে রাখলেম।

১১ মে, ২০০৩

কা যা হী নে র কা হি নি

টেগোরকে নিয়ে এখন হরির লুট চ্যানেলে চ্যানেলে। গান, 'জনতা এক্সপ্রেস'-এ নানা রবি-চরিত্রবেশী কাঞ্চন, আর টেলিফিল্ম তো সহজতম কুটীরশিল্প। এক-দুটি ব্যতিক্রম ছাড়া, সেই টেলি-ছবিরশির রকমসকম দেখে, উরি বাপ, আঁখি না ফিরে। 'চতুরঙ্গ' প্রবল কমপ্লেক্স উপন্যাস হিসেবে খ্যাত, প্রভাত রায় তাকে খেঁতো করে একেবারে সরল ঝোলভাত পরিবেশন করে দিলেন ই-টিভির পর্দায়। ফল্গু দাড়ি পরা পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়কে শচীশের ভূমিকায় দেখে হাসব না কাঁদব ভেবে পাইনে। পরম যত বড় অভিনেতাই হোন, কচি কিশোর আননে বয়সী মুখ ফুটিয়ে তোলা তো তাঁর পক্ষে অসম্ভব! শচীশের একমাত্র কাজ দেখলাম আত্মানুসন্ধান নয়, গাছের আড়ালে নাগাড়ে দাঁড়িয়ে শ্রীবীলাস-দামিনীর লীলা অবলোকন। প্রভাতবাবু আবার 'আজকের কাবুলিওয়ালা'য় তালিবান যুদ্ধের প্রেক্ষাপট আনবেন, মিনির বাবা কর্তৃক কম্পিউটারে গল্প মকসো করা দেখাবেন, শোনা গেল। সে বরং সাধু প্রস্তাব, সাহসী নিরীক্ষাই প্রাণ সঞ্চার করে পুরনো লেখাজোখায়। কিন্তু ক্লাসিকে সাম্প্রতিকতার যথার্থ অনুপ্রবেশ ঘটাতে গেলে যে মারকাটারি ধী ও বুদ্ধির দীপ্তি প্রয়োজন তার ন্যূনতম লক্ষণ অন্তত পূর্বকাজে নেই। রবীন্দ্রনাথের চরিত্র চিঠির বদলে ই-মেল করলে বা শেক্সপিয়রের চরিত্র নাইটক্লাবে তুড়িলাফ খেলেই তাদের আধুনিক সময়ে প্রোথিত করা যায় না, পালার বহিরঙ্গটা বেখাপ্পা ভাবে পান্টানো হয় মাত্র। চলতি সময়ের বিশেষ চিহ্ন ও সংকটগুলিকে যদি বুনে দেওয়া যায় চরিত্রগুলির কার্যকারণের পারস্পর্যে (হেভি শক্ত ভাষা হয়ে গেল, না? ওর মানে হল, পাত্রপাত্রীরা যে দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ঘটনাগুলি দেখছে, যে তাগিদ বা তাড়না থেকে কাজ বা কুকাজ করছে, যে মানসিকতা নিয়ে সমস্যাগুলির সম্মুখীন হচ্ছে, সেই ভঙ্গি, প্রবণতা, মনোভাব যদি আজকের যুগের সঙ্গে মানানসই হয়) তবে এই 'আধুনিকীকরণ' আদৌ সমঞ্জস বটে। তবু পরিচালকের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ, আমরা আশা করব প্রভাতবাবু ভেবেচিন্তেই কাজ করছেন। স্তম্ভিত হয়ে আরও দেখার, অধিকাংশ রবি-পরিচালকেরই আঙ্গিকের বেলায় এক রা: সুবৃহৎ অভিজাত শামুকের মতো প্রতিটি চরিত্রের চলন, তৎসম প্রলেপ দিয়ে তদাত ভঙ্গিতে শ্লথ জিহ্বায় ডায়লগ, ভাসা ভাসা চোখ তুলে পাঁচ মণের এক একটি চাহনি, বিবর্ণ বিধবা টাইপ অভিনয়, পাল্লা দিয়ে ক্যামেরার বিলম্বিত লয়, অজীর্ণ রোগের ন্যায় সেট, পুরোটোর মধ্যে একটা ম্যাডম্যাডে, খেতে-না-পাওয়া, তিতিবিরক্ত তিতিক্ষা মার্কা সিলমোহর। যেন রবীন্দ্রনাথের সময় পৃথিবী স্লো মোশনে চলত। অবাক লাগে, এক আদ্যন্ত স্মার্ট, সাংঘাতিক দাপুটে, ভয়ানক রসিক ও শানিত ব্যক্তিকে আমরা নিষ্প্রাণ ন্যাকামির আশ্রমে পরিণত করলাম সর্বসম্মতিক্রমে। অবশ্য সব নিয়েই যদি গাড়লপনা আর ধাস্টামি চলতে পারে, রবীন্দ্রনাথই বা বাদ যাবেন কেন? তিনি

তো আর পির নন, আমাদেরই অংশ। পিপ্ল গোট দ্য টেগোর দে ডিজার্ড।



কলকাতায় হঠাৎ একইসঙ্গে জঙ্গল বিষয়ক দু'টি সিকোয়েল। 'জাংগল বুক টু' আর 'আবার অরণ্যে'। একটি ডিজনির, অপরটি সত্যজিতের বৈমাত্র্যে ভাই। একটিতে জমাট রংচং, মিষ্টি ডানপিটেতম বাচ্চা, পোড়ো মন্দিরে বাঘে-মানুষে ক্লাইম্যাক্স, অন্যটিতে হৃদয়-চড়কগাছ সিনসিনারি, সমাজচেতনা, কথা-বলা শিম্পাঞ্জি। উভয় ক্ষেত্রেই, মূলের সঙ্গে তুলনা করলে, সংক্ষেপে: ব্রাহ্মণের সে তেজ নাই, সে শিং নাই সে লেজ নাই। কিন্তু এখন তো সংক্রমণের যুগ, গৌতমবাবুর হিট-তরিকার ছোঁয়াচ লেগে কেউ যদি ছুট করে কোমর বেঁধে 'পথের পাঁচালি-২' (বা তীব্র আভা-গার্দ 'পি পি রিডাক্স') বাগিয়ে বসে, জম্পেশ হবে। অগ্রজের লাভণ্যময় ফুটেজের ঘাড়ে ফ্ল্যাশব্যাক বা অন্য ছলে চেপে কিয়দূর যাওয়ার প্রশস্ত পস্থা অনাঁতেল মনে হলে, নো পরোয়া, এক স্টেপ এগিয়ে টোটাল পান্টে যাবে রোল ও ভোল। দুর্গা ট্রেন দেখতে গিয়ে ওয়াগন-ব্রেকারের সঙ্গে পালিয়ে যাবে, অপু হরিহরের নাকের সামনে তর্জনী নাড়িয়ে বলবে 'ওয়ার্থলেস বাবা', উঠোনময় ছেঁড়া শাড়িতে দাপিয়ে বেড়াবেন ইন্দির ঠাকরণের ভূমিকায় শিল্পা শেঠি। নিদেন এক জন মুম্বই-হিরোইন ছাড়া বাংলা আর্ট-ফিলিম হয় নাকি?



এম টিভি অ্যাওয়ার্ডস প্রবল বিখ্যাত তার তুলকালাম অশ্রদ্ধা আর পাইকারি বিদূষের জন্য, কিন্তু এ বার সেখানে যা ঘটল, যুগান্তকারী কাণ্ড। শ্রেষ্ঠ 'ফাইটসিন'-এর জন্য পুরস্কার পেলেন ৯০০ বছর বয়সী বৃদ্ধ বেঁটে সবুজ জেডাই-মাস্টার 'ইয়োডা' ('স্টার ওয়ার্স : এপিসোড টু : অ্যাটাক অব দ্য ক্লোনস')। আর শ্রেষ্ঠ 'ভার্চুয়াল পারফরম্যান্স'-এর জন্য পুরস্কৃত হলেন 'গোলাম', এক উদ্ভট শীর্ণ বানরপ্রতিম মনস্টার ('লর্ড অব দ্য রিংস : দ্য টু টাওয়ার্স')। এঁরা কেউই প্রাণী নন, কম্পিউটারের ভেক্সির মাধ্যমে তৈরি চরিত্র। এই ডিজিটাল তারকারা এক বিশাল পর্দায় পুরস্কার নিতে আসেন, ইয়োডা তাঁর স্বভাবসিদ্ধ শাস্ত্র, ধীর ভঙ্গিতে পরিচালক থেকে শুরু করে মহাশূন্যের মনস্টার 'গ্রিডো'কেও ধন্যবাদ দেন। গোলাম অত্যন্ত বদমেজাজি এবং দুর্মুখ। অ্যান্ডি সেরকিস (যে অভিনেতা গোলামের চরিত্রে গলা দিয়েছেন ও কম্পিউটার অ্যানিমেশনের জন্য সমস্ত নড়াচড়াগুলি করেছেন) যখন পর্দায় পরিচালক ও স্পেশাল এফেক্টকারীদের ধন্যবাদ



গোলাম

দিচ্ছিলেন, তখন গোলাম চকিতে এসে তাঁকে ঠগ ও মিথ্যেবাদী বলে গাল দিয়ে তাঁর হাত থেকে পুরস্কার ছিনিয়ে নেন ও চাঁচান, ‘এটা আমার’! এম টিভি বলেছেন, তাঁরা কিন্তু চরিত্রগুলির স্রষ্টাদের প্রাইজ দিলেন না, দিলেন চরিত্রগুলিকেই। এই ঘোষণার গভীর তাৎপর্য। এখানে মানুষ অভিনেতার সঙ্গে ডিজিটাল চরিত্রকে নির্বিবাদে একাসনে বসানো হচ্ছে। তত্ত্ব খাড়া হতে পারে : এক জন মানুষ অভিনেতাও কি আসলে নেপথ্যে থাকা বহু মানুষের কল্পনা ও প্রয়োগের যোগফল মাত্র নন? এক জন মেক-আপ করছেন, এক জন সংলাপ লিখে দিচ্ছেন, একজন মুভমেন্ট বলে দিচ্ছেন, এক জন অভিনয় দেখিয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছেন ও ভুল করলে ফিরতি টেক নিচ্ছেন, পরিচালক গোটাটা নিয়ন্ত্রণ করছেন, প্রায়ই এক জনের ঠোঁটে অন্যের গলার স্বর জুড়ে দিয়ে একটি সার্থক সিনেমা-চরিত্র তৈরি করছেন। কম্পিউটারজাত প্রাণিদিগের ক্ষেত্রেও এক জন তাকে আঁকছেন, এক জন স্বভাব নির্ধারণ করছেন, ডাবিং আর্টিস্ট গলা দিচ্ছেন, সংলাপ রচয়িতা ডায়লগ লিখছেন। তা হলে এক দল লোকের মাথা ঘামিয়ে বের করা অস্তিত্বহীন কিন্তু পর্দায় জীবন্ত ডিজিটাল প্রাণীগুলির সঙ্গে জ্যান্ত অভিনেতার আদত পার্থক্য থাকল কি? অদূর ভবিষ্যতে আমরা যখন ‘শ্রেষ্ঠ অভিনেতা’ অস্কারের জন্য মেল গিবসন আর মিকি মাউসকে হাড্ডাহাড্ডি লড়তে দেখব, এম টিভির ফাজিল দর্শনকে যেন ভুলে না যাই!



ইয়োডা



বাঙালি অঙ্কে বরাবর উইক। এ বার তার মাথায় ও ক্যাশবাক্সে বজ্রাঘাত হেনে হাজির ‘ক্যাস-বাক্স’। অঙ্কটা ত্রৈমাসিক না ভগ্নাংশ, হাজার বাতলালেও ট্যান যাচ্ছে। দিব্যি ছিল কেবল-যাপন, কী আক্কেলে সরকার বাহাদুর সিরিয়াল-কিলার?

৮ জুন, ২০০৩

কো থা ও গো প ন কো থা ও ও প ন

রাত্রে জাগিয়ে রেখে বোকা বানাতে কোন ভদ্রলোকের পোষায়! হালের ফ্যাশন মেনে মানবাধিকার কমিশনে মামলাও করা যায় আলফা চ্যানেলের বিরুদ্ধে। দিব্যি রগরগিয়ে জমে উঠেছিল প্রতি শনিবার রাত্তির এগোরোটায় 'একান্ত গোপনে', শিরশিরিয়ে সমগ্র সত্তায় কাঁটা দিয়ে উঠত, এ বঙ্গডোবায় এমত উদারমনস্ক পদ্ম ফুটবে, চর্মচক্ষে পেত্য য়েত না। এবং যা হওয়ার, হল। বাঙালির সুখ জাদা দিন সয় না, চতুর্দিকে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ গিজগিজ করছে, তাদের সঙ্গদোষে আচ্ছা আচ্ছা লোকেরও মাথা ঘুরে যায়। কোন সেন্সরবাবু কী করলেন কে জানে, এখন নিয়ম: খুড়োর কলে রসালো টোপ বেঁধে একটি ঘন্টা নাকে দৌড় করিয়ে শেষে নিরামিষ পথ্য বিতরণ। খুচরো জড়াজড়ি ছড়িয়ে সপ্তাহের কোটা শেষ। তার ওপর বিষফোঁড়া: অফবিট প্রয়াস। আমার ছবি মোটেও যৌনতাদুষ্ট নয় বরং আঁতলেমিপুষ্ট, ছুপা অপরাধবোধ ঢাকতে এই থিয়োরি প্রচারার্থে কখনও লোকগানের বন্যা, কখনও যৌনপল্লীতে গল্প নিয়ে ফেলে 'অভাগীর দুঃখ' টাইপ মেলোড্রামা মন্থন। গৌতম গুপ্তর তোলা 'অরণ্য অভিসার'-এ ক'মিনিট অন্তর থেমের ফ্ল্যাশব্যাকে মাঝগাঙে নৌকো চেপে শিলাজিৎ হাজারখানা উদাত্ত লোকগানে রত, শ্রীলা মজুমদার বিবশা, জগৎ ভুলে শিলাবাবুর ঘাড়ে এলায়ে পড়েছেন। কিছু ক্ষণ পরেই সম্পূর্ণ অকারণে (আসলে ফুটেজ খেতে) কাহিনিতে দুটি মেয়ের প্রবেশ, এক জনের কাজ নদীর বকলমে নারীর দুঃখ বর্ণন, অন্য জনের অভ্যাস যখন তখন যেখানে সেখানে চিল্লিয়ে লোকগীতি গেয়ে ওঠা। শেষ দিকের দৃশ্যে বডিস-পরিহিতা থেমিকার সঙ্গে শিলাজিতের সেফ আক্লেষ দেখিয়ে গৌতমবাবু স্লটের ধর্ম রক্ষা করেন। শিবেন্দু গুহ তুলেছেন 'অন্য রং', ইন্টারেস্টিং, কারণ শ্যাম বেনেগালের 'মাভি' ছবি থেকে নাসিরুদ্দিন অভিনীত ডুংরুস চরিত্রটি টুক করে তুলে নিয়ে, সুবর্ণরেখা-র ভাই-বোনের ব্যাপারটিকে মা-ছেলের ঘনঘটায় রূপান্তরিত করে, মেঘে ঢাকা তারা-র ঢঙে ট্র্যাজেডির শেষে এক নতুন মেয়ের ট্র্যাজেডি শুরুর ইঙ্গিত দিয়ে শিবেন্দুবাবু বুঝিয়েছেন, তিনি ছবি দেখেন ও আহরণের শিল্প জানেন। কিন্তু ও মশাই, ইয়ে কোথায়, ইয়ে? কাঁপা কাঁপা ডায়লগবাজি আর ঘড়া ঘড়া চোখের জল দেখতে রাত জাগাচ্ছেন, এত পাপ ধর্মে সইবে? আপনার নিশি-উপস্থাপনা যদি অন্যান্য দিবসকালীন ন্যাকামিরই দোসর, তা হলে অগত্যা হাতে রইল বিনীত সাজেশন: 'একান্ত গোপনে' নাম পাল্টে প্লিজ 'নিতান্ত প্রকাশ্যে' করে দিন।



অতঃপর দর্শকামী বাঙালিকে খুশ করবে এ এক্স এন-এর ‘আর ইউ হট? দ্য সার্চ ফর আমেরিকা’জ হটেষ্ট পিপ্ল’। বোঝাই যাচ্ছে, প্রতিযোগীদের মধ্যে উষ্ণতম (সেক্সিশ্রেষ্ঠ)কে প্রাইজ দেওয়া হবে। আমেরিকাকে চারটি ‘হট জোন’-এ ভাগ করে অসংখ্য আবেদনকারীর মধ্যে ‘হটটুড’ অনুযায়ী কয়েক জনকে বাছাই করা হয়েছে। তিন জন বিচারক আছেন। ছেলেরা হাফপ্যান্ট বা হুস্বতর আবরণ এবং মেয়েরা বিকিনি পরে একে একে এসে দাঁড়াবেন, বিচারকেরা মুখ, শরীর এবং সেক্স অ্যাপিলের উপর নম্বর দেবেন। ব্যস। কোনও ঢাকঢাক নেই, গুড়গুড়ও না। বেয়াড়া প্রশ্নের বোকা উত্তর দিয়ে প্রতিযোগিতাকে বৌদ্ধিক বোরখা পরানোর স্কোপ নেই। মাঝখানে লাচা-গানা, নারীর মহিমাকীর্তন নেই। মানুষ যে স্রেফ শরীর, তার মাংস-অস্থি’র আনুপাতিক সংস্থানেই যে তার চরম সার্থকতা, এই সৎ ঘোষণা এপিসোডের সর্বাপেক্ষে। প্রত্যেকেই স্বেচ্ছায় ঝোলানো পাঁঠার ন্যায় রাং ও দাবনা সমেত নিজেকে মেলে ধরেছেন। বিচারকেরা কোনও প্রমীলাকে ‘দেখবেন, আপনার বিকিনির স্ট্র্যাপ ছিঁড়ে যাবে না তো?’ বললে তাঁর ও দর্শকদের যা পেলায় উচ্ছ্বাস, যে শিসধ্বনি ও শৃগালডাকের বহর, তাতে আমেরিকা সম্বন্ধে শ্রদ্ধা পর্বে পর্বে বেড়ে চলে। কবে যে এমন অজুহাতহীন ভণ্ডামিরহিত একটি সেক্স-সর্বস্ব শো আমাগো আপন ভূমিতে রচিত হবে! ছেলে-মেয়ে নির্বিশেষে রূপদর্শন, ভাইটালস্টিটি পছন্দ হলে সমবেত হিস্টিরিয়া, নিজের হট-জোন প্রতিনিধি জিতলে মেয়েরের সম্বর্ধনা। এই আপাদমাতা অকৃত্রিম যৌন-কার্নিভাল আমাদের শাক দিয়ে মাছ ঢাকা কাঠামোয় এক নতুন মুক্তির সন্ধান দিতে পারে কিন্তু। যেমন দেয় শক-থেরাপি!



বাচ্চাদের আমরা তো চিরকাল ‘বেঁটে সাইজের মিষ্টি গাড়ল’ ভেবে এলাম, কিছু উদ্ভট ব্যাপারস্যাপার আর খুদে নায়ক থাকলেই আমাদের মতে শিশুনিমিত্ত শিল্প, বুদ্ধির ও ভাবনার ছিটেফোঁটাও প্রয়োজন হয় না, তাদের নিজস্ব বেদনা-আনন্দ বোঝার কোনও গরজেরও দরকার নেই। সে বাজারে আকাশ বাংলা-য় ‘লক্ষ্মীছানা’ তৈরি করার জন্য অনুপম প্রামাণিককে লাখো কুর্নিশ। শিশুদের চমৎকার ব্যবহার করে আর একটি শো হল ‘বোল বেবি বোল’। এই প্রায়-কুইজটির মূল ধারণা বিদেশি গেম-শো ‘হলিউড স্কোয়ারস’ থেকে নেওয়া হলেও, শুধু শিশুদের অন্তর্ভুক্তিতেই এর স্বতন্ত্র জেল্লা খুলে গেছে। বাচ্চারা অত্যন্ত আত্মবিশ্বাসী, কোনও প্রশ্নেই এতটুকু ঘাবড়ায় না। ডোবারম্যান কী করে ডাকে সোনা? (উচ্চৈঃস্বরে) ‘ম্যাও ম্যাও মাও’! মাছ কি কথা বলতে পারে? (হেসে) ‘কী করে বলবে? মাছের তো হাতই নেই’! শিশুদের সঙ্গে মেলামেশারই শো ‘সাব’ টিভির ‘সে না সামথিং টু অনুপম আঙ্কল’। মুশকিল হল, অনুপম খের ভারী বুড়ো হয়ে গেছেন, শিশুসান্নিধ্যেও আর চেগে ওঠেন না। তবু ছোট্টরা যেখানে আছে, মজা তো মাস্ট। অনুপম: আমার সঙ্গে যে এত ক্ষণ কথা বললে, আমার কী তোমার সবচেয়ে ভাল লাগল? বাচ্চা: তোমার গোঁফটা। অনু: তা হলে

আমার গোঁফটা কেটে তোমায় দিয়ে দিই? বাচ্চা: (অবাক হয়ে) তা হলে আমি যদি বলতাম তোমার মাথাটা আমার ভাল লেগেছে, তুমি কি মাথাটা কেটে আমাকে দিয়ে দিতে? এ রকম ঝগড়াটে কখনও পড়বেন না লক্ষ্মীছানার অ্যাক্সর সুজন মুখোপাধ্যায় ওরফে নীল। অনুপমের চেয়ে হাজার গুণে স্মার্ট, ছোটদের সঙ্গে তাদের মতো করে মেশায় দারুণ দড়, প্রতি রবিবার শিশুদের সঙ্গে তাঁর প্রাণবন্ত কথোপকথন অসম্ভব আমোদ দেয়। শিশুরা একেবারে তাদের মনের কথাটা বলে নীলকে। প্রত্যেকেই সুযোগ পেলে তাদের বাবা-মাকে নানাবিধ জটিল শাস্তি দিতে আগ্রহী। কেউ চায় তাঁদের গরম চায়ে ডুবিয়ে দিতে, অধিকাংশেরই ভূতের উপর ভরসা, বাপ-মাকে অন্ধকার ঘরে ঢুকিয়ে দেওয়ার প্ল্যানটাই বিশেষ প্রচলিত, এক জন অবশ্য অনেক দূর ভেবেছে, সে বড় হয়ে চাকরি পেয়ে খুস্তি কিনে মা-কে মারবে। অনুষ্ঠানে কোথাও হিতোপদেশের দোকান খুলে বসা নেই, ওপর থেকে মেলামেশার তালেবর মনোভঙ্গি নেই, তাদের সমস্যা হেসে উড়িয়ে দেওয়া নেই। তাদের মজা, তাদের ভাষায়। টীকাটিপ্পনীবিহীন, কায়দারহিত। নীল বললেন, তুমি কি হিরের টুকরো? মেয়েটি: দূর! আমি তো মানুষের টুকরো। আর এক ছেলেকে: তুমি তো লক্ষ্মীছানা? ছেলে: না, আমি কুকুরছানা। নীল: কেন! ছেলে: আমি কামড়াতে পারি, পা দিয়ে গা চুলকোতে পারি, জিভ বার করে হাঁপাতে পারি। নীল: করে দেখাও। ব্যস, ছেলেটির পারফরম্যান্স শুরু। এক জন তো এসেই বলেছিল, ‘নীলকাকু, তুমি না ফাতাফাতি’। এমন একটি আনন্দময়, নির্মল, দরদি এবং অভিনব অনুষ্ঠানের ধারণা ও পরিচালনার জন্য অনুপমবাবুকেও ‘ফাতাফাতি’ না বলে পারা যাচ্ছে না।



তারা চ্যানেলে সোম থেকে শুক্র দেখানো হচ্ছে ‘রজনী’। শুরুতে অনন্যা চট্টোপাধ্যায়ের একটি বাংলা ‘ভূমিকা’। বাংলা চ্যানেলে হিন্দি অনুষ্ঠান কেন? এটা নাকি প্রয়াত প্রিয়া তেভুলকরের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন। আর ইস্যুগুলো প্রাসঙ্গিক। তবে কি অনুষ্ঠান প্রাসঙ্গিক বা অভিনব হলে ভাষার ঠিকঠিকানা রাখার দরকার নেই? আর চলচ্চিত্রের কিংবদন্তি ক্যাথরিন হেপবার্ন (রেকর্ড সংখ্যক চার বার ‘শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী’ অস্কার জয়ী) মারা গেছেন গত রবিবার। তিনিও কিন্তু নারীবাদের পক্ষে প্রাসঙ্গিক ছবি করেছেন একাধিক। অচিরে কি তাঁর ইংরেজি ছবি দেখতে পাচ্ছি তারা-র পর্দায়?

৬ জুলাই, ২০০৩

শু ধু গ য না দি য়ে হ য না

ই-টিভির প্রাণপণ প্রলম্বিত রবিপক্ষ ও নিরীক্ষার নামে র্যান্ডম হাবিজাবিচর্বাণ নিয়ে বিস্তর হাসাহাসি ও নিন্দেমন্দের পর, ধাঁ হয়ে যেতে হল অঞ্জন দত্ত-র ‘মণিহারা’ দেখে। কবিগুরুর গল্পটি আহামরি কিছু নয়, নায়িকার চরিত্রটি একমাত্রিক, তদুপরি বিশ্ববরেণ্য পরিচালক তাঁর সিলমোহর বসিয়েই দিয়েছেন, এমত ঝামেলাগগনে সেফ খেলার প্রচলিত মেঘবিলাসকে নড়া ধরে ছুড়ে ফেলে পেলায় সাহস ও মৌলিকতায় অঞ্জনবাবু যে ভাবে রবি-গল্পের মোদা ফোকাসটিই আমূল বদলে দিলেন, তাকে আর একটু পড়াশোনা থাকলে ‘ডিকনস্ট্রাকশন’ বলে ফেলার লোভ সামলানো যেত না। অবশ্য বাংলা বাজারে বাড়ি ভাঙাকে লোকে ডিকনস্ট্রাকশন বলে চালিয়ে দিচ্ছে, সে সব দিগ্গজদের অবিলম্বে এই টেলি-ছবি দেখে শেখা উচিত, একটা প্রতিষ্ঠিত লেখাকে সম্পূর্ণ নতুন করে পড়া বলতে কী বোঝায়। ধুতির বদলে বারমুড়া পরিয়ে আধুনিকতা ধামসানো নয়, অঞ্জনবাবু ‘মণিহারা’ গল্প দেখলেন উন্টো কাচের দূরবিনে। ভূতের গল্পকে মানুষের গল্পে রূপ দিলেন। কাহিনিতে, নায়িকা মণিমালা শ্রেফ লোভী ও হৃদয়হীন এক নারী, ‘সে কাহারও জন্য চিন্তা করিত না, কাহাকেও ভালোবাসিত না, কেবল কাজ করিত এবং জমা করিত, এইজন্য তাহার রোগ শোক তাপ কিছুই ছিল না...’। তার হৃদপিণ্ডকে বরফের পিণ্ডের সঙ্গে তুলনা করাও হয়েছে। অঞ্জনের বয়ান উন্টো মেরুর। মণি এক তপ্ত, ধড়ফড়ে, প্রেমের জন্য দপদপে হৃদয় সম্বলিত মেয়ে, যার স্বামী সর্ব ক্ষণ ব্যবসার কাজে ব্যাপ্ত, বউয়ের জন্য কোনও সময়ই নেই। কিন্তু বিলক্ষণ আছে পুরুষোচিত গামবাট ধারণা: সঙ্গদানের বদলে পি সি চন্দ্র থেকে একটি করে মূল্যবান গয়না এনে দিলেই স্ত্রীর মন ভোলানো সম্ভব। অলঙ্কারই তার কাছে মোক্ষম ক্ষতিপূরণ। কিন্তু মণির কাছে নয়। অভিমানে, নিঃসঙ্গতায়, চারুলতার মতো একলা মণি বিশাল খাঁ খাঁ বাড়িতে ঘুরে বেড়ায়, বইয়ে চোখ বোলায়, স্বামীর মদ ঢেলে খাওয়ার চেষ্টা করে, বাড়ির পাশে নদীর শ্রোতের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। স্বামী তার অভিমানও বোঝে না, শুধু গয়নার পাহাড় জমা হয়। রবিবাবুর গল্পে তার মন ছিল না, টেলিফিল্মে কিন্তু শরীরও আছে। সে শরীরও কম কাঁদে না। ঋতা দত্ত চক্রবর্তীর একলা ঘরে খাটের বাজুতে আসক্ত ঠোঁট ঘষার (এবং তার পর কান্নায় ভেঙে পড়ার) দৃশ্য সৃষ্টি করতে প্রভূত দরদ ও অন্তর্দৃষ্টি প্রয়োজন। গল্পটা পুরুষের দিক টেনে লেখা, ছবিটা করা নারীর দিক থেকে। এখানে মেয়েটি গয়না চায় না, আর ছেলেটি ভাবে, মেয়েরা তো গয়নাই চায়। সত্যজিতের ছবিটি মূল-অনুসারী, নিতান্তই একবগ্না ভূতের ছবি, মণির চরিত্রে কোনও গভীরতাই সেখানে নেই। দুজন মহাপুরুষকে ডিঙিয়ে অথচ গল্পের কাঠামো অক্ষুণ্ণ রেখে এই ল্যাজামুড়ো ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্য অঞ্জনবাবুকে সেলাম। আপত্তিকর শুধু মণির ভূত হয়ে আসার পর

ছুটে মিলিয়ে যাওয়ার দৃশ্যটির অগোছালো ট্রিটমেন্ট ও চিত্রকৃত আবহসঙ্গীত, আর হ্যাঁ, খামখা ‘বাজে করুণ সুরে’ গানটি ব্যবহার করা হল কেন? লম্বা অগ্রজ তাঁর ছবিতে যে গানটি লাগিয়েছেন, ‘মণিহারী’ ছবি করতে গেলেই সেটাকে বাধ্যতামূলক ভাবে প্রয়োগ করতে হবে? বরং উন্টোটা, পূর্বব্যবহৃত বলেই, ওই গানটা ছাড়া পৃথিবীর অন্য যে কোনও গান ব্যবহার করব। অবশ্য অঞ্জনবাবু বলতে পারেন, তিনি একইসঙ্গে উক্ত ছবিটিকেও ডিকনস্ট্রাক্ট করছিলেন। কিন্তু তার যথেষ্ট দ্যোতক অনুপস্থিত, বরং ব্যাপারটা উদ্ধৃতি-উদ্ধৃতি ঠেকেছে। নতুন যদি করবই, পুরনোকে অত পাত্তা দেওয়ার প্রয়োজন কী? যথার্থ আধুনিকতার আবশ্যিক অঙ্গ বেপরোয়া অস্বীকার, ভুলিবেন না প্লিজ।



আমাদিগের গৃহবধূরা সত্যনারানের সিন্ধি চড়িয়ে ফাটিয়ে দিচ্ছেন, খুচখাচ ঘেঁটু-মনসা-সন্তোষী মা যে যেখানে আছে দেখলেই গলবস্ত্র হয়ে কৃপা মাঙছেন, অথচ ‘সংস্কার’ আর ‘আস্থা’ ধর্মচ্যানেলগুলি দেখার এত অনীহা কেন? পাইকারি হারে এমন পুণ্য বিতরণ মিডিয়াবিস্ফোরণ ব্যতীত সম্ভব ছিল না, এ সুযোগ হেলায় হারাবেন না, বুড়োগণ। এই শুনলেন ঈশোপনিষদের ওপর মনোজ্ঞ লেকচার, তার পরেই সরাসরি অমরনাথ দর্শন। টুক করে অনুপ জলোটার চারটি ভজন ছুঁয়ে চলে গেলেন ভগবদ্বীতার ক্লাসে। মাঝখানে বিজ্ঞাপনও আছে, ডায়াবিটিস সারানোর আয়ুর্বেদিক দাওয়াইয়ের। শোওয়ার ঘরে এসে হৃদয়ে শান্তি ছিটিয়ে যাচ্ছেন স্বয়ং স্বামী রবিশঙ্কর, ‘গীতগোবিন্দ’ সিরিয়াল হয়ে ঝাঁপাচ্ছে বিছানায়, বাবা তারকনাথের বাঁকযাত্রার সিজনে রমরম ভোজপুরী মিউজিক ভিডিও ‘ভোলা বম কাঁবর লে কে’, আর অ-শৈব কনজিউমারের জন্য আছে ‘এ গণেশ বাবুয়া’! কনটেন্টও পাবেন। আজ ৩২নং প্রশ্ন। পৃথিবীকে কোন বিশাল নাগ বহন করেন? উত্তর পাঠান কম্পিটিশন পোস্টকার্ডে, সঙ্গে অনধিক দশ শব্দে স্লোগান, ‘আমি সংস্কার টিভি পছন্দ করি কারণ...’। ‘আস্থা’ অবশ্য অনেক স্মার্ট, কোনও অনুষ্ঠানই বেশি লম্বা নয়। এক্সুনি সিনেমার ভক্তগীতি দেখাল তো পরক্ষণেই নীরবহন আমিন-এর প্রশ্নোত্তরের আসর। মাতাজি, মন আর চিত্তের তফাত কী? ‘মন বিচার করে, আর চিত্ত শুধু ফোটোগ্রাফ তুলে যায়, কमेंট করে না।’ এঁরা মডার্নও। ভ্রমণের স্লট আছে (সিন্ধুদর্শন, ১২ এপিসোডে সমাপ্য: ‘নো রিপোর্টস’), মা-বোনের সাফল্যের খতিয়ান নিয়ে কিছু দিনের মধ্যেই আসছে ‘কজরী’ (প্রোমোয় সাধনা সরগম, সুধা চন্দ্রন প্রমুখ), ‘রাসভক্তি’ অনুষ্ঠানে ধুমুকার ইলেকট্রিক গিটার অক্টোপ্যাড সিঙ্গেসাইজার বাজিয়ে যে গান ও উদ্দাম নেতা হচ্ছে তার লিরিকটুকু বাদ দিলে বাকিটা পপুলার হিন্দি হিড়িক বই কিছু নয়, আর ‘আস্থা অন্ত্যাহারী’র জন্য একটা খালি গলার ভজন তো ক্যাসেট করে পাঠাতে বলছেনই ওঁরা বার বার। গোটা স্ট্র্যাটেজিতে অ-ধর্মীয় অথচ জনপ্রিয় চ্যানেলগুলোর সাফল্য-পয়েন্ট আহরণের চেষ্টা স্পষ্ট। ‘সংস্কার’ তুলনায় গোঁড়া।

শ্রীগোবর্ধননাথজি (এক জন ভগবান) কখন খান কখন নিদ্রা যান তার ফিরিস্তি চলছে তো চলছেই, তার পর বালিকার

কেন্দ্রন শুরু হল তো আর থামে না। এক দাড়িওলা প্রফেট আবার বললেন, ‘মৌনী থাকতে শিখুন। বিনোবা ভাবে এক বার খুব অসুস্থ ছিলেন, লিকলিকে হয়ে গেছিলেন। গান্ধীজি তাঁকে বললেন, নির্জন স্থানে গিয়ে মৌন প্র্যাকটিস করো। ব্যস, ১০ মাসে ৩৫ কেজি বেড়ে গেল’! স্লিমিং সেন্টাররা এ টোটকার করোলারি মেনে মোটাদের অনর্গল হাউহাউ কথা বলার ইলাজ বাতলাতে পারেন। আর এক জন আফশোস করলেন, ‘আমি তো এখন চারদিকে তাকিয়ে হনুমানজির মতো একটা মানুষ দেখতে পাই না!’ তিনি আবার ভাষণের প্রতি পাঞ্চ লাইনের পর দর্শকদের কাছে কোরাসে ‘জয় রামজি কি’ দাবি করেন। গ্রেট ডিক্টেটর-এর চ্যাপলিনের মতো, তিনি বাক্যের শেষে চোখ পাকিয়ে তাকান, আর তটস্থ জমায়েত (দুটো ব্রিগেডের সমান) হইহই করে ‘জয় রামজি কি’ বলে চেষ্টা করে ওঠে। কিন্তু সেরা বাগ্মী ‘আস্থা’র শ্রীমতী জয়া রাও, গীতার শ্লোক ব্যাখ্যা করে বললেন, ‘কৃষ্ণের ল্যাঙ্গোয়েজটা লক্ষ্য করুন, তিনি বলছেন পাপকে ঘৃণা করো, পাপীকে নয়। এটা সংস্কৃতির তফাত। বিশ্ব রাজনীতিতে দুজন জর্জ আছেন: জর্জ বুশ, জর্জ ফার্নান্ডেজ। ৯/১১-র পর বুশ তেরিয়া চেষ্টামেচি করে হাঁকড়ালেন, মার ব্যাটাদের! আর ক’দিন আগেই উগ্রপন্থী হামলার উত্তরে ফার্নান্ডেজ কোমল স্বরে বললেন, এরা ভুল পথে চলেছে, এদের ফিরিয়ে আনতে হবে। বোঝা যায়, কে গীতা পড়েছেন’। ‘তহলকা’ কাণ্ড জানা থাকলে আরও বুঝতেন, জয়া দেবী, ‘পাপকে ঘৃণা করো, পাপীকে প্রতিরক্ষামন্ত্রী করো’, এই গীতা-মাফিক স্লোগান ছাড়া জর্জবাবুর চলবে কী করে?



শর্মিষ্ঠা গোস্বামী চট্টোপাধ্যায় এক বিরল বাঙালি, যিনি স্পষ্ট ও বোধগম্য বাংলা বাক্য টানা বলতে পারেন। তিনি ‘তারা বাংলা’র চমৎকার উপস্থাপনা করছেন ‘অঙ্গনা লাইভ’, মেয়েদের নিজস্ব বিষয়ের ফোন-ইন অনুষ্ঠানটিতে এক জন অতিথিও থাকেন প্রতি পর্বে। ‘কেমন পুরুষ পছন্দ’ থেকে ‘পেশা হিসেবে নার্সিং’ तक বিষয়। কোনও আবছা ও ধোঁয়াটে ভঙ্গি নেই, শর্মিষ্ঠার তরতরে কথা ফোন-কারী ও অতিথিদের খোলাখুলি ও স্বচ্ছ হতে উৎসাহী করে। অবশ্য সে বাড়তি উদ্দীপনা অতিথি শিলাজিতের দরকার নেই, যেই না এক মহিলা ফোনে বলেছেন, ‘আমার পছন্দ ইন্টেলিজেন্ট পুরুষ, সবচেয়ে পছন্দ অমিতাভ বচ্চনকে’, শিলাজিৎ ক্যাক করে ধরেছেন, বচ্চনকে আপনার ইন্টেলিজেন্ট মনে হল কী করে? মেগাস্টার সম্পর্কেও এমন সচ বতাবার দুঃসাহস যুগ যুগ জিও।

৩ অগস্ট, ২০০৩

রে পা লো যা ন, দ র্শ নে র আ লো আ ন

এইখানে, অবোধের দেশে, সিনেমার ভাষা হয় উত্তমের সুচিত্রা-আশ্লেষে, নষ্ট টিভির ন্যায় থেমে আছে, নড়িবে না আর। অথচ বিদেশি পেশি: আর্নল্ড শোয়ারজেনেগার— ভয়াবহ পিটায়ে যে মাস্লের মহাতেজে মহামেগাস্টার, তারও আছে কফিপ্রাণ ফিলজফি, আঁতেলের ভাষা— কপালে আঘাত করে যে নিয়তি মেনে গেছে চাষা, কর্ণের চাকা গিলে যে নিয়তি জ্বালায়েছে শিখা— ম্যান না, মেশিন নয়, 'টার্মিনেটর' থ্রি'তে নিয়তিরই প্রধান ভূমিকা।

হেভি অস্বস্তি হয়েছে না, এই অবধি পড়তে? হাহাহা। ব্যাপার হল, বিশ্ব কাঁপয়ে আজ যুগল পালোয়ান। এর রং সবুজ, অন্যটি গোরা। কলকাতার প্রেক্ষাগৃহেও তাদের লাগাতার লৌহটিশুম ভিলেনের আদ্যশ্রদ্ধ করে ছাড়ছে। ছ'তলা বিল্ডিংয়ের ন্যায় থাক থাক পেশি, এ ব্যাটা ট্রাক ছুড়ে ফ্যালে তো ও ট্যাক্সের নল বেঁকিয়ে দেয়। অ্যাকশনের দেবতা আর্নল্ডকে তো আমরা বহু দিন চিনি, তাঁর পদবি না উচ্চারণ করতে পারলে কী হবে, 'ওই যে রে, ভয়াবহ জার্মানটা' বলে ধাঁ করে ব্ল্যাকে টিকিট বাগিয়ে হলে ঢুকে পড়েছি। কোথায় লাগে ভাই দিশি অ্যাংরি ইয়াং, লাল লাল আঁখে করে সে যত ক্ষণে চুন চুন কে মার ডালবে, রানিং প্লেন থেকে লাফ দিয়ে শোয়ারজেনেগার বাঁ হাতে মিনি-কামান হাঁকড়ে ধ্যাধ্ধেড়িয়ে শত্রু শুইয়ে দিয়েছে। তাঁর সুপারহিট 'টার্মিনেটর' সিরিজের তৃতীয় ছবি এখন বক্স অফিসের ফেং শুই। কিন্তু আসলি বাত অন্য।

হলিউড ও বলিউড, উভয়েই গামবাট সংস্কৃতির তন্নিষ্ঠ প্রফেট। শুধু মার্কিনরা প্রযুক্তিতে ক'মাইল আগে। টেক টেক নো টেক নো টেক, টেকনোলজি দেখে চোয়াল ক্রমাশ্বয়ে ঝুলে যাবে। কিন্তু মজার হল, স্রেফ স্পেশাল এফেক্টের চরকিবাজি দেখিয়ে ডলারবিন্যাস করছি, মানুষকে চাঁদনি রাতে নেকড়েতে মেটামরফিয়ে 'কেমন দিলুম'-এর জন্যই ছবি রচনা, এইটে স্বীকার যেতে হামবড়া হলিউডি হৃদয় এটু লজ্জা পায়। সুতরাং, সুগন্ধি তেজপাতার মতো কিছু বালখিল্য দর্শন ডায়ালগের ফাঁকেজোকে, যাতে ব্রেন-ব্যায়েমে অনভ্যস্ত পিপুফিশু হৃদয়েও 'আমিও বুঝানু!' অহং ফুলেফেঁপে ওঠে, দর্শক দেখল ঘুঁষি, কিন্তু ফিলজফি ভেবে খুশি। 'টার্মিনেটর থ্রি: রাইজ অব দ্য মেশিনস'-এর গল্প হল, মেশিনদের সঙ্গে মানুষদের ভয়ঙ্কর মারামারি হবে, নায়ক তা ঠেকাতে চেষ্টা করছে। কিন্তু আর্নল্ড, যিনি এক জন ভাল মেশিন, নায়ককে সাহায্য করতে ভবিষ্যৎ থেকে বর্তমানে এসেছেন, বারে বারেই বলছেন, যুদ্ধ ঠেকানো যাবে না, যা ঘটবার তা ঘটবেই, নিয়তি কেন বাধ্যতে। তোমার এই মেয়েটির প্রতি মতি নেই, তবু এর সঙ্গেই তোমার বিয়ে হবে। তুমি পড়াশোনা করোনি, ভবঘুরের মতো ফ্যা-ফ্যা করে ঘুরে বেড়াও, তবু তুমিই মনুষ্যজাতিকে ত্রাণ করবে। এবং ভবিষ্যতে তুমি

আমার হাতেই নিহত হবে। এ স্ক্রিপ্টের ব্যত্যয় হওয়া সম্ভব নয়। তাই হে অমৃতস্য পুত্রাঃ, তোমাদের কাজ নির্ধারিত পথে ফাইট করে যাওয়া, চাকা উল্টো দিকে ঘোরানো নয়। বেশ একটা ভগবদগীতার পারফিউম আসছে না? এরে কয় 'ডেস্টিনি', অনিবার ঝাড়পিটের ফাঁকে দাঁতে দাঁত কষে জপতে হয়। বাইসেপকে দশ দিয়ে গুণ করলে যে আলোকিত দর্শন হয়, কে জানত?

ও দিকে 'হাল্ক' এমন এক মানুষের কাহিনি, যে রেগে গেলেই ফুলে ফেঁপে বিকটাকৃতি সবুজ রঙের দৈত্য হয়ে যায়, তখন চতুর্দিকে যা পায় ভেঙে দুমড়ে গুঁড়িয়ে পুড়িয়ে থাক। দ্বিতীয় রিপু মোতাবেক এই মনস্তারঙ্গীতির কালে পটাপট ফেটে উড়ে যায় তার টি-শার্ট, স্নিকার, শুধু ফুলপ্যান্ট কী করে কে জানে ছিঁড়েখুঁড়েও লেপ্টে থাকে টাইট-ফিট হাফপ্যান্ট হয়ে। নীল হাফপ্যান্টালুন পরা সবুজ দানো গ্র্যান্ড ক্যানিয়নের পাথুরে শূন্যতায় ব্যাঙবাজির ন্যায় তুড়িলাফ মেরে ঘুরে বেড়াচ্ছে আর ভোমরার মতো হেলিকপ্টার ধরে ধরে আছড়াচ্ছে, অহো, এ এপিক স্পিলবার্গাভীত। রাগ পড়ে গেলে স্বাভাবিক জ্ঞানে (ও আকৃতিতে) ফিরে এসে সে কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত, আবার দৈত্যাবস্থায় ডোন্টপরোয়া এলোপাথাড়ি ধ্বংসের স্বাধীনতায় প্রভূত উত্তপ্ত। তার প্রকৃত সাধনা, অতএব, তার নিজের ভিতরকার দাঁত কিড়মিড়ের বিরুদ্ধে, নিজের মধ্যে বাস করা রাক্ষসের বিরুদ্ধে। এর সঙ্গে গান্ধীবাদের কোনও পার্থক্যই নেই। নিজের ভিতরের



হাল্ক : গান্ধীবাদী?

হিংসাকে জয় করাই অহিংসা-ব্রতীর প্রধান অন্দোলন। স্বীয় ডার্ক-সবুজ সত্তার সঙ্গে নিরন্তর লড়াইয়ের আখ্যানই কি বাগবাজার সর্বজনীন সর্বে অসুরের সিক্রেট? এই পুজোয় দিকে দিকে 'হাঙ্কাসুর' (হাঙ্ক + অসুর, হাঙ্কা অসুর নয়) দেখতে পেলে মানবেন না।



টার্মিনেটর-থ্রি : গীতা-মিতা?

চুরিবিদ্যা মহাবিদ্যা, লোভ কি কেহ সামলায়? ধরা পড়লে পড়তে পারো, হেরো না কভু মামলায়। অবশ্য কী ভিত্তিতে বারবারা ব্র্যাডফোর্ড 'করিশমা' সিরিয়ালের বিরুদ্ধে মামলা ঠুকে দিলেন বোঝা গেল না। শিল্পে আহরণ মানেই 'চুরি' নয়। শেক্সপিয়রের তাবৎ প্লট অন্যদের থেকে ধার করা, প্লটার্ক আর হলিনশেড-এর লেখা থেকে তিনি নাগাড়ে গল্প নিয়ে নাটক রচেন; জীবনানন্দের 'হায় চিল'-এ ইয়েটসের কবিতার প্রায় লাইন-অনুবাদ পাওয়া যায়। অবিরাম আত্মীকরণ ও রিসাইক্লিং বিশ্ব-শিল্পের ইতিহাসে চলেছে ও চলবে, কী নিচ্ছি সেটা আদৌ বড় কথা নয়, বিবেচ্য হল, নিয়ে আমি কী বানাচ্ছি। মামলাজয়ী সহারা কী বানিয়েছেন? আহা, তিন পরিচালকের গাজন নষ্ট, মেগা মাপের টেলি-কষ্ট। একেবারে অন্য সব সিরিয়ালের সমান যাত্রাপালা, নাজায়েজ আওলাদের অভিমান ও অভিযোগের উত্তরে স্তম্ভিতা মা-র

স্নো-মোশনে চড়, শুধু লোকেশন দুর্দান্ত। ফ্যাশব্যাকে করিশমা সঞ্জয় কপুরের সঙ্গে এই বরফ ছুড়ে লীলা করছেন তো পরের শটেই বালুকাবেলায় মোরা হেঁটেছি। কিন্তু সিনসিনারিতে সিরিয়াল হিট হয়? ফি ডায়লগের পর দামামা বেজে সিহেসাইজার ককিয়ে একেবারে চড়কের মেলা বসে যাচ্ছে। প্রবীণা করিশমার মাথায় পাকা চুলের উৎসব, কিন্তু ত্বক লাভণ্যময়, টানটান। জঘন্য অভিনয়, বস্তাপচা নাটক, ধীর গতি, শট রিপিট করার বদভ্যাস— মেমসাহেবের মামলাই এর একমাত্র মূলধন। তবে হ্যাঁ, বিস্মৃত অভিনেতৃ পুনর্বাসন প্রকল্প হিসেবে একটা সামাজিক মূল্য আছে বই কী। যুগল হংসরাজ, আরশাদ ওয়ারসি, সঞ্জয় কপুর, আয়ুব খান, শিবা, এঁদের নাম আর কখনও শুনবেন ভেবেছিলেন? উক্ত ফসিলদের যে নিষ্ঠ্রাণ মিউজিয়ামে পাওয়া যাবে, উহাই ‘করিশমা’।



এশিয়ার চূড়ান্ত অ্যাকশন হিরো জ্যাকি চ্যান জানিয়েছেন, এ বার রোম্যান্টিক নায়ক হবেন। চলন্ত দোতলা বাসের মাথা থেকে ঝাঁপ খাওয়া আর গড়গড়ানো পিপের ওপর দাঁড়িয়ে সাঁইসাঁই অসিযুদ্ধের বদলে ওষ্ঠ-আঘ্রাণের দিকে মতি গিয়েছে। বলেছেন, ‘আগে সবাই চাইত ক্রস লি হতে। আমি চাইনি। এখন সবাই চায় জ্যাকি চ্যান হতে। তাই আমি আর এক জন জ্যাকি চ্যান হতে চাই।’ সাফল্যের সামিটে উঠেও এই বদলপ্রয়াসের জন্য জ্যাকিবাবুকে কুর্নিশ। খটকা: সমুদয় অ্যাকশনকে ‘নিখাদ সত্য’ ফ্রেভার দিতে প্রতিটি স্টান্ট নিজে করা ও শুটিঙের ফাঁকে বার কয়েক হাত-পা ভেঙে হাসপাতালে শুয়ে থাকা তাঁর নিত্য রুটিন ছিল। এ বার হরেক প্রেমদৃশ্যে অনুরূপ সৎ পারফেকশন দাবি করলে অন্যত্র হাসপাতাল-সস্তাবনা দেখা দেয় যদি।



মহেশ মঞ্জরেকর ছবি করছেন— ‘পদ্মশ্রী লালুপ্রসাদ যাদব’! গল্প হল: লালু, প্রসাদ এবং যাদব নামের তিনটি ছেলে পদ্মশ্রী নামে একটি মেয়ের প্রেমে পড়েছে। এক দৃশ্যে লালুপ্রসাদ স্বয়ং গেস্ট অ্যাপিয়ারেন্স দিতে রাজি হয়েছেন। সেপ অব হিউমারের বড়াই করা কোনও বঙ্গপুঙ্গব আছেন নাকি, যিনি একটি ছবি করবেন, যেখানে ‘জ্যোতি’ নামী ষোড়শী সুন্দরীকে ‘বাবু’ নামে এক চ্যাংড়া ছোকরা প্রাণপণ প্রোপোজ করে কাবু?

৩১ অগস্ট, ২০০৩

বিশ্ববীণা 'বি ফ্ল্যাট' -এ বাজে

আমরা প্রেম 'করি' না, আমাদের প্রেম 'হয়'। প্রেম এক দৈব দুর্ঘটনা, রবীন্দ্রবিদ্যুৎ, সুপার্ব স্বর্গ-খেলনা, যা সুন্দর স্বর্ণালী সন্ধ্যায় পথ চলাকালীন ধাঁ করে পক্ষীপুরীষের ন্যায় ঘাড়ে এসে পড়ে ও চোঁ করে হৃদয়ে পশে যায়। এই যে ডিওডোর্যান্ট মেখে অ্যাপো করতে যাচ্ছি আর প্রোপোজ করার মোক্ষম মুহূর্ত নিয়ত ক্যালকুলেট করছি আর ফোনে রেশিও মেপে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ছি আর সিনেমা হলে গিয়ে পর্দায় চোখ রেখে ঘামতে ঘামতে ভাবছি রান্তিরের সিন দেখালেই হাত ধরব কি না, সবই নাকি স্রেফ নিয়তিনির্দিষ্ট পথে আপনমনে গড়গড়িয়ে ঘটছে, আমরা তৈলাক্ত বাঁদরের মতো অন্ধ কষে এগোচ্ছি-পেছোচ্ছি না। যদি তা হয়, হিঃ, তারে কয় 'ছক করা'। প্রেম হল ফিণ্টারের মধ্যে দিয়ে কোমল বুদ্ধদালোকিত হাম তুম এক কামরায় বন্ধ হওয়ার প্রকরণ। এই স্বপ্নবিলাসকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে বহু দিন আগে এক বাংলা ছবি হয়েছিল, 'বাক্স বদল', যেখানে একেবারে হিসেব করে ছক কষে স্টেপ বাই স্টেপ গুনেগেঁথে সৌমিত্র অপর্ণাকে তুলে নেন। অপর্ণা তখন অন্য ছেলের সঙ্গে ঘুরছিলেন। ছবিটির চিত্রনাট্য লিখেছিলেন সত্যজিৎ রায় নামে এক স্মার্ট ভদ্রলোক। মুদ্রিত চিত্রনাট্যের ভূমিকায় সত্যজিৎ লিখছেন, '...মিল খুঁজতে হলে হলিউডের ছবির সঙ্গেই খুঁজতে হবে। সাধারণ বাংলা ছবির মেজাজের থেকে বাক্স-বদলের মেজাজ স্বতন্ত্র।' সাধারণ ভারতীয় ছবির মেজাজ থেকেও স্বতন্ত্র কমেডি তুললেন ভারতী বালাগোপালন, একই থিমে। 'রুল্‌স: পেয়ার কা সুপারহিট ফর্মুলা' ছবিতে তনুজা নাতনিকে স্পষ্ট বলেন, প্রেম একটা খেলা, সব খেলার মতোই তার কিছু নিয়ম আছে, পাঁচটা নিয়ম মেনে চললেই পুরুষ অনায়াসে হস্তগত। যদিও সিনেমার শেষ দিকে বলা হয় নিয়মগুলো 'আকর্ষণ'-এর, প্রেমের নয়, তবে তা হল খুব ফক্কুড়ি হয়ে যাওয়ার ভয়ে দর্শকের বিশ্বাসে সামান্য মলম লাগানো। রাধা এক নিতান্ত সাধারণ মেয়ে, যে সুপারমডেল বিক্রমকে (মিলিন্দ সোমান) ছাড়া দিনে ২৩ ঘন্টা আর কিছু ভাবে না (বাকি এক ঘন্টা কী ভাবে, ছবিতে বলা নেই)। তার আকুল অবস্থা আর দেখতে না পেয়ে দিদা তনুজা নিম্নলিখিত রুল্‌স পেশ করেন: ১. যে ছেলেকে চাও, তাকে একদম পাত্তা দেবে না, এবং সারা ক্ষণ বুঝিয়ে দেবে, যে তুমি তাকে পাত্তা দিচ্ছ না। ২. ছেলেটার পিছনে দৌড়বে না, তাকে তোমার পিছনে দৌড়তে দেবে। ৩. সব সময় আনপ্রেডিক্টেবল হবে, সম্বচ্ছর রহস্যময়ী। ৪. পুরুষকে বুঝাতে দেবে না যে তার তোমাকে কষ্ট দেওয়ার ক্ষমতা আছে। ৫. রাতদিন তার সব কিছুর প্রশংসা করবে, বানিয়ে বানিয়ে হলেও। এই নিয়ম মেনে রাধা বিক্রমকে পায়ও। পরে অনুতাপ শুরু হয়, আমি তো উহাকে প্রেমে 'ফাঁসালাম', শেষে মধুরেণ। ছবি আরামদায়ক, ফুরফুরে, তুখোড় সপ্রতিভ (চিত্রনাট্য: অজিতাভ মেনন)। মিলিন্দকে প্রথম চাক্ষুষ দেখে

তনুজা ভাবেন : রাধা ঠিকই বলছিল, ‘হোয়াট আ বডি’! বিক্রম ও রাধার প্রলম্বিত চুম্বনদৃশ্যের পরেই পর্দায় এক হবু-পরিচালক আমাদের বলেন, ‘কিস আজকাল সিনেমায় দেখানো যাচ্ছে, লোকেও নিচ্ছে। কিস তো রাখতেই হবে। মূল প্রশ্ন হল, কখন। আদর্শ জায়গা, ইন্টারভ্যালের ঠিক আগে।’ বলতে না বলতে ইন্টারভ্যাল হয়। সব কিছু নিয়ে পেলায় ইয়ার্কি মারার এই ক্ষমতার প্রতি আন্তরিক স্যালুট, কিন্তু সর্বাধিক প্রাইজ জানাই ঘ্যানঘ্যানে দিওয়ানাপনকে এক থাবড়া মেরে, প্রেমের মিষ্টি ব্যাপার অক্ষুণ্ণ রেখে ডি-মিস্টিফিকেশনের জন্য। ভালবাসা দারুণ, ওর জন্য সায়ানাইড সংগ্রহ সম্ভব, তা বলে স্বর্গ-স্বর্গ শুচিবাই বাগাবেন না, নিতান্ত মনুষ্য-নির্মিত : অর্ধেক স্ট্র্যাটেজি, অর্ধেক কল্পনা।



মা দুর্গা দ্রুতবেগে আসছেন এবং ক্লাস ফাইভের রচনাকার মাত্রেই মালুম যে মাতৃ-ত্রিশূলের ডেটলজয়ী খোঁচা ইকুয়ালিটু শুভবুদ্ধির কেজ্জা ফতে। শুভবোধের বান ডাকছে এক চলতি সিরিয়ালে, যার কুস্তি সভ্যতার সবচেয়ে বড় মিথের সঙ্গে। বাহ্যিক সৌন্দর্য ও অন্তরের সৌন্দর্যকে টোটাল গুলিয়ে ফেলা নরজাতির প্রাচীনতম কুসংস্কার, নাক-চোখ-অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অনুপাত আর সংস্থান ফিটফাট হলে মানুষটি অঙ্কে বা ভালবাসায় ভাল, এমত উদ্ভট ধারণার বশে নিয়ানডার্থাল যুগ হতে লোক জল-ট্যাঙ্ক থেকে ঝাঁপিয়ে ‘সুসাইড’ করছে বা করিয়েছে। ইহাকে চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছে ‘জস্‌সি ব্যায়সি কোই নহি’। জস্‌সি কুরূপা যুবতী, পড়াশোনায় বোম্বাচাক হয়েও এবং ক্ষুরধার ডিগ্রি নিয়েও কোনও ভাল চাকরি পায় না স্রেফ বদখত সুরত হেতু, পাড়ায় বন্ধুমহলে সর্বত্র দূর দূর ছাই ছাই দৈনিক প্রাপ্তি। সেক্রেটারির কাজ পেয়েছে শেষে, নিজের কোয়ালিফিকেশনের অনেক নীচে, সে অফিসেও প্রবল অপমান, বেইমানি, চক্রান্ত। তার রিপোর্ট অন্য মেয়ে চুরি করে প্রেজেন্ট করে দেয়, জস্‌সি নিশ্চুপ, ফ্যাশন প্যারেডের আগে এক পুং-মডেলের সঙ্গে ধাক্কা লেগে যাওয়ায় সে হিড়হিড় করে টানতে টানতে জস্‌সিকে সর্বসমক্ষে স্টেজের উপর আছড়ে ফ্যালে, জস্‌সি ব্রন্দনরতা। এখানেই গোলমাল। এ গ্রহে আমরা ত্বক দেখে বিয়ে করি ঠিকই, বহু লোককে শ্রীহীনতার দরুন অন্যায় বঞ্চনা সইতে হয় অনস্বীকার্য, ‘মানুষকে আন্তরণ দিয়ে বিচার করা চূড়ান্ত অসম্ভ্যতা’ জরুরি বার্তা প্রক্ষেপণ হচ্ছে তাও বুঝতে পারছি, কিন্তু মাত্রা রাখতে হবে যে বাপু। আমাকে অফিসে লোকে কুদর্শন বলে রেকারিং



থাবড়া মারবে আর আমি বিনাবাক্যে সয়ে যাব? ইকনমিক্সে এম এ, তার পর আবার ‘এম বি এ’ কি ঘাসে মুখ দিয়ে পেয়েছি? আরও হাসির, জস্‌সির অবাস্তব সাজ। চুল ঠিক সেই ভাবে ছাঁটা, যাতে তার মুখটা সবচেয়ে খারাপ লাগে, এমন এক বেটপ ওভারসাইজ চশমা পরা, যা একেবারে পাপের পরাকাষ্ঠা দোকানদার ছাড়া কেউ বিক্রি করবে না। দাঁতে ‘ব্রেস’ তো আছেই। এত প্রাণপণ চেষ্টা করে মেয়েটিকে সর্বাঙ্গীণ বিদঘুটে করা হয়েছে, স্বাভাবিকতার কাঠামোটা পটাং ভেঙে যায়। যে খারাপ দেখতে, নিজেকে সে জেদ করে যথাসাধ্য খারাপতর করে তুলবে কি? সঙ্গে অবশ্যই চড়া অভিনয়, ভঁয়ানোর-পোঁ বাদ্যি, মেলোড্রামাময় প্লট, কোম্পানির গদি-লড়াইয়ের পুরনো কাসুন্দি। ভয়ানক অতিনাটক দিয়ে যে মানুষের বেদনাকে বহুগুণ জোরালো করে পেশ করা যায় না, উন্টে বিষয়টি মামুলি ও তরল হয়ে যায়, এই বুক মুচড়ে ওঠাগুলোকে বরং যতটা বাস্তব ছিটিয়ে, রোজকার চেনা ঘটনা দিয়ে উপস্থাপন করা যাবে, তত ভিতরে গিয়ে বিঁধবে, সে বোধহয় হিন্দি সিরিয়ালনির্মাতার অগম্য। তবে যে দেশে সব সিরিয়ালে বাড়িসুদ্ধ চরিত্র রাত্তির সাড়ে দশটাতেও বিয়েবাড়ির সাজে খায়দায় প্রতিশোধপ্ল্যান করে, বাথরুম যাবে বলে বের করে পাটভাঙা শাড়ি নীল লিপস্টিক, সেখানে বদসুরত মেয়েকে নায়িকার ভূমিকায় লড়িয়ে দেওয়ার আইডিয়াটির প্রতি তত্ত্বগত অভিনন্দন।



গান নিয়ে যাঁরা ওস্তাদি করেন, তাঁদের ঠাকুদার ঠাকুদা এসে গেছেন। তিনশো কোটি বছর ধরে ‘বি ফ্ল্যাট’-এ গান গেয়ে চলেছে একটি ‘ব্ল্যাক হোল’! ব্ল্যাক হোল হল মহাকাশের ‘অন্ধকার গহ্বর’, যা সব কিছুকেই গুষে নেয়, এমনকী আলোকেও। বর্ষার জল জমা রাস্তায় ফট করে ম্যানহোল খুলে দিলে কী হবে ভাবুন। মহাকাশের খোলা ম্যানহোলকে ব্ল্যাক হোল বলে। পৃথিবী থেকে ২৫০ মিলিয়ন আলোকবর্ষ দূরে ‘পারসিয়াস’ নামে একটি ‘ছায়াপথের জটলা’ রয়েছে, কেমব্রিজের বৈজ্ঞানিকরা বিস্তর অঙ্ক কষে তাজ্জব বনে দেখেন, সেখানকার বিশাল ব্ল্যাক হোল থেকে নাগাড়ে ‘বি ফ্ল্যাট’ স্কেলে স্বর উথিত হয়ে চলেছে! তা হলে মুনিঋষিরা আগাগোড়া যে অনাহত নাদের কথা বলে গেছেন, তা এ-ই? রবিবাবুর মতে যে বিশ্ববীণারবে বিশ্বজন লাগাতার মোহিছে, তা বি-ফ্ল্যাটে বাজছে? এই মহাজাগতিক কালোয়াতি আবার এইসান গহন গম্ভীর, হোমো স্যাপিয়েনের গলা কভু ওই খাদে নামবে না, জর্জ বিশ্বাসেরও না। এমনিতে গলা সাধার নিয়ম হারমোনিয়ামের বাঁ দিকের রিড বাজিয়ে খাদে প্র্যাকটিস করা। কিন্তু বাঁ দিকে বারান্দা ছাড়িয়ে আরও বাঁ দিকে দর্জিপাড়া ছাড়িয়ে আরও বাঁ দিকে দেশ ছাড়িয়ে সমুদ্র পেরিয়ে সাইবেরিয়া পৌঁছে গেলেও ব্ল্যাক হোলের স্বরটি খুঁজে পাওয়া অসম্ভব। অতএব এই ঘোর কৃষ্ণবর্ণ বাবুটিই যে মহাবিশ্বের প্রাচীনতম দক্ষতম গায়ক, সন্দেহ কী? পুজোয় কমিটিমশাইরা দেখুন বাবাজিকে জলসায় বুলাবেন কি না। হারমোনিয়াম জোগাবার ভার দিন আপনার শতুরকে।

বা লি, কা লী, অ ল ই ন ফ্যা মি লি

রবীন্দ্র-ঋতুপর্ণ-ঐশ্বর্য ত্র্যহস্পর্শে 'চোখের বালি' টেরিফিক নান্দনিক বুম চিকা চিকা, একশো কুড়ি গাঁটের কড়ি খরচা করে 'আইনক্স'-এ দেখলে অধিক মনোহর। চোখের বালির থিম মিউজিক এখন মোবাইলের রিং টোন, আবার ইংরিজি ডাকনাম, 'আ প্যাশন প্লে'! যদিও ঋতুবাবুর সাম্প্রতিক ছবিরশির কম্পালসরি চুস্বনদৃশ্যের বদলে এতে আছে শ্রেফ চুস্বনভান, একেবারে ধাপ্পা চুমুসকল, মাথার আড়াল রেখে হাস্যকর ভাবে তোলা, কিংবা হয়তো রবীন্দ্রযুগে নরনারীর ঠোঁটের অবস্থান অন্য রকম ছিল। তদুপরি কিছু ইতিউতি নিস্প্যাশন নিস্পেষণ, সেন্সরসিদ্ধ আংশিক চাদরঢাকা সঙ্গমও, যা ক্রান্তীয় উষ্ম অঞ্চলের অভ্যস্ত দম্পতির ক্ষেত্রে নিতান্ত উদ্ভট, কিন্তু থাক গে, যা বলছিলাম, আইনক্স। ইহা হয় দ্বিগুণ সমাস, চারটি সিনেমা হলের সমষ্টি। চলতি ভাষায় 'মান্টিপ্লেস্স'। ক্যায়সা সিন? বড়লোকিয়ানার ময়দান। একশো দশ/কুড়ি টঙ্কা খরচে টিকিটখানি কম্পিত হস্তে ধরে এস্‌কালেটর-উত্থান, তুঙ্গে উপনীত হতেই সিকিয়ারিটি চেক। যন্ত্র বোলানো, 'সার, ব্যাগে কি লাইটার-মাচিস ইত্যাদি'? এবং ইন্টারভ্যালে উপর্যুপর স্লাইড, চতুষ্কোণ ধমকি-সিরিজ, হ্যান নিষেধ, ত্যান ব্যান, চিউয়িং গাম খাবেন না, 'ডেলিবারেটলি' কোনও কিছু ধ্বংস করিবেক না, তা হলে কিন্তু লুকনো ক্যামেরায় সটান গিরেফতার এবং হ্যাঁ, যদি লেসার টর্চ দিয়ে পর্দায় উজ্জ্বল স্পট ঘুরঘুরন্তি করেছেন, 'উই উইল স্পট ইউ'। বিগ ব্রাদার ইজ ওয়াচিং ইউ বললে সহজে ও শিল্পসম্মত ভাবে বোঝা যেত, কিন্তু কাঁড়িকেত্তর পয়সা দিয়ে এমত মালুম হলে বড় হীন লাগে যে, বস, আমরা জানি বাঁদরের গলে মুক্তোর মালা দুলিয়েছি, তোমরা এর অযোগ্য, তবু বেওসা তো করতেই হবে, লেकिन ফরগেট নট, স্লাইট বেগড়বাই দেখেচি কি খপ! দর্শক হিসেবে এটুকু সম্মান প্রাপ্য নয় যে ডেলিবারেটলি কিছু নষ্ট করতে ওখানে যাইনি তা বিশ্বাস করা হবে? তবে হ্যাঁ, ডিউ তো প্রদত্তব্য, সুন্দর প্রেক্ষাগৃহ, নন্দনের ন্যায় রিক্লাইনিং কেদারা ও নন্দনের চেয়ে অনেকানেক উত্তম প্রোজেকশন। সাউন্ডও কানের আরাম, বিশেষত যদি চোখের বালির মতো সযত্ন শব্দবিন্যাস ঘটে (করেছেন বিশ্বদীপ চট্টোপাধ্যায়)। এই আপনার সিটের ডান পাশে দই হেঁকে গেল তো বাঁ কানে সন্ধ্যারতি। অভীক মুখোপাধ্যায়ের ক্যামেরাকাজ অদ্বিতীয়, হলিউডোচিত বললে কম হয়, দেবজ্যোতি মিশ্রের সঙ্গীত সত্যজিৎ-মিউজিকের প্রায় সাবলীল। নির্ঘাৎ উল্লেখ্য শিল্প নির্দেশনা, 'পাতালঘর'-এর পর এ ছবিতেও অসামান্য সেট বানালেন ইন্দ্রনীল ঘোষ। ডাবিং-এর জন্য সুদীপ্তা চক্রবর্তী সেরা পুরস্কারের যোগ্য। ছবিটি কেমন? কেমন হল এই অনবদ্য উপাদানগুলিকে মিশিয়ে মিলিয়ে গেঁথে ছেনে কাঠামোয় প্রাণপ্রতিষ্ঠা? কী রকম এই সহস্র ভয়েস-ওভারে-চিঠি পরিবৃত, লতায় পাতায় নকশা তোলা, চারুহাস, নিরামিষ, ভাঙা কূলে হেলে পড়া নধর বটের ন্যায়

ফিল্মটি? সংক্ষেপে বলা যায়, রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসটি যেমন, ঠিক তেমনই। জরদগব নভেলখানির চলন, বলন, স্থলন, দলন ও সেমিকলনের এমন সার্থক চিত্রভাষা-অনুবাদ সম্ভব, কে জানত। ললিত ঘ্যানঘ্যানানির এই সর্বসম যুগলবন্দি বঙ্গীয় জনরুটির সম্পদ। শোনা যাচ্ছে এক দীর্ঘতর ‘আনকাট’ বয়ান চরাচরে প্রচারিত। বাগ্নো। যাক গে, যা বলছিলাম, আইনক্স। কী বাথরুম রে ভাই! আবার ইংরিজি গান চলছে! সবকে সব অটো-ফ্লাশ, হাই-ফাই কল দেখে কিছুতে বুঝতেই পারবেন না কী করলে জল পড়ে, আনাড়ি শিম্পাজির মতো জোর নাড়াচাড়া চালালে জামা ভেজার চাপ প্রভূত। বাইরে থেকে কোনও খাবার, এমনকী পানীয় জল, হলের ভিতরে নিয়ে যাওয়া নিষিদ্ধ। আপনি তো প্রতি সিটের লাগোয়া বোতল রাখার জায়গা দেখে হাঁ। পরে বুঝবেন, ও হরি, পার্শ্ব স্ন্যাক বার হতে দামড়া স্যান্ডউইচ, কোল্ড ড্রিন্কেস গেলাস, সমুদয় অ্যালাউ। ওটা শুধু আপনার ক্ষুধাতৃষ্ণাকে বাইরের উপাদানে তৃপ্ত না হতে দেওয়ার কানুন। ছবি দেখবে আইনক্সে, আর বিরতিতে (চোখের বালি-র ইন্টারভ্যালের নাম অবশ্য ‘বিরতি’ নয়, ‘প্রতীক্ষা’!) টিপিনবাক্স খুলে রুটি আলুচচ্চড়ি সাবড়ে দিলে, ও সব লিটল-ম্যাগাজিনপনা বাইরে ছেড়ে এসো ভাই, এখানে কলকাতা আছে ক্যালকাটাতেই।



‘যে ব্যক্তি আপন পিতৃভার্য্যার সহিত শয়ন করে, সে আপন পিতার আবরণীয় অনাবৃত করে, তাহাদের দুই জনেরই প্রাণদণ্ড অবশ্য হইবে, তাহাদের রক্ত তাহাদের উপরে বর্ত্তিবে। এবং যদি কেহ নিজ পুত্রবধূর সহিত শয়ন করে, তবে তাহাদের দুইজনের প্রাণদণ্ড



অবশ্য হইবে, তাহারা বিপরীত কর্ম করিয়াছে’ (লেবীয় পুস্তক : ২০; ১১, ১২)। শুধু বাইবেল নয়, ‘ইনসেস্ট’ বা অজাচার (‘নিষিদ্ধ আত্মীয়কুটুম্বের সহিত যৌনসংসর্গ’)-এর বিরোধিতা পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি সমাজে, দেশে দেশে, কালে কালে। পণ্ডিতরা বলেন, সব সংস্কৃতির মধ্যে এই একটি জায়গায় মিল : ইনসেস্ট অবৈধ। যা তাঁরা বলেন না, যুগে যুগে সহস্র পরিবারে এ ঘটনা ঘটে চলেছে। কী করে তবে ভারতীয় সিরিয়ালে এ কাণ্ড দর্শাব? অসামান্য কায়দা বাগিয়েছেন সোনি চ্যানেলের ‘সম্ভব অসম্ভব’ সিরিয়াল-নির্মাতাগণ। অলৌকিকতার মোড়কে জমজমাট আখ্যান, পূর্বজন্মের এসেন্স লাগানো। সিদ্ধার্থ বিয়ে করে আনে মায়াকে, যার মাঝে মধ্যেই মাথা তাজ্জিম-মাজ্জিম করে ওঠে, তখন সে শ্বশুরকে নাম ধরে

চোখের বালি : কিচকিচে

ডাকে, ‘অমর!’ আর অদ্ভুত আচরণ করে। সে সকল ব্যবহার দেখে প্রাচীন ভৃত্য ও শ্বশুর স্তম্ভিত, তা যে অবিকল এ বাড়ির মৃত গিন্নি মীরার ন্যায়, তাঁর ভাব-ভঙ্গি-স্বভাব-সম্বোধন একেবারে বসানো! (সিদ্ধার্থকে জন্ম দিয়েই তিনি মারা যান, ফলত ছেলেটি তাঁকে চেনেইনি)। এরা বিয়ে করেছে সেই মন্দিরে গিয়েই, যেথা বহু দিন আগে শাদি রচিয়েছিলেন সিদ্ধার্থের বাবা-মা, পুরোহিতমশাই সেই একই, বৃদ্ধ হয়েছেন, কিন্তু এই রমণী ও তার মৃতা শাশুড়ির বডি-ল্যাম্পোয়েজের মিল তাঁর বয়স্ক দৃষ্টি এড়ায় না। পূর্বজন্মের ব্যর্থ প্রেমিকও আছে, (সে এখনও এ বাড়ির পার্টিতে আসে) যার সামনে মায়া ঘোর-লাগা চোখে ঘোষণা করে, ‘ম্যায় মেরে কান্হা কি রাধা, মেরি অমর কি মীরা’। ফলত যে ক্রাইসিস ক্রমাগত ঘনিয়ে ওঠে তার আবরণ ছাড়িয়ে নিলে উন্মোচিত কাঁচা দপদপে সত্যটি: সিদ্ধার্থ মিলিত হচ্ছে তার মা-র সঙ্গে এবং/অথবা শ্বশুর ও পুত্রবধূ পরস্পরকে চায়। ওল্ড টেস্টামেন্ট বহাল থাকলে মাল্টিপ্ল প্রাণদণ্ড। অয়দিপাউসের হকিকৎ জানা থাকলে প্রগাঢ় চক্ষুবিস্ফার। এ বিষয় নিয়ে যে অস্মদেশে টেলিকাহিনি পাড়া যায়, তার আত্মাকে সুকৌশলে আবডালে রাখা যায় আমাদের উদ্ভট বিশ্বাস ঠেকিয়েই, এ অভিনব চিন্তার জন্য সংশ্লিষ্ট টোটাল বাহিনীর প্রতি বিস্ময়ে ইয়াববড় হাঁ রইল।



দুর্গাপূজো-পরিক্রমায় সংগঠকদিগের মুখনিঃসৃত বিবিধ রতন হেলায় ছড়ায়ে যায় টিভির আননে। অ্যাক্সরের প্রশ্নের উত্তরে এক অর্গানাইজার: ‘আমরা এডুকেশনের মধ্যে দিয়ে পাবলিককে নানা রকম শিক্ষামূলক, যেগুলো জনসংযোগ খুবই অ্যাকসেস্ট করেছেন, যেমন আলোকসজ্জায় নতুনের ওপর, একটি খরগোশ পেপসি খাচ্ছে’! এবং তার পরেই তাঁর স্যাঙাত: ‘যদিও আমাদের পূজোটা সার্বজনীন, তবু আমরা এটাকে পাবলিকের কাছে নিয়ে যেতে চাই।’ হয়তো ভাববেন জাম্বো-পূজোর নিবুদ্ধিতাও সেরা সাইজ, তবে দেখেননি সি টি ভি এন-এ কালীপূজোর প্রাক-পরিক্রমা। মণ্ডপ বিষয়ে বক্তব্য: আমরা প্রতি বার একটা করে ধর্মীয় স্থানের আদলে করি। এ বার হচ্ছে হরিদ্বার, (দু’হাজার প্রদীপ ভাসানো হবে পূজোর রাতে পাশের ঝিলে), আগের বার ছিল অমরনাথ, তার আগের বার পিরামিড। পিরামিড ধর্মীয় স্থান, শুনলে মমিগণ হাত জোড় করতেন নিশ্চয়ই। অন্য পূজোর উদ্যোক্তা : আপনারা বোধহয় জানেন বর্তমানে মাদার টেরেসা খুবই আলোড়ন তুলেছেন। তাঁর শহর রোমের এক গির্জার আদলে আমরা এ বার মণ্ডপ বানিয়েছি। আর এক পূজোর ৫১ বছর হল, সোশ্যাল সার্ভিস তো করতেই হবে। ওঁরা দুটো করছেন। ‘বস্ত্র দান’ আর ‘কাপড় বিতরণ’। আর যাঁরা বন্যার থিম করেছেন? জল থৈ থৈ জায়গায় আধডোবা সব ভাঙা বাড়ি, তার মধ্যে সাঁকো দিয়ে যেতে হবে অর্ধনিমজ্জিত জীর্ণ কালীমন্দিরে, ফির দর্শন। যেমন নরমুণ্ডের নেকলেস পরা দেবী, তেমনি তাঁর আরাধনায় মানুষের দুর্দশার সেলিব্রেশন। দোষ কারও নয় মা, আমরা, ইয়ে, স্বখাত সলিলে হাফডুবে মরছি, বুইলেন শ্যামা?

ফোঁ ক শ্লো ক কো ক শা স্ত্র

অবশেষে আমির খান শ্রীলেখা মিত্রের কোলে বসে পড়লেন। বঙ্গ ভাগ্যাকাশে পোঁ-পোঁ সূর্যোদয়। শ্রদ্ধেয় স্টার পার্বত্য ভাঁড়ামির অস্ত্রে কফি হৌসে আকাট হল্লা মচালেন, স্ক্রিপ্টের কথা কম বলা ভাল, হিপির ‘হ’ ধরে হাওড়া ব্রিজ অনুপ্রাসালেই বাঙালিয়ানা ক্যাপচার, কিংবা কুশলীগণ শিব্রামীয় দর্শনে বিশ্বাসী: বাজারে দু’রকম স্ক্রিপ্ট: শ্রীলেখা আর বিশ্রী লেখা। তবে কিনা, ইনফোকম-সম্মেলনে সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় যেমন বলেছেন, ভারত আজ যা ভাবে, বাংলা তা ভেবে ফেলেছিল গত পরশু। স্টারবাবাজির ডিমোশনে আফশোসাশ্রু টসটসাবার আগে চাদিকে আঁখে ফাড়কে একবারটি পশ্য, আমির তো নিশ্চিত স্বমহিমায় ফিরবেন, জীবনের নানা কোলে বসে পড়া তাঁর গায়ে লাগবে না, আমরা দ্বিজেন বন্দ্যোপাধ্যায় আর বিপ্লবকেতন চক্রবর্তীর মতো অতুলনীয় দিকপাল অভিনেতাদের যা আকাঁড়া জোকারে পরিণত করেছি ‘চুনি পান্না’র ন্যায় অশিক্ষার আলপনায়, তাতে বাঙালির আর অন্যকে ক্লাউন বলা সাজে কি না, প্রশ্ন উঠতে পারে। দুই প্রবীণ প্রতিভা যখন আক্ষরিক অর্থে গুঁতোগুঁতি করেন হামাগুড়ির ভঙ্গিতে কিংবা শিশুগিরি ফলিয়ে আধো আধো বোলে উচ্চগ্রামে কমেডিমহুনের প্রয়াস ফলান, বহু কারণে কান্না পায়। কে জানে সুকুমার রায়ের জাতি কৌতুক বলতে স্রেফ সার্কাস বোঝে কেন। অবশ্য যুগে যুগে বটতলাই তো আদতে বেস্টসেলার। যিশু দাশগুপ্ত সৃষ্ট এই উৎকট আমোদে স্বতঃস্ফূর্ত দন্তবিকাশে অভ্যস্ত পাবলিক আবার রবীন্দ্রনাথ ভজে শ্লাঘায় ফুসফুস ফোলায়। অবশ্য শুধু যিশুবাবুর নাম ধরে বলা উচিত হয়নি, কমেডিকার বাছতে তো গাঁ উজাড়, মেসবাড়ি বা পাঁচু মিস্তিরি লেন-এর আখ্যান ক্রমাগত ককিয়ে উঠছে, এই কুৎসিত কাতুকুতুপ্রদানের অত্যাচার থেকে সহজে মুক্তি নেই।

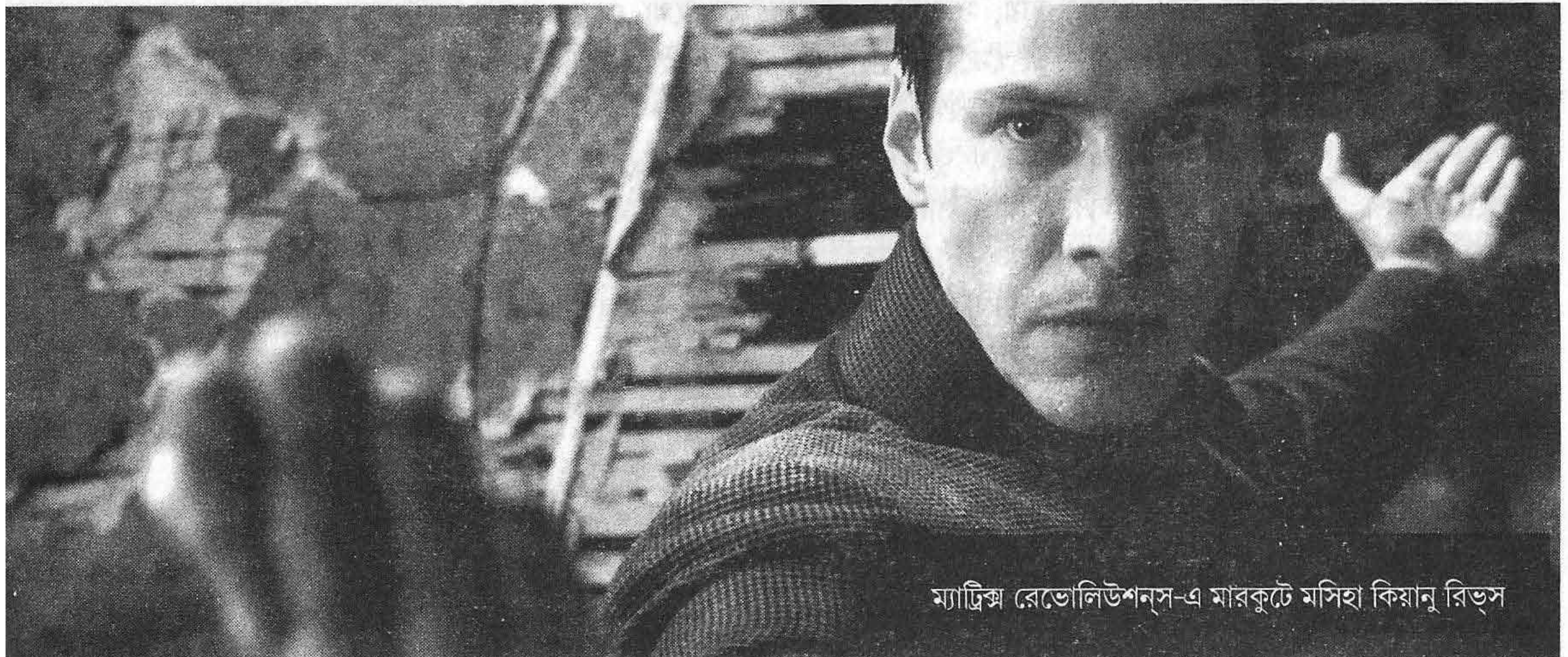


এমনিতেই শহর কলকাতায় সংস্কৃতি বলতে নিরন্তর গুটখা চিবিয়ে মাল্টিকালার থুতু ছোটানো, তায় ফিল্ম-মোচ্ছবে ঝাঁকে ঝাঁকে আঁতেলগণ কার্লোস সওরা-র ‘সালোমে’ দেখে সোৎসাহে চেপ্সাচ্ছেন ‘সালামি দেখলুম’, অবশ্য সংস্কৃতি ব্যবহৃত হতে হতে এখানে যে হ্যাম, বেকন ও অন্যান্য মাংসের চাবড়া, সুবিদিত। ঠিক উন্টো দিকেই ‘হস্তশিল্প মেলা’, কদর্য পট, ব্যাঁকা জিরাফ, বীভৎস মুখোশ, তেকোনা গণেশ, চকরাবকরা কুর্তা, বেসুরো বাউল, আর মেলার এক প্রান্তে, সত্যি বলছি, প্রতীক-টতিক না, নির্জন, কুঁজো রবীন্দ্রনাথ। আ-বক্ষ কবি একমনে লিখছেন, কলমটি আবার খাগের। দাম কত কে জানে, ফাইবার গ্লাসের যিশুর দাম সাড়ে তিন হাজার, তাও তো যিশু নোবেল পাননি। বেধড়ক বোরিং মেলা,

সংস্কৃতির আগে ‘লোক’ জুড়ে দিলেই লোকে খুব খাচ্ছে, হাবিজাবি ক্লাস্তিকর আচাভুয়া নির্মাণে এটু গাঁয়ের টাচ পেলেই ‘ফোকি-ফোকি’ ভাব, এই ফোক জিনিসটে ফোকলা মধ্যবিত্ত বুঝেছে খুব, তোবড়ানো হৃদয়বৃত্তায় সহজশোষ্য ল্যাবেধুস যেন, বিবেক আর পুরাতন ভৃত্য গ্রাম থেকে না আমদানি করলে যেমন জমে না, ক্যাসেটে গাঁকগাঁকিয়ে একতারা আর ডাকিনীর ছবির পাশে কাঁথা সিঁচ থাকলেই অমনি আদি-কলচরের শেকড়ে একেবারে চরণকমল সাতপাঁচানো। ফোক হলেই আর বৈচিত্র্যের দাবি নেই, ভাল-মন্দ ভেদবিচার নেই, যত ঘ্যানরঘ্যানর তত ইগোস্বীতি, দেখেছ কেমন সহ্য করলাম দু’ঘন্টা, কী ভালবেসেছি আমাগো রুটস! আরে মশাই, নির্বোধ সেন্টিমেন্টের পাঁকে শিল্পবোধ জন্মে না, লোকশিল্পেরও মুড়ি-মিছরি আছে, হৃদয়পদ্ম মেলে বুঝতে শিখুন। বছর বছর এ মেলা একদম এক, এক বার দেখে মনে মনে জেরক্স করে নিন, আর জন্মে ওমুখো হওয়ার প্রয়োজন নেই। কিন্তু ওই যে, আছে হানা, আছে ত্যানা, তবু আনন্দ জাগে, ‘গোবিন্দভোগ চালের খিচুড়ি, পাঁপড়, চাটনি, সঙ্গে বেগুনভাজা’ বিজ্ঞপ্তি দেখে ‘পৌষপার্বণ’ দোকানের সামনে লোক-নোলা ঝরে পড়ছে।



প্রায় এই ফর্মুলা মেনেই আমেরিকার সিদ্ধান্ত : ভারত দরিদ্র ও ব্রাত্য, এবং সুতরাং ফিলজফিতে মহত্তর। তাই মারকাটারি অ্যাকশন ছবি ‘ম্যাট্রিক্স রেভোলিউশন্স’-এর শেষে ধাঁ করে সংস্কৃত শ্লোক বেজে উঠল। ছবিটি ‘ম্যাট্রিক্স’ সিরিজের তৃতীয় সদস্য, প্রথম উইক-এন্ডে টাকা আয়ের বিশ্বরেকর্ড গড়েছে। অকথ্য ফিল্ম, সারা ক্ষণ অর্থহীন মারধোর এবং নাগাড়ে বীভৎস স্পেশাল এফেক্ট দেখতে দেখতে গা গুলিয়ে ওঠে। পোকাকার মতো মেশিন লাখে লাখে ঝাঁপাচ্ছে আর অনর্গল গুলি খাচ্ছে, এই সাকুল্যে প্লট, সিনেমা না ভিডিও-গেম বোঝা দায়। এর ফাঁকেই দর্শন কপচাতে গুঁজে দেওয়া



ম্যাট্রিক্স রেভোলিউশন্স-এ মারকুটে মসিহা কিয়ানু রিভ্‌স

হয়েছে ছোট ভারতীয় মেয়ে 'সতী', পবিত্রতার প্রতীক, শেষ দৃশ্যে সে-ই সূর্যোদয় ঘটায়। ভারত গরু আর জাদুর দেশ, রান্নাকালীন লুচি আপনাআপনি ফুলে ওঠে, অতএব সে ম্যাজিক-দেশের বাচ্চা স্বপ্নের ভোর আনবেই, স্বতঃসিদ্ধ। ব্যাটারা খেতে পায় না অথচ শোলোক লেখে, নির্ঘাৎ গুপ্ত-সুইচ রয়েছে নো ম্যাটার হোয়াট সুস্থিত, শান্ত, দাড়িওলা অস্তিত্ব বিতাবার। অতএব, আয় ভাই প্রাচ্য ধুয়ে খাই। টি এস এলিয়ট 'ওয়েস্টল্যান্ড' শেষ করেছিলেন 'ওঁ শান্তি' তিন বার লিখে, এই অবিরল টেকনো-ঝাড়পিটের ফিলিম শেষ হচ্ছে 'অসতো মা সদগময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়' কোরাসে আউড়ে, অবশ্যই জড়ানো মার্কিন উচ্চারণে, বলে না দিলে বুঝতেই পারবেন না ভারতীয় সভ্যতাকে তোলাই দেওয়া হল। সতীর বাবা আবার 'কর্ম' নিয়ে (ওঁর কথায় 'কারমা', কার মা কার বাবা বোঝা না গেলেও কার বক্স অফিস তা স্পষ্ট) নায়ক কিয়ানু রিভসকে মিনি-লেকচার দেন। ঝাপসা আধখাঁচড়া দর্শন শুনে ক্ল্যাপ বাজানোর ঐতিহ্য সর্বজনীন, আমেরিকা অ্যাটেষ্ট করে দিল, এ বার এখানকার স্বদেশি এথনিকবাজরা বাকি কাজটা শেষ করতে লাগুন।



প্লেন ভেঙে পড়ল এবং কয়েক জন প্যাসেঞ্জার কোনও ক্রমে হাঁচোড়পাঁচোড় পৌঁছলেন নির্জন দ্বীপে। তার পর অচেনা সহযাত্রীদের পরস্পর-নির্ভরতা, প্রেম, অপ্রেম। কতকটা 'কাস্টঅ্যাওয়ে', কিন্তু রবিনসন ক্রুসোর বহুবচন-রূপ হিন্দি সিরিয়ালস্ হবে 'আওয়াজ দিল সে দিল তক' নামে জি-টিভিতে, ভাবা শক্ত। অভিনব প্লট, প্রবল নাটকীয় সম্ভাবনা, তবে কি সভ্যতার বাইরে মানুষের সম্পর্কগুলির নিষ্ঠুর ব্যবচ্ছেদ ঘটবে? ভুল ভাঙতে লহমা, ড্রপসিন বদলালে নাটক পান্টায় না। রোহিণী হাতাংগাডি একটা পাথর কুড়িয়ে এনে শিব বলে পূজো করতে শুরু করেন। যখন দ্বীপে আসা ছোট্ট ছেলেটির প্রবল অসুখ কিছুতে সারছে না, রোহিণীর মানত ও উপবাস সত্ত্বেও, এক জন রাগ করে পাথুরে শালগ্রাম ছুড়ে দেন। তক্ষুনি ছেলে চোখ মেলে চায়, সব্বাই করজোড়, নেপথ্যে তেড়ে ভক্তি-মিউজিক। এ ছাড়া এক যুবা তো স্বাস্থ্যবতী মেমসাহেবের প্রেমে কুপোকাত, মেমেরও আপত্তি নেই (ওই খাঁ-খাঁ দ্বীপে গোরা পার্টনার পাবেন কোথা), আর এক তন্বী শ্যামার তাই দেখে হিংসেয় উত্তুঙ্গ বক্ষ অহরহ দন্ধ। ফের বিবাহ-ক্রাইসিস: বাগদত্তা মেয়ে ভাঙা প্লেনের লাগেজ-অঞ্চলে নিজ লাল শাড়ি সিঁদুর দেখে ফুঁপিয়ে আত্মহননেছু, হেনকালে এক ছেলে তুড়ক লাফে তড়িঘড়ি সিঁদুর পরিয়ে বিয়ের প্রস্তাব পেড়ে আকুল। এ বার শাদি তো করতেই হবে, জন্ম জন্মের বন্ধন, দ্বীপের সকলে সারা সকাল ঘটকালি রচাতেই মেয়েটি বিকেল থেকে জব্বর সোহাগিনি, নতুন ভাবী বরের পানে কটাক্ষ হানে, ফিসফিসায়। অর্থাৎ সেই পাতি, খেলো, গ্যাদগ্যাদে ফ্যামিলি ড্রামা, শুধু চার দেওয়ালের বদলে লোকেশন একটি পাণ্ডববর্জিত দ্বীপ। স্বভাব যায় না ম'লে, হিন্দি সিরিয়াল বদলায় না দ্বীপান্তর হলে।

ড গ বা ছ তে গাঁ উ জা ড়

সরল আইডিয়া: অ্যাড ভাল হলে প্রোডাক্ট বিকোবে বেশি; খারাপ হলে, লবডক্কা। কিন্তু এক প্রোডাক্টের বিজ্ঞাপন করতে গিয়ে আর এক সামগ্রী হিট করিয়ে দেওয়া! 'হাচ' এক বিজ্ঞাপনসিরিজে আমাদের জীবন সম্প্রতি নন্দিত করেছেন: পুঁচকে কুকুর বাচ্চা ছেলের অনর্গল সঙ্গী, মাঠেঘাটে সর্বত্র ছায়াসমান, এমনকী সেমশয্যায় নিতান্ত অ-কুকুরোচিত ভাবে শুয়ে নিদ্রা অবধি। ব্যাটা নির্ভুল পৌঁছে গেছে ছেলেটির ক্লাসে (শিক্ষকের পারমিশন কী করে পেল কে জানে), প্রভু দোলনায় তো সে একেবারে চারুলতা-র ক্যামেরার মতো টু অ্যাড ফ্রো ধাবমান, সেলুনেও নাপিতভায়াকে জপিয়ে পার্শ্বচ্যেয়ার থাবাগত! মর্যাল: যত দূরে দূরে দূরে যাবে বন্ধু, ছোট্ট থ্যাবড়ামুখো অনুগত সারমেয়র ন্যায় 'হাচ নেটওয়ার্ক' সাথ ছোড়বে না। মনোহর ধারণা, অপরূপ উপস্থাপনা, শংসামুখর কান্ডি। এ দিকে, বাচ্চারা তো প্রতীক বোঝে না। তারা বিজ্ঞাপন দেখে করেছে কী, উক্ত কুকুরটিকে অপরিমেয় ভালবেসে ফেলেছে। অতঃপর নাছোড় বায়না, কিনে দাও। ওই কুকুরের জাতির নাম 'পাগ'। দেশ জুড়ে সহসা এমন হুলস্থূল পাগ-চাহিদা, দাঁও বুঝে দর দ্বিগুণ-ত্রিগুণ। ছিল পনেরো হাজার, বিকোচ্ছে তিরিশ-চল্লিশে। মুশকিল, কুকুরে টিভি দ্যাখে না। স্টারকুত্তো যদি তার আইকন না হয়? যদি শক্ত অঙ্ক ক্লাসে যেতে না চায় কিংবা চার পা গুটিয়ে শ্রেফ কুকুরের মতোই ঘুমোনো মনস্থ করে, শিশুপ্রভুরা ছেড়ে দেবে? তখন আদর্শ হাচীয় ডগেশ্বর বানানোর প্রয়াসে ক্রমাগত আধো আধো লাঠিপেটা। এবং ডগ বাছতে গাঁ উজাড়।



ক্ষীরের পুতুল নুনের পুতুল তো কবে অস্তমিত, ভ্যাবলা ডলপুতুলেরও প্লাস্টিক কপাল পুড়েছে। বাঙালি মেয়ে এখন বার্বি না পেলে রিপ কার্বি-র ন্যায় গম্ভীর। বিদেশে 'সেলিব্রিটি ডল' বা বিখ্যাতদের আদলে পুতুল বানানোর চল প্রচুর, মাইকেল জ্যাকসন থেকে ব্রুক শিল্ডস, লট কে লট পুতুলায়িত। কিন্তু এমিল ভিকেল যা করলেন, বাপ রে। সাদ্দাম গ্রেফতারের ২৪ ঘন্টার মধ্যে 'বন্দি সাদ্দাম' পুতুল বার করে দিলেন। এক মুখ দাড়ি, ইয়া পেশি, গায়ে ইস্কাবনের টেকা আঁকা টি-শার্ট। দাড়ি কামানো পরিচ্ছন্ন সাদ্দাম কেন নয়? কী বোকার মতো কথা, 'ঠিক ফুটেজ-টার মতো পুতুল করেছি, সাক্ষরত অ্যান্টিসেপ্টিক ভার্সন তো চাইনি!' মাত্র ৩০ ডলারে মার্কিন অহং পোয়াতে কিনুন এই বন্দি বদমাশ, দাড়ি চুমরে গলা খুঁচিয়ে বীরত্ব প্র্যাকটিস করুন। এমিল জানিয়েছেন, শিগগিরই সাদ্দামের স্বর দেওয়া হবে। সুইচ টিপলেই পরাহত গর্তধৃত মরুপুঙ্গব টি টি রবে সারেভারবাক্য উচ্চারণ করবেন। ভারতীয় খেলনা-সদাগররা কী করছেন? দ্রুত দাউদ-পুতুল বাজারে ছাড়ুন!



‘ডিসকভারি’ চ্যানেলের অনুষ্ঠান ‘দ্য অলটারনেটিভ ইয়ারস অব রক অ্যান্ড রোল’। কী ভাবে ষাট-সত্তরের দশক একটা ‘বিকল্প’ জীবন গড়ছিল সারা পৃথিবী জুড়ে। এ সপ্তাহে আলোচ্য ছিল ‘ফ্যাশন’। পোল্যান্ডে মিনিস্কাট পরা একটা পলিটিকাল স্টেটমেন্ট ছিল, ফ্যাশন-ম্যাগাজিন স্মাগল করে জিপসিরা লুকিয়ে বিক্রি করত মেয়েদের বাথরুমে, রাশিয়ায় জিন্স কিনতে হত কালোবাজারে আর তা পরতে দেখলেই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বার করে দেওয়া হত, পার্টির নির্দেশে জিন্স পরা যুবসম্প্রদায়কে ব্যঙ্গ করে কমেডি ফিল্ম তৈরি হল (‘ফরেনার্স’, ১৯৬১), শেষে বিশাল ‘পাবলিক ট্রায়াল’ করে জিন্স কালোবাজারির দুই নেতাকে ১৫ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড। ব্যস, দেশ জুড়ে প্রতিবাদ, পার্টির মধ্যেও অসন্তোষ, গুরুপাপে লঘুদণ্ড ঘোচাতে ফের মামলা, এ বার সবাই খুশি, মৃত্যুদণ্ড। রায় শুনে আসামীরা, ২৪ আর ৩০ বছরের দুটো ছেলে, হাউহাউ কেঁদে ফেলল। ব্রাজিলের এক মডেল নিজে কাপড় কেটে বিকিনি বানাতে গিয়ে এমন বেটপ ভুল করে বসলেন, ম্যানেজ করতে গিয়ে ছাঁটতে ছাঁটতে ইউরেকা, ‘স্ট্রিং টপ বিকিনি’: মোক্ষম স্থান ছাড়া সবই অনাবৃত, সুতো দিয়ে কোনও ক্রমে ধরে রাখা! কয়েক দিনের মধ্যেই এটি গোটা বিশ্বে সুপারহিট। ভারতের প্রসঙ্গে দেখানো হল শুধু এক মহিলাকে : জিনাত আমন। বলা হল, তিনি একা ঘাড়ে ধরে ভারতীয় ফ্যাশন পান্টে দিয়েছিলেন। জিনাত বললেন, ‘আমি প্রথম নায়িকা, যে মিনিস্কাট পরল। এর আগে আমাদের সিনেমায় মিনিস্কাট পরা চরিত্র মানেই ছিল খারাপ মেয়ে। কিন্তু ‘পজিটিভ’ চরিত্র যে এত ছোট পোশাক পরতে পারে, আমি আসার আগে ভাবা যেত না।’



পার্ক সার্কাসে তাঁবু ফেলেছে অলিম্পিক সার্কাস। ছোট কুকুররা চমৎকার খেল দেখাল, হামাগুড়ি, গড়াগড়ি, দু’পায়ে পিছু হাঁটা! কাকাতুয়াও রিকশা টেনে বয়ে বেড়াল অন্য কাকাতুয়া-প্যাসেঞ্জার। কিন্তু হয়, বাকি সব সময়ই মানুষের কেরদানি: জিমন্যাস্টিক্স, কোমরে হুলাহুপ বনবন। বাচ্চারা মহা হতাশ। তারা জোকার আর জন্তুজানোয়ারে উৎসাহী। হাতি আসতে কী হাততালি (খুদে দর্শক চৈঁচিয়ে: মা দ্যাখো, হাতির মাথায় চুল নেই!), এক জন শুঁড় দিয়ে বল করল, অন্য জন তুলে ছয়। প্রায় সহবাগের মতো খেলে জমিয়ে দিয়েছে, ওমা, সহবাগেরই মতো, তক্ষুনি প্রস্থান। জেব্রা এল এক লহমা, দু’পাক দিয়ে তিনটে রিং টপকে ভৌঁ ভৌঁ, ঘোড়া তো আরও খারাপ, ক’চক্কর নতমুখ

সাহসী জিনাত : ফ্যাশনম্নাত

ধীর টুট, ব্যস। আর কী বিষণ্ণ ও অকর্মণ্য জোকারদল! হাসে না, হাসাবার চেষ্টা করে না, রং মেখে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে, খেলাশেষে তালি দেয়। হিন্দি গান বাজছে পেছনে, লম্বা জোকার লিপ দিল সারা ক্ষণ। পুরো সার্কাসটারই বিমর্ষ, হাল ছেড়ে দেওয়া চেহারা। জাগলিং করতে গিয়ে হামেশা বল ফসকাচ্ছে, বেলুন ফাটাতে মিস করছে রাইফেলধারী। টাইট পোশাক পরে এক দঙ্গল মেয়ে ‘কাঁটা লগা’র সঙ্গে নাচল। হাতির পিঠে বিশাল কাপড়, লেখা: ‘মর্টন ব্র্যান্ড ঘি’, ‘সেনকো জুয়েলার্স, বৌবাজার’। ন্যাতানো আরোগ্যচেষ্টার আড়ালে সবাই জানে, তরী ভিড়বে না। আসলে ‘পলিটিকালি কারেক্ট’ আনন্দ বলে কিছু হয় না। ‘পুষ্টিকর ফুচকা’ খেলে বাঁচবেন বউদিগণ? মানুষ চেটেপুটে খেত জানোয়ারদের অবিশ্বাস্য কাণ্ডকারখানা, মেয়ের বুকে হাতি দাঁড়াবে, বাঘের মুখে লোক মুডু ঢোকাবে, জলহস্তী তিন তলার সমান হাঁ করে এক কাঁদি কলা খাবে। সে জলহস্তীও নেই, সে মৌজমস্তিও নেই। তাই অন্যত্রও অমনোযোগ, মরণকূপে মোটরসাইকেল আছে কিন্তু এই পাটাতন থেকে ও—ই পাটাতনে লাফিয়ে পড়ছে না, এক জোকার অন্যের নিতম্বে টেনে লাথি কষাবার সনাতন স্ল্যাপস্টিকটুকু ভুলে মেরে দিয়েছে। মেনকা গান্ধীরা যদি সত্যি জিতে যান; সার্কাস, চিড়িয়াখানা, মায় রোববারের মাংস রান্নার ঘ্রাণ জীবন থেকে উবে যায়, সেই ঔচিত্যরঞ্জিত গোমড়া পৃথিবীতে বাঁচার জন্য কে কে তৈরি, প্লিজ হাত তুলুন।



জবর শীত, বাঙালি বুদ্ধিজীবীরা ঠকঠক কাঁপছেন তসলিমার ভয়ে। কবে কী মিষ্টি অনাছিষ্টি করেছিলে, এখন থাকো কাঁটা হয়ে, কোন খণ্ডে দণ্ডিত হবে। ও দিকে বিশ্বশান্তির জন্য ব্রিগেডে ‘রাজযোগ’ হচ্ছে, সি টি ভি এন-এ জ্যোতিষী বলছেন, ‘কালই বলেছিলাম, দ্রাবিড়-লক্ষ্মণ যদি দাঁড়িয়ে যায়, ইন্ডিয়া জিতবে। কেমন মিলিয়ে দিলাম!’ বিস্ময়ে জাগিছে গবেটাক্স গ্লোব।

২১ ডিসেম্বর, ২০০৩

ছিঃ, ঐ, ঐ ২

ইয়া! চলিতেছে নিউ ইয়ার। এ বার সব ভাল হবে। নেমে যাবে ভুঁড়ি, শেষ হবে উড়াল পুল, পান্টে যাবে স্বামী/স্ত্রী। বচ্চনের রাগী ধমকি আর ঐশ্বর্যের মিঠে আকৃতি শুনে পাবলিক উর্ধ্বশ্বাসে পোলিও খাওয়াবে বাচ্চাদের। এ ভালভালির হিড়িকে আপনার মানসিক স্বাস্থ্য তন্দুরন্ত করতে নন্দনে চলছে ‘ভাল থেকো’। উরিব্বাস, সু-চেতনার রঙিন ডগডগে ম্যারাপ একেবারে। দেখতে শুরু করেই হড়কে যাবেন, বৃষ্টি আর ন্যাকামিতে থইথই করছে। গণতন্ত্রের সবচেয়ে ফাটাফাটি অবদান: প্রত্যেকের সিনেমা করার সমানাধিকার। আসলে নয়া-আঁতেল বাংলা ছবির সিধে ফর্মুলা গজায়মান। যেন তেন অভীক মুখোপাধ্যায়কে ক্যামেরাকাজের দায়িত্ব সঁপে দিন। ব্যস, অতুলনীয় দৃষ্টিসুখকর আলো-আকাশ-ঘর-বাহির গ্যারান্টিড। এ বার অকুঠায় যাত্রাপালা নামান। অপূর্ব ফোটোগ্রাফি আর উৎকট চিত্রনাট্য— যুগলবন্দির মার নেই। আগে বাঙালি ক্যামেরা-ফ্যামেরা বুঝত না, এডিটিং শব্দটাই শোনেনি। শ্রেফ চাইত ভাল গল্প, ভাল অভিনয়। গোল আলো ঝুলিয়ে চাঁদ বানাতে স্বেচ্ছায় সোৎসাহে ভড়কি খেত। সে বরং সুদিন ছিল। দেখতে ভাল ছবি আর ভাল ছবি— এ দুটোয় গুলিয়ে ফেলার হালফিল প্রবণতা ভয়াবহ। সহজ ভাষায় এ হল সত্তা আর সুরত গুলিয়ে ফেলা। একের পর এক চকচকে ফোটোসমৃদ্ধ ন্যাতপ্যাতে সিনেমা আদর পাওয়ার পিছনে এই নতুন ‘যুগোপযোগী’ অশিক্ষা।

এ ছবিতে অপূর্ব তপতপে নরম আলো রয়েছে, মেঘে গুমগুমে আকাশ দেখে মনে হবে কেউ এক্ষুনি লিখছেন ‘ঘন মেঘ ডাকে ঋ’, কিন্তু হায়, চলমান পিকচার পোস্টকার্ডের সিরিজ নট ইকুয়ালটু সিনেমা। সৌমিত্র আছেন, দাড়িওলা, ক্লাসিকাল সাধেন, ব্রিলিয়ান্ট কেরিয়ার ছেড়ে পার্টি করেছেন, মিনি-রবীন্দ্রনাথ। মুখ খুললেই ভাবসম্প্রসারণযোগ্য আধসেদ্ধ দর্শন ক্লাস ফাইভের রচনাবই-মুদ্রায় উবজে ওঠে। ‘আমাদের বুকের ভেতর এক অতল দীঘি আছে’ কিংবা ‘মন খারাপ হলে গোছের ছায়ায় গিয়ে দাঁড়াবে’ গোছের চপচপে ডায়লগ নাগাড়ে। জুনিয়র সৌমিত্র দু’খানি: দেবশঙ্কর (ভাইপো), পরমব্রত (পাড়ার ছেলে)। দেব ঘরে চে-র ছবি টাঙিয়ে রাখেন, কোন সভ্যতা আমরা রেখে যাচ্ছি পরবর্তী প্রজন্মের কাছে ভেবে ভেবে অনিদ্র (অবশ্য ঘুম হবে কী করে, মাঝরাতিরে মোমবাতি হাতে তাঁর ঘরে হুড়মুড়িয়ে ঢুকে সৌমিত্র সঠিক রাজনীতি বিষয়ে হিতোপদেশ আওড়ান!) আর পরমব্রত উদ্যত প্রেমিকার কাছে নির্জন ছাদে ‘ঢ’-র দশাসই উচ্চারণ নিখুঁত রেখে আবৃত্তি করেন ‘বুঝে নিই গুঢ়তার মানে’। এ বাড়িতে কেউ টিভি দ্যাখে না, সবাই কবিতা বলে। জন্মদিনে বৃক্ষরোপণ হয়, শক্তি চাটুজ্যের পদ্য আওড়ালে পিছনে বাঁশি বাজে, বিদ্যা বালন দিনভর

গাছের গায়ে হাত বুলিয়ে চোখ বুলিয়ে নরম নাকের পাটা বুলিয়ে বেড়ান। বৃষ্টি হলেই তুমুল ভেজেন, কখনও নিউমোনিয়া হয় না। হলে চলবেও না, তিনিই তো প্রকৃতি, ‘আনন্দী’— পবিত্রতার মূর্তি। লোডশেডিং-এর সময় মোম নিয়ে সৌমিত্রের ঘরে গেলে বৃদ্ধ বলেন, ‘হঠাৎ সব অন্ধকার হয়ে গেল’। উত্তরে আনন্দী: ‘এই তো আমি আলো নিয়ে এসেছি’। বুইলেন, কী প্রতীকি সংলাপ তুখোড় ডিসগাইজে! প্যানরপ্যানর গাছগিরি ও কবিতাপনার রাজ্যে ভিলেনও হ্যাজ: বাবুয়া, ঝকঝকে শার্ট গুঁজে পরেন, এঁদের ব্যাপারকে ‘আদিখ্যেতা’ বলেন, এবং অ্যাভো লুজ চরিত্র, সমাজসেবা করে ফেল মারার বদলে মন দিয়ে পড়াশোনা করে কেরিয়ার বানান। কে না জানে, এ ছোঁড়া আমেরিকা যাবে আর বিদ্যা বালন ছেড়ে মেম বিয়ে করবে? আর ঝিনুক? আনন্দীর বোন? সে আগে পরম-প্রেমিকা ছিল তো কী, এখন বস্তুগত লোভে উথলে টাইট টি-শার্ট পরে (ছিঃ), লিপস্টিক লাগায় (ঐ), এমনকী সৌমিত্রের পুত কালোয়াতি বিঘ্নিত করে পাশ্চাত্য জগৎম্প শোনে (ঐ২)! সহজ গণিত মেনে ক্রমে অন্য বয়ফ্রেন্ড (একটা সম্পর্ক ভেঙে আর একটা! এ-ও হয়!), শেষে মদও ধরে (ম্যা গো, কী ঘেন্না কী ঘেন্না)! কী অপূর্ব সরল ও ড্যাবড্যাবে সাদা-কালো বিভাজন। কী নিরেট ভাল/ভিলেন পার্টিশন। পুরো ছবি জ্ঞানবাদী জ্যাঠা-সন্তায় থরোথরো, ব্লিচিং পাউডারের ন্যায় শুচিবায়ুর গন্ধ ছাড়ছে, সাবটাইটেলে বুনিয়াদি ধারাপাত লিখে দিলে মন্দ দাঁড়ায় না। দলে দলে দেখুন, অ্যাডিনে একটা সুস্থ সচেতন ছবি হল বটে, বাঙালির মূল্যবোধের আখান্বা থামগুলি সযতনে চুনকাম ঘটেছে। একমাত্রিক চরিত্ররাশি, হাস্যকর সংলাপ, অবাস্তব আচরণ, সারহীন ঘ্যানঘ্যান, বোরিং লয়, পানসে জোলো ম্যাদামারা দর্শন, সবচেয়ে অসহ্য অনিবার ঈশপবাজি, মৌলিকতাহীন আঙুলে পিটুলি গুলে দুধেল প্রফেটিয়ানা খেলানো। এই গ্যাদগ্যাদে ক্লিশে-নিমজ্জন যদি বাংলা সেলুলয়েডের ২০০৪ হয়, তবে হে ন্যাকাচৈতন্য জাতি, ভাল থাকা নিজের মতো ডিফাইন করে নিও।



সোনি চ্যানেলের ‘কেয়া হাদসা কেয়া হকিকৎ’ সিরিয়ালে অহোরাতে অলৌকিকের তর্জন, বারো ভূতে নেতা জুড়ে টি আর পি তড়পাচ্ছেন, হালফিল কেসটি তীর মেগা-গড়বড়। প্রথম বউটি গত হতে বেচারি নায়ক ২য় বিবাহ বাধিয়েছে এবং নতুনটিকে নিয়ে অবিশ্বাস্য সুখী, পেত্নি-বউয়ের সয়? সে সন্ধে সাতটা বাজতে না বাজতে জীবিত বউয়ের শরীরে সওয়ার, সকাল সাতটার আগে ছাড়ে না। লাও, রাক্তিরের তাবৎ লীলা তার মোনোপলি। এমনিতে জ্যাস্ত বউ তুমুল সতী, শাড়ি ছাড়া কিচ্ছুতে মতি নেই। পেত্নি ভর করলেই সে ধাঁ করে পরে ফেলবে ছোট ড্রেস, খুলে ফেলবে মঙ্গলসূত্র-শাঁখা, ঘোর লাগা চোখে হাঙ্কি স্বরে সরাসরি আহ্বান পাতবে নায়কের জন্য। নিজে অ্যাডভান্স এগিয়ে আলিঙ্গন রচাবে, এবং আ ছি, আ ছি, শোনা যায় সে ইয়েতেও পারদর্শিনী ও বেশরম হ্লাদিতা। ফের সকাল হলেই রান্নাঘর-ঠাকুরঘরময়ী সুচরিতা প্লেটোনিক ভারতীয় রমণী। এই প্রেত-প্রতীকে ডঃ জেকিল মিস্টার হাইড পালা-য় নিরামিষ জ্যাস্তটি মৃতা সতীনকে বলেওছে, স্বামীর রতি পেত্নিটি পেলে কী হবে, সে তো লভেছে আসলি জুয়েল: বিরতিহীন প্রেম। শরীরে

কী আসে যায়? সহজ, এখানে পেট্রিটি নারীর যৌন ইচ্ছের আত্মা। সে অলঙ্কার, সটান শরীর চাইতে ডরায় না, এবং এতে পুং-তন্ত্রের পাজামায় বিলক্ষণ গিট পড়ে যায়। কারণ নারী তার নির্ধারিত প্যাসিভ বুদ্ধি ফাটিয়ে দাবড়ে আত্মঘোষণা করছে। তাই এ কাণ্ড মন্ত্র পড়ে দাউদাউ ঘণায় দহনীয়। ও আবার কী, বউ হয়ে সেধে পুরুষ-ওয়েলকাম? শরীর কি ভোগের জিনিস, তা হল সন্তানধারণের কল। পুরুষের খিদে মেটাতে তুমি ব্যবহৃত হয়ে ধন্য, নিজের ও সব নোংরা আকাঙ্ক্ষা আবার কোন এপিসোডে পেলো? মা-বোনের জাত যদি মিনি পোশাক পরে অধোমুখে ধপাস করে, বিবাহচিহ্ন খুলে সেক্সি হতে চায়, কোন তান্ত্রিক ভূত ছাড়াবে, স্বামী সিরিয়ালানন্দ ছাড়া? গো ভগবান, দেশটা তো এখনও আমেরিকা হয়ে যায়নি, শরীরপ্রয়াসী পেট্রিগণ ডেস্ট্রয় হউক, আমাগো নারী-পন্টন দুধেভাতে থাক নিরাপদ হ্যাপি এন্ডিং আঁকড়ে।



অফিস কামাই করে ক্রিকেট দেখলে এখন প্রভূত ইগো-মালিশ। অঙ্কে ব্যাক পেয়েছিলেন তো কী আছে, খেলা বুঝতে আপনাকে গিলতে হবে বিটকেল গ্রাফ, চার্ট, রান রেটের প্রগতি-পোকা, এল বি মাপতে 'হক আই' চিত্র, ব্যাটের খোঁচা শুঁকতে 'স্নিকোমিটার', টায়ার কোম্পানির রেটিঙে স্টার-খেলোয়াড়ের ওঠবোস, বিগত চার বছরকে খামখা 'জোন' নাম দিয়ে জোন-এ কুশলে কেন ৪.১৮ উইকেট পেয়েছেন তার 'কী-ফ্যাক্টর', কুইজাড্দের জন্য ব্র্যাডম্যানের জুতোর মাপ কিংবা সচিনের কান কটকট করে কি না তার ফ্যাক্ট, এবং এত সবেও যদি কুপোকাত না হন: নারী-সারপ্রাইজ! মন্দিরা বেদি দিয়ে শুরু, আজ ললনার উতরোল স্বাস্থ্য ও নিবুদ্ধিতার প্রদর্শনী ছাড়া ক্রিকেট না-মুমকিন। তিনটি মেয়ের চাঁদমুখ দেখে জনগণ ভোট দেবেন, ব্যস, নির্বাচিত মহিলা হাজির 'শ্যাজ অ্যান্ড ওয়াজ শো'তে। বেচারী শ্যাজ (শাস্ত্রী) আর ওয়াজ (ওয়াসিম)-এর কী ক্যাজ? দুই পুরুষসিংহ না পারেন গিলতে না পারেন খিলতে, খেলা ব্যবচ্ছেদ করবেন কী করে, মধ্যখানে উদ্ভিন্নযৌবনা হাঁদা বসে ইতিউতি তাকালে? অতিথিটিও নাচার, রেকারিং দস্তবিকাশ ও 'সো কিউট' অস্ত্রে বিমূঢ়। কিছু আলাপ, কিছু প্রলাপ, অস্বস্তি ভরে মস্তির ভান, যা তা। ক্রিকেট জানা মহিলা আনতে ক্ষতি কী? হা হা, আরে নীরস বিশ্লেষণের জন্য তো বিদগ্ধ পুরুষটিম স্যালারি পাচ্ছেনই, নারী হল গিয়ে ফর নারী'জ সেক। এর চেয়ে ভাই ডিউস বলের কাঁচুলি লড়িয়ে আইটেম নাস্বার লাগিয়ে দাও না, পাতি-পান 'বোল দ্য মেডেন ওভার' কিংবা অল্প দুট্টু 'ডিপ ফাইন লেগ' লিরিক সহ পিচের ওপর লাঞ্চটাইমে তাঁখে ট্যাশ-খ্যামটা, হাই হিলে স্পট পড়ে গেলে স্পিনাররা বল ঘোরাতে পারবেন!

১৮ জানুয়ারি, ২০০৮

সাহিত্য নয়, সিনেমা নয়, সেরা শিল্প নিশ্চিত ভোররাতের স্বপ্ন। তাবৎ শিল্পের আঁটা-গার্দ পিতা ড্রিম-বাবাজি কবেই ন্যারেটিভ তছনছ করে, বাস্তব-ফ্যান্টাসি অহরহ গুলিয়ে, দাড়িওলার সঙ্গে বাড়িওলা মিশিয়ে, অনির্বচনীয় ককটেল বানিয়ে রেখেছে। এল সেই শিল্পেও খাদ ও স্বাদ মেলানোর দিন, জাপানের ‘তাকারা কর্পোরেশন’ তৈরি করেছে ইচ্ছেমত স্বপ্ন দেখার যন্ত্র ‘ইউমেমি কোবো’। আপনি যার স্বপ্ন দেখতে চান তার একটি ছবির দিকে তাকিয়ে থাকুন ও মেশিনে কাক্সিত ‘স্টোরিলাইন’ রেকর্ড করুন। ব্যস, ঘুমের ‘র্যাপিড আই মুভমেন্ট’-এর সময় আলো, ধ্বনি, বাজনা ও সুগন্ধের সাহায্যে মেশিন আপনার ফরমায়েশি স্বপ্ন টপ টু বটম দেখিয়ে দেবে। ক’দিনের মধ্যেই নির্যাস তাকারা বা অন্যান্য কাকারা বার করবে দোকান থেকে ডিসিডি (ড্রিম কমপ্যাক্ট ডিস্ক) কিনে সুখস্বপ্নের সিস্টেম। তখন আরিবাস, আর্ট থেকে গাঁজা-ইন্ডাস্ট্রি, সবার হাড্ডি পিলপিলায়ে একসা। লোক শুধু ড্রিম কিনছে আর কাঁথা জড়িয়ে খাটিয়ায় উব্বুত। আসলি আমোদ সেমিনারবাজদের। অ্যাডিন তাঁরা মিডিয়া কী ভাবে আমাদের জাগ্রত মগজ গিলেচুষে সাবাড় করল, সেই বক্তিতে ঝেড়েছেন। এখন একটু ক্লিশে হয়ে এসেছে। এ বার ঘুমঘোরেও রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ (অর্ডারি স্বপ্নের মাধ্যমে), পোস্ট-ফুকো ক্ষমতাবাজি, কী ভাবে স্রেফ বিজ্ঞাপিয়ে পপুলার করে দেওয়া হল ফিল-গুড স্বপ্ন, কেন বেদনাময় ক্ষুৎকাতর স্বপ্ন দেখে দম আটকে চাঁচিয়ে জেগে ওঠা হেভি জরুরি, আভারগ্রাউন্ড স্বপ্ন কিনতে পাওয়া যাচ্ছে কোথায়, মেনস্ট্রিম আর আর্ট-স্বপ্নের রগড়ারগড়ি, সরকারি সত্যজিৎ-ড্রিম বনাম সাব-অলটার্ন ঋত্বিক-খোয়াব, মার্কেট কী ভাবে মানুষের একমাত্র স্বাধীন স্পেসও দখল করে নিল, ‘এ বার আমি বন্ধুর বউটিকে স্বপ্নেও পাব না!’ আত্ননাদ ফুরোতে না ফুরোতেই বেপরোয়া পাপ-স্বপ্নের আন্দোলন, এবং অবশ্যই থ্রি-এক্স স্বপ্ন, রমরমিয়ে, সুপার-ডুপার। রামসে ব্রাদার্স-এর ‘হরর স্বপ্ন’ও থাকছে। (‘কলিকাতা স্বপ্নমেলায় দুঃস্বপ্ন বেস্টসেলার। মানুষ তবে কত নীচে ঘুমোচ্ছে’— আনন্দবাজারে রবিবাসরীয়)। নতুন সেন্সর, নয়া শিল্পতত্ত্ব, নিউ স্বপ্নাতেল, নতুন অশালীনতা। ‘এই পুজোয় ধমাকা অফার: স্বপ্ন-সঙ্গিনী তৈরি করুন ভিন্ন নায়িকার ভাইটালস্ট্যাট মিশিয়ে— মাধুরীর হাসি, সালমা হায়েকের ইয়ে, জেনিফার লোপেজের উয়ো!’ মোদা কথা, বহু দিন পর ছত্রভঙ্গ ঘনঘটা এ বোরিং গ্রহে। শুধু ডাহা বেকার হচ্ছেন বেচারী ফ্রয়েড, এবং অবশ্যই, বেদম বোমকে গোঁ-গোঁ ফিট বাগাচ্ছেন ‘ইদ’ (ধর্মানুষ্ঠান নয় রে বাপ, ‘ইগো’ আর ‘সুপারইগো’র ভাই): মানুষ আনস্বপ্নে যাচ্ছে তারই আঙিনা দিয়া! ব্যাটারী ভিনগ্রহে কলোনি গড়লেও, তার হেডাপিসে তালা ঝোলাতে পারে, অবচিন্তার অতীত ছিল।



যে ভাল রাঁধে সে ভাল চুল বাঁধে না, প্রাচীন প্রবাদ। হিট সুরকার বিশাল ভরদ্বাজ ‘মকবুল’ সৃজে তা এমন ভয়াবহ অপ্রমাণ করলেন, গড়িমসি না করে বলা যাক, তিনি এই মুহূর্তে ভারতের শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র-পরিচালক। প্রথম ফ্রেম থেকে বুদ্ধির দীপ্তি, বিশ্ব-সিনেমা আত্মস্থ করার স্বাক্ষর, মাধ্যমটির ওপর তীব্র দখল। পঙ্কজ কপূর একদা বলেছিলেন, পৃথিবীর

কোনও অভিনেতাকে নিজের চেয়ে বড় মনে করেন না। এ ছবি প্রমাণ করে তা কী প্রবল সত্যি। টাবু যখন বন্দুক দেখিয়ে প্রিয়তমের প্রণয়বাক্য আদায় করেন, বুঝবেন প্রেমের ফাঁদ কী অনন্য তরিকায় পাতা যায় সেলুলয়েডে। শেক্সপিয়রের ম্যাকবেথকে যে মুম্বইয়ের অপরাধ-জগতে এনে ফেলা যায়, এবং কষ্টকল্পনার টানাহাঁচড়া ছাড়াই; সাবলীল চিত্রনাট্যে অনায়াসে তিন ভবিষ্যদ্বক্তা ডাইনিকে বানিয়ে দেওয়া যায় দুই দুর্নীতিগ্রস্ত পুলিশ, জঙ্গল এগিয়ে আসার বদলে সমুদ্র ঘরে আসার আশ্চর্য ধাঁধা দিয়ে তৈরি করা যায় ক্লাইম্যাক্স, এমন একটি ভয়াবহ নাটক বলা যায় এতটুকু মেলোড্রামা না পাকিয়ে, আর ক্লাসিক থেকে ইচ্ছেমত গ্রহণ করা যায় আক্ষরিক আনুগত্যের দায় কাঁধে না বহন করে, না দেখলে প্রত্যয় হত না। এবং ছবির বিষয় ইরফান (ম্যাকবেথ)-এর রাজকীয় অপরাধবোধ নয়, বরং তাঁর এই বোধ, যে তিনি গোড়া থেকেই দগ্ধিত। ইরফান অভিনয়ই করেন না, অভিনয় করেন তাঁর চারপাশে সকলে, নাসিরুদ্দিন, ওম পুরী, পীযুষ মিশ্র। ইরফান শুধু থাকেন, তাঁর মুখে কোনও কিছু ঘটান আগে থেকেই এক অমোচনীয় বিষণ্ণতা, প্রথম গানের সময় টাবুর সঙ্গে প্রেমের সিকোয়েন্স থেকেই স্পষ্ট, তিনি জানেন এই প্রেম অশুভ, নিজের অবধারিত পতনের জন্যই যেন বিষণ্ণ শরীর টেনে তাঁর কাজগুলো করে যান। পূর্ণ অন্ধকার এই ছবি সেই ঘরানার, যেখানে প্রাণপণ পালাবার সময় আগাগোড়াই নায়ক জানে তুঙ্গবিন্দুতে সে লুটিয়ে পড়বে পিঠে গুলি খেয়ে, এই এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা শুধু করতে হয় বলে, না করলে চলে না বলে। টাবু শুয়েছিল পাশে, শেষ কালে তো হ্যাঁ, শিশুটিও ছিল, কিন্তু স্বপ্নে কোনও মতেই দৌড়নো যায় না যেমন, এ জীবনে জেতা যাবে না জেনেই যেন তাঁর উত্থান, আক্রমণ, পলায়নপ্রয়াস। তাই শেষ দৃশ্যে অমন নিরাসক্ত হেঁটে যাওয়া, পিস্তল পরিত্যাগ করে, বর্মহীন। দেখে আসুন, বেশি দিন চলবে না, অসামান্য ছবি, এ মুড়ি-মিছরি একাকারের দেশে ফ্লপ করতে বাধ্য।

১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০০৪

মকবুল : দগ্ধিত, প্রেমো



যাঁ হা বা হা ন তাঁ হা ছা প্লা ন?

প্রবল হুলাহুলা। দোলে শান্তিনিকেতন গিয়ে মেয়ে দেখা শেষ, এর মধ্যে মা কালীর দুটি ডান ও দুটি বাঁ সোনার হাত হল, ‘কবে যে কোথায়’ সুদূর ব্যাংককের হাওয়ায় ছেড়ে দিয়ে এল সুতানুটি-গোবিন্দপুরের সোঁদা ডায়লগ, বাংলা টেলিফিল্মে (পরি: অনিন্দিতা সর্বাধিকারী) সৈঁধিয়ে গেল গরগরে ‘আইটেম নাম্বার’। একই নায়িকা আবার ব্যাংককে বিকিনি ও টেলিফিল্মে ‘বঙ্গনজ্জা শিখিনি’ ডিসপ্লে অস্ত্রে কিঞ্চিৎ হইহই। ও দিকে ঢেউ ক’ফিট উঠে উচ্ছ্বসি, ‘এও’-র মতো একটি ব্রাত্য বর্ণ ইয়া ইয়া পোস্টারে ঢুকে পড়ল মেনস্ট্রিমে! ‘এও’ দিয়ে শেষ হয়, এমন শব্দ বলুন: জিজ্ঞাসিলে তাবড় প্রফেসরের মাথা চুলকে টাক আরোপিত হত অ্যাডিন। অন্যের কোলেকাঁখে যুক্তাক্ষর রূপে ছাড়া ব্যাটার অস্তিত্বই নেই, (পুষিদেরও কিছু ছন্দ মেলাবার দায় পড়েনি যে সত্যি সত্যি ‘মিঞা মিঞা’ বলে ডাকবে), তার ওপর ল্যাংড়া ঠুটো বর্ণজঞ্জাল সাফ করতে তিরিঙ্কি খ্যাংরা হাতে বাংলা অ্যাকাডেমি হাঁ হাঁ ছুটে আসছে, হেনকালে গুড়ম অবলুপ্তি থেকে ‘এও’কে বেবাক বাঁচিয়ে, ‘ং’কে থাবড়া মেরে সরিয়ে, লেখা হল, ‘মহলবনীর সেরেএও’। ডিকশনারিবাজরা নিয্যস শেখর দাশ-বাবুকে আশীর্বাদ করবেন। আর হ্যাঁ, ভোট আ গিয়া। একটু অসাবধানে গাড়ি চালালেই মোড়ে মোড়ে মমতাদিদি, সুব্রতদার কাট আউট-এ ধড়াম। যত বড় তাঁদের শ্রীনাম তার চেয়ে সামান্য ছোট হরফে: সৌজন্যে বংশীবদন/ভাগ্নে মদন/ভাইপো রতন। রাখঢাক ভেঙে রাজনীতির স্পনসরশিপ প্রকাশ্যে। নয় কেন? ক্রিকেটারদের পাঁজরে-বগলে লোগোলস্কর আঁটলে অসুবিধে নেই আর দিদির ইস্তিরিহীন আঁচলে অমূল্য রতন বাঁধা থাকলেই আপত্তি? নোট-রেজগির বেহদ দাপটে সংস্কৃতিজগৎ লুটিয়ে কাঁদছে, শুটিং ফ্লোর কানা করে স্টার ও স্টারিগণ মঞ্চে দেশোদ্ধার করতে গেছেন, শোনা যাচ্ছে অনির্বচনীয় সাঁস-কাম-বহু তুলসী অ্যাপিয়ারেন্স ফি সাবড়েছেন ডাহা এক কোটি, বাকিরা কে একলাখি কেউ দেড়লাখি বাংলা সিরিয়ালের লোকরা নেহাত আনলাকি, নিদেন পাঁচশো পাত্তি ঠুকেও কেউ নেয়নি বলে রেগে টং চিত্রনাট্যবাগীশরা ঝাল ঝাড়ছেন ছুইছুই বউদি ও ঠান্মাগণের ওপর— সব সিরিয়ালে এখন এক লোকের দুটো করে বউ! পাঁড় যৌনতাবিরোধী জাতি এ অনাচার হামলে দেখছেন কেন কে জানে, তবে কি সুমতি হল, আবার সেই বহুবিবাহের স্বর্ণযুগ আগচ্ছতি, যখন একটি বউ রাঁধেন বাড়েন একটি বউ খান একটি বউয়ের পাড়ার দেওর জান-পহচান! অবশেষে স্বীকৃত হল গোঁড়াবঙ্গে হারেম রাখার সাধ? প্রথম প্রথম ‘আস্থা’ সিরিয়ালটি হত দিব্যি, বাস্তবানুগ ও পরিণত স্ক্রিপ্ট দেখে সাবাস দেওয়া ছিল বহুৎ, এখন কুণালবাবুর দুটি বউ মৌসুমী ও বিদীপ্তার আকচাআকচির মধ্যখানে আবার ঠাণ্ডা গলার মহিলা-ওঝা শ্রীলা মজুমদার! ‘কবে যে কোথায়’-এ বেচারা অনুশ্রী অনেক দিন ভুগছেন,

তার সতীন দেবলীনারই অধুনা রমরম সংসার। শেষ অবধি 'এক আকাশের নীচে'তেও ছুটকির সুখের ঘরদোরে আগুন লাগল বলে, প্রেগন্যান্ট সহ-বউ জাঁকিয়ে বসেছেন, দিব্য সন্ন্যাসিনী বনে আশ্রমে গিয়েছিলেন, এখন কোথেকে কী মতলব ঠাহর দিচ্ছে না। যাই হোক, 'লাইফ ইমিটেটস আর্ট' সূত্রে ফেরত আসুক কুলীন প্রথার আমোদগেঁড়ে দিবসরাজি। ইয়াহু।



হিন্দি সিরিয়াল অবশ্য তাবৎ পথে বহুদিন এগিয়ে, বাইগ্যামি আর নাজায়েজ আওলাদ তো পিলপিল করছে, (আমরা অলওয়েজ-অলরেডি উহাদেরই নকলনবিশ), ও-ভাষার সিরিয়ালে হালে অভিনব কাণ্ড: 'আক্ষরিক ইন্টারটেন্টিভুয়ালিটি'! উহা কী? আরে পেপসি-র 'ডু দ্য ডিউ'-কে ভেঙিয়ে স্পাইট 'ঝাড়ি কে পিছে' করল না? আগের অ্যাডটা না দেখা থাকলে আপনি প্যারডি-বিজ্ঞাপনটা বুঝতে পারতেন? এই যে পেরেছেন, তার কারণ হল, অন্য 'টেক্সটা'টাও আপনার 'পড়া' আছে। সাম্প্রতিক তো জমিয়ে দিয়েছে মিরিভা। প্রথমে দেখে ভাববেন, 'হাচ'-এর নয়া বিজ্ঞাপন। বাচ্চা প্লাস থ্যাবড়ামুখো কুকুর। বালক যেখানে যায়, ছোটকুন্তো ধায়। তার পর? ছেলেটি বের করে মিরিভা। ব্যস, রক্ষে নেই, মিঠে ডগি খেঁকুরে গরগর, স্বাদের লোভে ক্যারেকটার সাঁৎ হড়কানি। অ্যাড-টার গোটা মজাই দাঁড়িয়ে আছে সুপার-ডুপার হাটীয় পূর্বসূরির ঘাড়ে ভর দিয়ে, অর্থাৎ অন্য এক 'টেক্সট'-এর প্রেক্ষিতে। হিন্দি সিরিয়াল খেলছে আরও সহবাগ, এক সিরিয়ালের চরিত্র আর এক তুতো-র সিংহারে সটান বেমক্কা ঘা। সে দিন 'কসৌটি জিন্দেগি কি'-র এক মেয়ের সঙ্গে 'দেশ মে নিকলা হোগা চাঁদ'-এর ছেলের বিয়ে হল। 'দেশ মে'-র অন্যান্য চরিত্ররাও শুভদিনে দিব্য নেমন্তন্ন খেতে এলেন। অর্থাৎ দেখতে বসেছেন 'কসৌটি', কিন্তু বিস্ফারিত সারপ্রাইজে বোনাস পেলেন অন্য হিট সিরিয়াল-বাবুবিবিও! আবার 'পিয়া কা ঘর'-এর অসুস্থ বউকে দেখতে আসছেন 'অস্তিত্ব এক প্রেম कहानी'-র ডাক্তার। না না, একই অভিনেতা দু'রকম চরিত্র করছেন বলছি না, এই সিরিয়ালের চরিত্র তার সব ইতিহাস-ভূগোল অক্ষুণ্ণ রেখে সৈঁধিয়ে যাচ্ছে ওই সিরিয়ালে! তার পর ধরুন, 'হসরতে' শেষ হয়ে গেছে; সেখানে হর্ষ ছায়া বিয়ে করেছিলেন মৃণাল কুলকার্নিকে, পরে শেফালি ছায়ার সঙ্গে থাকতে শুরু করেন। এ বার 'অস্তিত্ব এক প্রেম कहानी'র নায়িকা সিমরান সাইকিয়াট্রিস্ট-বন্ধুর চেম্বারে দেখা করতে গেছে, পেশেন্ট হিসেবে এলেন মৃণাল কুলকার্নি, তাঁর 'হসরতে'-র কেস হিস্ট্রি অটুট নিয়ে। সিমরান তাঁর সঙ্গে আইডেন্টিফাই করছেন, কারণ এ সিরিয়ালে নিজের অনুরূপ দুরবস্থা। আন্দাজ পাচ্ছেন, কী সাংঘাতিক কাণ্ড! গোদার এ জিনিস করলে ক'টা প্রবন্ধ ফাঁদা হত? যাদবপুর ফিল্ম স্টাডিজ-এ পাক্কা দু'সেমিস্টার লড়তে হত তাৎপর্য বুঝতে। যে ভাবে এক টেক্সট খুল্লমখুল্লা অন্য টেক্সটে ঢুকে পড়ছে এবং তাকে কিয়দূর গড়ছে পিটছে (এবং দর্শকের চোখে নিজেও বিলক্ষণ পান্টাচ্ছে আদল), বখা হোস্টেলছেলের ন্যায় সিরিয়ালের পোক্ত কাহিনিপাঁচিল ডিঙিয়ে চরিত্ররা স্লুডুংসাডুং খেলে আসছে অন্য সিরিয়ালের মাঠে, গল্পের-চিত্রনাট্যের কনভেনশন-সম্মত বর্ডার ভেঙে যাচ্ছে, চরিত্রের পরিধি-আনুগত্য উবে যাচ্ছে, অথর ডেড কি মশাই যাকে বলে স্টিলবর্ন, যবেতবে অন্য ডিরেক্টরের চরিত্র ব্যবহার

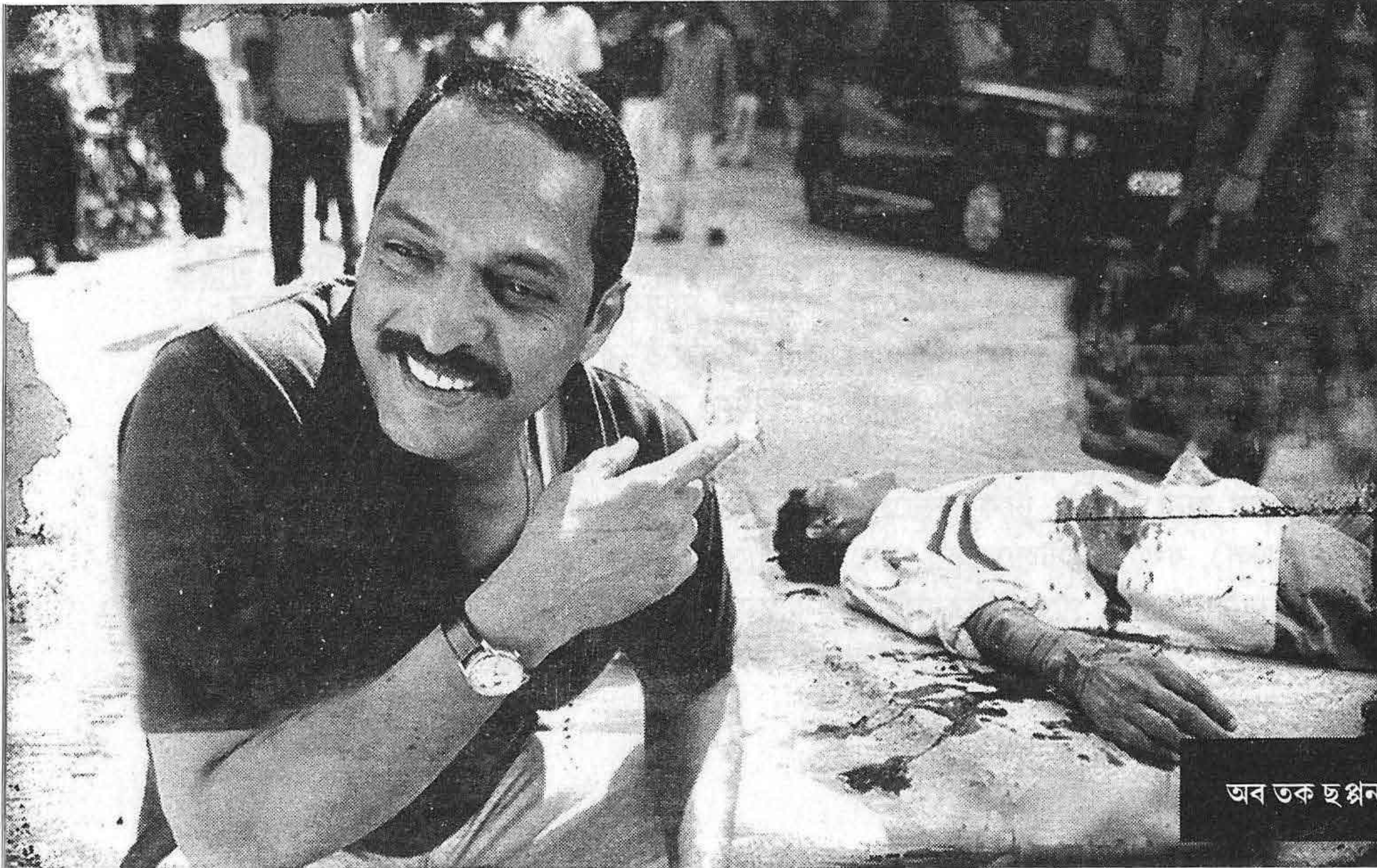
করতে হতে পারে, সব সিরিয়াল না দেখলে আপনি কোনও সিরিয়ালই সম্যক বুঝতে পারবেন না : এ স্বার্থে এমন ভয়াবহ শিল্প-বিপ্লব ঘটে চলেছে, কোন দিন রোলাঁ বার্থকে সেকেন্ড বার্থে তুলে একতা কপুর নকশাদার পোস্টমডার্ন সতরঞ্চি বিছিয়ে টানটান নিদ্রা যান দেখুন।



বহু দিন ধরে না না করে এ বার হ্যাঁ বলতেই নানা একেবারে স্লগের মার, চতুর্দিকে 'যাঁহা বাহান্ন তাঁহা তিগ্নান্ন' নাতিগুপ্তিকে আয়রনমুষ্টিতে লোপাট। যাঁহা তাঁহা কদাপি ছাপ্পান্ন নহে! 'অব তক ছপ্পন' (রিটার্ন অব দ্য পটেকর) দৌড়ে দেখুন, লোকটির ক্যাজুয়াল নির্মমতা, শীতল ৪৪০ ভোল্ট, চুপ ভেতরকান্নার সম্মোহন পূর্বচেনা, তবু কিয়ৎকাল লাপাত্তা তো, তাই ফিরসে নতুন। কিছু প্রবল যুক্তি-ফাটল চিত্রনাট্যে, কিন্তু ঝাপ করে নিৎসের কোটেশন দিয়ে ছবি শুরু, বেড়ে সংলাপ, জুনিয়রের উচ্চারণ ঠিক করে দেওয়া বা পকেট বিলিয়ার্ডস খেলা নিয়ে নানা-র ইয়ার্কি, চালু খিস্তি, গুলির সামনে দেশপ্রেম অপেক্ষা আপন জান বাঁচাবার সত্যি+সিনিক দর্শন, হৃদমুদ্র সপ্রতিভ। এইটা মুঠো করে ফেলল হিন্দি সিনেমা : আন্তর্জাতিক স্তরের তরতরে স্মার্টনেস। রামগোপাল ও শাগরেদরা কী অনায়াসে হিংসা আর রক্তের গরগরে ফোড়ন ছড়িয়ে জিভে-জল 'বাস্তব কষা' গরমাগরম সার্ভ করছেন, প্রত্যেকের

অভিনয় যথাযথ, হাউহাউ
আবেগ বাতিল, মানুষ
একমাত্রিক হয় না : মূল
শোলোকটি অধীত। বাংলা
ছবিতে পঞ্চ অন্ন-ব্যঞ্জন
মিলিয়ে কেতন বিজ্ঞস্বর, কিন্তু
গড় ন্যাকন্যাকে কাঁদুনির
চোটে নম্বর উঠবে, মম্,
মেরেকেটে পঞ্চগান্ন!

২১ মার্চ, ২০০৪



অব তক ছপ্পন

পৌ জি শ ন ধ র্ম জি রা ফ

শুভা নাভাভাসী এবং একলা বৈশাখের প্রথম সূর্যবল্লমটি কুরিয়ারে ল্যান্ড করা মাত্র চকিতে দিকে দিগন্তরে এস এম এস প্রক্ষেপণ (যে কথা বলোনি আগে এ বছর সে প্রোপোজ করো), পার্টি-আহ্বান (অফিস গোলি মার ইয়ার, ইটস আওয়ার ওন নিউ ইয়ার!), পাঁঠা-গপগপ (কাল থেকে ফের কোলেস্টেরল-যত্ন লাগু), ও দিকে চ্যানেলে চ্যানেলে ঐকিয়ে বৈকিয়ে গদগদ বাংলামি, হা বাঙালি কোথা গেলি রব, আগে নাকি বাদল মেঘে পষ্ট রবীন্দ্রনাথের মুখ, আজি নধর পুঞ্জ কৃষকলি বিপাশা বসু। পাকামি-ন্যাকামি উভয়েই অ্যালার্জি থাকলে, মলম জোগাবে দু'দিন পূর্বেই গাজন-চড়কের মজা-আঁকড়া নস্টালজিয়া-সফর, সারি সারি কালীঘাট হইতে উৎক্ষিপ্ত সংবাবাজিরা, রঙেচঙে গাঁজাখেকো মহাদেও তো সেজেছেই (এ তো ভোলাবাপেরই দিবস), এ ছাড়া 'লোক-গো অ্যাজ ইউ লাইক' মাতাচ্ছেন রাম-লক্ষ্মণ, ভক্ত হনুমান, পঞ্জাবি সন্ত, লীলাবিলাসী রাধাকেষ্ট। আরও: ব্যাডেজ-বাঁধা কুষ্ঠরোগী, খাঁচা হাতে পাখিওয়ালা, ঝাঁটাসহ জমাদার, খটখটে কাঠের পুতুল, আর সমাজচেতনার দ্যোতক? হুঁ হুঁ, সে ভি বর্তমান, আধসেদ্ধ-ফেমিনিষ্ট বেমক্কা খুশি হবেন: বৃদ্ধ স্বামী-কচি বউ, খোঁড়া স্বামী-সুন্দরী বউ, প্রহার খানেওয়ালা নির্যাতিতা বধূ, আর তার পরেই স্ত্রী ছড়ি ঘোরাতে ঘোরাতে চেন দিয়ে বাঁধা স্বামীকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে, স্বামী তুড়ক লাফে অনুগমনকারী! এ পার্বণের ভয়াবহ অ্যাডভেঞ্চার-স্পোর্টস কিছু কমতি না, কালীঘাটে এক জনকে উন্টো ঝুলিয়ে আঙনের ওপর দিয়ে দোলদোলানো, চড়কডাঙায় কার পা দুটো রডের সঙ্গে বেঁধে বাঁইবাঁই করে লাটু, চেতলা বাজারে তুলকালাম বাঁটিঝাপ, কলাগাছের গুঁড়িতে গাঁথা এক নয় দুই নয় আটখানা খোলতাই চকচকে বাঁটি, তার ওপর বহু উঁচু থেকে অকুতোভয় হুহু ঝাঁপাচ্ছে ধার্মিক জিমন্যাস্ট। যদিও না 'এ এক্স এন' এক খণ্ড 'ডু অর ডেয়ার: দ্য বঙ্গোদ্যম চ্যাপটার' সাড়ম্বর প্রোমোসহ বাগাচ্ছে, এ শাদুলবেঙ্গল রবে মেনস্থিম-উপেক্ষিত। কিন্তু পেলায় প্রতিষ্ঠাপ্রয়াস: কারা অ্যাকাডেমি চত্বরে খাস বাঙালিয়ানাখচিত বর্ষবরণ করতে লাঞ্চ রাখল পান্তাভাত, বেগুনপোড়া, শুটকি মাছ, লঙ্কা ও পেঁয়াজ! বোধহয় রণ-পা চড়ে পরিবেশন হবে! তিরিশ ফুট ওপর থেকে থ্যাপ বেগুনপোড়াপতন। আর দেরি নেই, এ সব লাখ টাকার স্টেজ বেঁধে গ্রাম বাংলা ফলানো 'বাঙালি হবি নে মানে? মুখে বাঁশ পুরে দোব' বাবুরা সমবেত খুরপিতে পিচরাস্তা খুঁড়ে শহরকাড়া ওই রাঙা মাটির পথ বিছাবেন রেড রোডের স্থলে, বছরকার দিনে কপালী গাই টানবে মারুতি এস্টিম, 'রামতনু লাহিড়ি থিম নাইট'-এ 'গোহাড়' 'গোহাড়' চিল্লিয়ে এইসান গুলতি টিপ, ঠকাং করে অভ্যাগতর ললাটে। টি-শার্টে জীবনানন্দের লাইন লিখে ঘুরলেই বিশ্ববাজারে বাঙালি সৌধিয়ে দেওয়া গেল, তাইলে আর বখেড়া কী, ভিকট্রি ল্যাপের গোড়াতেই ছুটছে সহারা-র শাড়িঘোমটা ঝঙ্কাসায়িত

‘সাহেব বিবি গোলাম’ এবং অবশ্যই যে বঙ্গীয় ধ্বন্যাত্মক অব্যয়সমূহ থাবা বসাল খোদ হিন্দি বিজ্ঞাপনে: ‘এপাং ওপাং ঝপাং’!



বাঙালির আসলি ভোটোৎসব কিন্তু খতম। ‘সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি কে?’— বিবিসি-র বেঙ্গলি সার্ভিস ফেব্রুয়ারি-মার্চ জুড়ে সার্ভে করলেন শ্রোতাদের ভোট। ইহা হালফিল ফ্যাশন, ‘সেরা জার্মান’, ‘সেরা ফরাসি’, হরেক কনটেস্ট নিয়ে জমজমাট রেডিয়ো প্রোগ্রাম, টিভি শো, এ আসরেও সবাইকে সেরা পাঁচ বাঙালির লিস্ট বানাতে বলা হল, তা থেকে কুড়ি জনের ফাইনাল তালিকা তৈরি। সর্বসেরা বাঙালি হলেন শেখ মুজিবুর রহমান। বেশ কিছু ভোটে হেরে দ্বিতীয় স্থানে আদি ও অনিবার্য দাড়িওলা ভগবান রবিবাবু। তৃতীয় নজরুল। সত্যজিৎ ১৩ নম্বরে, অমর্ত্য ১৪। পাঁচে নেতাজি, সাথে জগদীশ বসু, আটে বিদ্যাসাগর, এগারোয় তিতুমির। লক্ষণীয় মজা: এই মহাপুরুষ-র‍্যাঙ্কিং অভ্যাস। নেপোলিয়ন লড়ছেন লুই পাস্তুর আর ভিক্টর হুগোর সঙ্গে, কিংবা বেঠোফেন সরু মার্জিনে হেরে গেলেন মার্ক্সের কাছে, শুনতে বেজায় আমোদ, এবং একেবারে গাড়লপনা। বিরিয়ানি ভাল না পায়েস, এ যেমন তর্ক হয় না, রবীন্দ্রনাথ বড় না বিদ্যাসাগর, মাপবেন ক্যায়সে? তাঁদের ক্ষেত্রগুলো তো সম্পূর্ণ আলাদা। কে রায় দেবে অসামান্য কবিতা লেখা বড় কাজ না চড়চড়ে রোদ আর মুষল বৃষ্টিতে সারা বাংলা ঘুরে ঘুরে ইস্কুল পরিদর্শন ও বিধবাবিবাহ আন্দোলন? বোম মেরে ফাঁসি যাওয়া ভাল না বিপ্লব ছেড়ে পণ্ডিচেরি গিয়ে আধ্যাত্মিক অধ্যবসায়? অতও যেতে হবে না, গাওস্কর বড় না বচ্চন বড়, বলুন দেখি? আরও ঝঞ্জাট, ‘সোনার কেল্লা’ সহজ আনন্দময় আর অর্থনীতির থিয়োরিটিয়োরি হেভি বাঁশ, অমনি সত্যজিৎকে অমর্ত্যর চেয়ে এগিয়ে দিলাম, এ ভাবে বৈঠকি তক্কো হয়, লিস্ট ঘোষণার মানে আছে? যদি এ সব ভেঙে সোজা রবি ঘোষ বনাম জহর রায়ও হত, তাইলেই বা ফাঁদে পা দেব কেন? কেন র‍্যাকে কৌটোবন্দি সাজাতে হবে শ্রদ্ধা-সমীহ? ব্যাপারটা খুব সরলসিধে নয়, এই তালিকাবাজির মধ্যে বহুবর্ণ পলাকাটা জীবনকে বোদা একরঙা বানাবার, সিঙ্গল তাঁবুতে ঠেলেঠুলে ঠুসে দেওয়ার প্রবণতা আছে। আরও ভয়ের, ‘সবাই তার মতো করে দিব্যি’ না বলে এ রাজত্বে একটা বাধ্যতামূলক উঁচু-নিচু ভাগ করার বখেড়া উঁকি দেয়। যেই বললাম, এ ওর চেয়ে ওপরে, অমুক তিন ধাপ নীচে, তা থেকে জন্মাবেই দাঁতখিঁচোনো বনামপনা, তোমার র‍্যাঙ্কিংকে আমার অস্বীকার, শেষে ঋত্বিক-শিবির = গাঁজাখোর, সত্যজিৎ-শিবির = সেফ খেলুড়ে: লেবেল সাঁটার মূর্থতা, নোংরামি। মাঝখান থেকে দুই জিনিয়াসেরই ছবি এনজয় করার অপার পুলকের দফা গয়া। আরে, জগতের আনন্দফিস্টে বহুবিচিত্র মেনুর পুরোটাই চাখব, তবে তো আমি সাচ্চা রসিকপ্রবর। এই ‘হয় ধর্ম নয় জিরাফ’ চক্রান্ত আর একটু বাহ্য, মম জীবনে তো রবিবাবুও আছেন, মহম্মদ কাইফও, আমি সেতার শুনে আনন্দ পাই, এফ টিভিতে মডেলদের গড়ন দেখেও, কেন সবাইকে নিয়ে দেঁড়েমুশে বহুমাত্রিক বাঁচব না? ফার্স্ট-সেকেন্ড, সংস্কৃতি-অপ, সমর্থন-বয়কট, খোপখোপানি লেলিয়ে দেব

কেন? আড্ডায় দেখানেপনা, পার্কে একাকীত্ব, সবটা খেয়েমেখে অনন্তমুখী কার্জনপার্কীয় মৃষিকসুড়ঙ্গের ন্যায় জীবন।
ধর্ম/জিরাফ বাঁটোয়ারা, শ্রেণিশত্রু-স্পটিং চুলোয় যাক, আমাগো জব্বর পোজিশন 'ধর্মজিরাফ'।



সিরিয়াল ইদানীং চলে শতাব্দী জুড়ে, কখন কার মন উঠে যাবে, দাম্পত্যের মতোই, কিছু বলা যায় না। আমাদের 'এক আকাশের নীচে' এ সব ঝড় ম্যানেজ করে সাদাসিধে উপায়ে, পুরনো অভিনেত্রী গৌঁসা বা বিয়ে করে ভাগলবা হলে, নতুন লোকটিকে স্টিল করে লিখে দেওয়া হয়, এ বার থেকে এই চরিত্র ইকুয়ালটু ইনি। দর্শকের সামান্য ঝাঁকি লাগলেও, মেনে নিয়ে নিয়ে দিন গেল মেনে নিতে, নো ঝামেলা। ব্রেখট জানা থাকলে অন্য ব্যাখ্যাও দিয়ে দেওয়া যেত: 'এলিয়েনেশন', সিরিয়াল বাস্তব নহে, দর্শককে তা টের পাওয়াবার জন্যই, ইত্যাদি। কিন্তু মহাজনেরা যে পইপই বললেন, দুর্বলতাটাকে জোরের জায়গা করে নাও, ফলো বাগাল সম্প্রতি এক হিন্দি সিরিয়াল 'কহানি ঘর ঘর কি'। অভিনেত্রী-ঝাঙ্কাটের সংকটকে চিত্রনাট্যের ঝাঁকবদলের লক্ষিৎ প্যাড করে নেওয়া হল। নায়িকা সাক্ষী তনওয়ারের ঝামঝামে দুর্ঘটনা ঘটল, মুখে তো প্লাস্টিক সার্জারি করতেই হবে, ভয়াবহ অবস্থা। প্লাস্টিক সার্জারির পর দেখা গেল, ও মা, এ যে জয়া শীল! হিন্দি টেলিনাটো ছিল মৌলি গঙ্গোপাধ্যায় হয়ে গেল শ্বেতা সালভে, এ তো হামেশাই হচ্ছে। কিন্তু কেমন শিল্পোচিত অজুহাতে এ কাণ্ডটি হাসিল হল ভাবুন। মুখে প্লাস্টিক সার্জারি হলে যে বদলে যায় মানুষের গোটা শরীরের গড়ন, চলন, বলন, গোটা ব্যক্তিত্বটাই, এ কথা কে না জানে! অবশ্য খুব স্মৃতিবানদের ব্রেন চুলকোবে, দূরদর্শনে 'টাইগার' সিরিয়ালে ছব্ব এ বস্তু ঘটেছিল। গোয়েন্দা ঝামভ শুরু প্লাস্টিক সার্জারি অস্ত্রে ম্যাজিক, অন্য অভিনেতা! তবে, সে তো তেমন বাঘা সিরিয়াল ছিল না, ইতিহাস লেখার সময় পক্ষপাতে সটান বাদ।



একই চোতাখণ্ড দেখে টুকে দুই নির্বোধের সম্পূর্ণ আলাদা দুটি ফেলু-পেপার প্রসব দেখেছেন কভু? 'আনফেথফুল' ছবি থেকে আপাদমাতা টুকলেন করণ রাজদান (হাওয়াস) এবং অনুরাগ বসু (মার্ডার)। দুটি ছবিই বসে দেখা যায় না। আক্ষরিক টুকলি বেশি করেছে 'হাওয়াস', নির্লজ্জ ভাবে দৃশ্য জেরক্স। 'মার্ডার'-এও তা আছে, তবে বেছে ও ভেবেচিন্তে, বেশি নজর মূল সুরটা টোকার দিকে। দুয়ের মধ্যে এটিই মন্দের ভাল, কিছু মৌলিকতা ফলিয়ে বিবাহিতার লীলাসঙ্গী এখানে প্রাক্তন প্রেমিকই, আনখা আগন্তুক নয়। কপি ঘটেছে মোক্ষম দৃশ্যের ডিটেল্‌স, প্রথম অন্য পুরুষে উন্মোচনকালে অনবরত থরথর শিউরে কেঁপে যাওয়া, খুনের আগে প্যাশনবিছানা দর্শন। রগরগে যৌনতা? এই কাঁচকলা। নিতান্ত গড়পড়তা ক্লিভেজ ও চুস্বন প্রদর্শনী, মিউজিক ভিডিয়োদের কাছে অ্যাপিলে গোহার হারবে। মার্ডার-এর নায়িকা তবু কিছু খোলা পিঠ দেখিয়েছেন। তার টানে না মজে শিক্ষিত দর্শকের পিঠটান দেওয়াই সম্ভব।

ইঙ্গমার ও বঙ্গমার

অ্যাঙ্গিন য়াঁরা জানতেন, সুপারম্যান আর স্পাইডারম্যান-এর মেজোভাই হচ্ছেন 'বার্গম্যান', তাঁদের মুয়ে আগুন। বাংলা টেলিফিল্মে (অগ্নিদেব চট্টোপাধ্যায়ের 'আর নয়') সটান টুকে দেওয়া হল বার্গম্যানের 'দ্য সেভেন্থ সিল'-এর দৃশ্য, পৃথিবীর ইতিহাসে সবচেয়ে চমকপ্রদ সিনে-মুহূর্তগুলির একটি: মৃত্যুর সঙ্গে দাবাখেলা! খেললেন লকেট চট্টোপাধ্যায়, মৃত্যুর গজের মুখে নৌকো ঠেলে, ফোঁপানিসমৃদ্ধ মোনোলগে বার বার নৌকোডুবি ভিক্ষে করলেন। হিন্দির বদলে সুইডিশ ছবি থেকে টুকলি: গর্ব কম? তবে কিনা, অনেকের মতে ইঙ্গমার বার্গম্যান এই গ্রহের সর্বশ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্রকার, এই দৃশ্য দিয়েই তাঁর বিশ্বজয় শুরু, ধাঁ করে জিনিয়াসের ভাবনাকে বামন-পায়ে মাড়িয়ে আলফা বাংলার ট্যালট্যালেরে ঝোলে চুবিয়ে দিলে বড় অসহায় লাগে। যেন কাঁসার বাসনের সঙ্গে কিঞ্চিৎ নোবেল গেঁড়িয়ে দিলাম। আজ যদি আমার সিনেমায় ছোট ভাইবোন কাশভর্তি মাঠে ছুটে ট্রেন দেখতে যায়, সে কি ভাল? ইঙ্গমারের এই বঙ্গ-মার খুব সুরুচির ময়দান রচনা করেছে না। তার মানে এই নয় যে এ দৃশ্যকে লগা দিয়েও ছোঁওয়া বারণ। ধ্রুপদী বলেই চুটিয়ে প্যারডি করার সুযোগ পেলায়। এই তো 'বিল অ্যান্ড টেডস বোগাস অ্যাডভেঞ্চার' ছবিতে বিল ও টেড মরে যাওয়ার পর, উক্ত দৃশ্য ভেঙিয়েই মৃত্যুর সঙ্গে বাজি রেখে ইনডোর-গেমস খেলতে নামে, তাকে গো-হারান হারিয়ে জীবন জিতে নেয়। মৃত্যু ব্যাটাকে প্রবল গাঁইগুঁই এবং চোরামির চেষ্টা করতেও দেখা যায়!



কিন্তু এটুকু বলে থামলে অবিচার ঘটবে। 'আর নয়'-এ উজ্জ্বল দিক বিস্তর। এত অদ্ভুত ও সাহসী ছবি বাংলাবাজারে করতে অপরিমেয় ধক চাই, সে বাহাদুরিতে চিত্রনাট্যকার অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়ও শামিল। থ্রিলারের ছাঁচটুকু 'ডায়াবোলিক' ছবি থেকে হাত, কিন্তু আমূল হাড়মাংস সংযোজিত। মা বলছেন আমার ছেলে অস্বাভাবিক, জেনে বিয়ে করছ? ভাবী পুত্রবধূ: আমার ভালবাসার প্রতি আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে। উত্তরে মা 'ভালবাসা!' বলে খসখসে শুকনো হেসে ওঠেন, হাড় হিম হয়ে আসে। বোঝা যায়, চেনা গতে বাজছে না। ছবিতে একটি বাড়তি চরিত্র নেই, ন্যূনতম ইনফর্মেশন ছাড়া কিছু দর্শককে জানাবার হাঁকপাঁক নেই, ক্যামেরা (বাদল সরকার) দারুণ। প্রবল লক্ষণীয়, শুধু যৌনতার তারে গোটা ছবিটা বাঁধা: ধর্ষকামের অন্তরে এমন পূর্ণ পর্যটন তেড়ে স্যালুটযোগ্য। নায়ক এক স্যাডিস্ট ইন্টেলেকচুয়াল, অন্যকে অত্যাচার করে অসম্ভব পুলক পায়, মেয়েদের ব্যবহারের সময় চুলের গোড়া মুঠো করে টেনে আনে, বউকে



সেভেস্টিয়ান সিল : এ বার ডান দিকে শুধু লকেট চট্টোপাধ্যায়কে ভাবুন

উপর্যুপের ক্ষমাহীন চড় মেরে চলে : বলো, 'লাগছে', বলো! শালিকে অর্ডার করে জুতো খুলে দিতে, রাত্রে ঘরের দরজা খোলা রাখতে, ভোগ করে কোমল গায়ে জ্বলন্ত মোমের গলন্ত ফোঁটা ফেলে। আবার চাইকভস্কির সিডি শুনতে তড়িঘড়ি বেরিয়ে যায়, সার্জ আওড়ায় নিজ সমর্থনে। নিজের উচ্চনাশা ইমেজে স্নান করে, স্ত্রীর 'বিউলির ডাল'সর্বস্ব সত্তাকে হুল ফোটায়। কুণাল মিত্র অসাধারণ অভিনয় করেন কিছু দৃশ্যে, অনন্যা চট্টোপাধ্যায়ের যৌন দীপ্তি অনস্বীকার্য। শেষে যখন এক তুমুল মোচড়ে বোঝা যায় শালি আসলে ভালবাসে জামাইবাবুকে, প্রেম করে— তার তীব্র অত্যাচার উপভোগ করার পরোক্ষ ইঙ্গিত বাঙালিকে অথৈ জলে ফেলে দেয়। একদম শুরুতে মনুষ্যজীবনের অবধারিত গোঙানি বিষয়ে কবি ফ্রান্সিস থম্পসন-এর উদ্ধৃতিটি ছুঁয়েই ছবিময় ধড়াসধড়াস করে গাড় অন্ধকারের ঝাঁঝালো আরক।

ধুম্ভুমার গুলি চালিয়ে আর ঘুঁষি পাকিয়ে জগদ্বিখ্যাত মেল গিবসন এ বার ছবি তুললেন যিশুর জীবনের শেষ বারো ঘন্টা নিয়ে, 'দ্য প্যাশন অব দ্য ক্রাইস্ট', বাইবেলের সেল মারকাটারি, বক্স অফিস উপচে আকুল। ছবিটি তৈরি প্রাচীন 'অ্যারামিক' ভাষায় (যে ভাষায় যিশু আদতে কথা বলতেন), ইংরেজি সাবটাইটেল আছে। যিশুর প্রতি এমন ভয়ঙ্কর অত্যাচার দেখানো হল সমগ্র ছবি জুড়ে, টানা, বিরতিহীন, আবার, আবার, মার খেতে খেতে একটা চোখ বুজে গিয়েছে, ঠোঁট ফুলে উঠেছে, সারা গায়ে শুধু কাঁটাওলা চাবুকের হিংস্র ছোবল, সেই চাবুকের উল্লসিত সপাং, ক্রুশবহন, দয়ার করতলে অকরণ পেরেক পোঁতা এমন অনুপুঞ্জে দেখানো হল, নরম দর্শক সিটেই লুটিয়ে পড়বেন, সমালোচকরা চোঁচাচ্ছেন : অ্যাকশন ফিলিম! কিন্তু অসামান্য, এই সাহস, প্রফেটের অমানুষিক সহন দেখাতে ঈশ্বরের প্রতি মানুষের ক্রমাগত পশুগিরি তুলে ধরার চিন্তা। শব্দ-ছবির যুগলে প্রতিটি মার বুকে এসে লাগে। 'ও মা গো, থামাও' বলে



দ্য প্যাশন অব দ্য ক্রাইস্ট : হিংসা দেখিয়ে অহিংসা প্রচার?

আর্তনাদ করতে ইচ্ছে হয়। গিবসন বলেছেন, উনি দেখাতে চান, যিশু কী পরিমাণ সয়েছিলেন আমাদের পাপক্ষালনের জন্য। কিন্তু দেখতে দেখতে আরও মনে হয়, সমষ্টি কী ভয়ানক ভাবে যুগে যুগে একলা-কে দলছে। প্রতিরোধহীন মানুষ, যার থেকে প্রত্যাঘাতের আশঙ্কা নেই, তাকে এমন হামলে পড়ে প্রহারের মধ্যে কোথায় যেন বৃদ্ধাকে সবাই মিলে ডাইনি বলে পুড়িয়ে মারা, তরুণীকে সহর্ষে ন্যাংটো করে গ্রাম-ঘোরানো, জেলখানায় কয়েদির হাতে তক্তপোশের পায়া চেপে তার ওপর বসে তাস খেলার ছবিও আছে। যিশুকে মারার জন্য, সে মার দেখার জন্য জনতার যে ঠেলাঠেলি, উৎসাহ, তা বাইবেল ছাড়িয়েও বলে, মানুষকে বেদীতে তুলতে আমাদের মন যতটা উছলোয়, তাকেই ঘাড়ধাক্কা মেরে বধ্যভূমিতে নিয়ে যেতে কম পিছলোয় না। তারিয়ে তারিয়ে সহ-মানুষের মরে যাওয়া দেখার ব্যত্যয় তাঁর ক্ষেত্রেও হয়নি, যিনি জগদাদদের হয়েও ক্ষমাভিক্ষা করেছিলেন। আরও: যিশুর জীবনের কিছু বিবরণের জন্য গিবসন ব্যবহার করেন অসম্ভব ছোট ছোট ফ্ল্যাশব্যাক, মেরি ম্যাগদালিন-এর গোটা ঘটনা দেখানো হয় একটি মাত্র শটে! যিশু আমাদের দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে, আউট অব ফোকাসে সবাই পাথর ছুঁড়ে মাটিতে ফেলে দিচ্ছে, ফ্রেমের বাঁ-দিক থেকে ঢোকে মেরি-র হাত, পরে তার মুখ, ঠোঁটে সে যিশুর পদপ্রান্ত ছোঁয়। ব্যস, আর কিছু না। শয়তান হিসেবে বার বার আসে ছেলে+মেয়ে এক চরিত্র, যিশুর গ্রেফতারের আগে চরম সংশয় ও প্রার্থনার রাত্রে সে হিলহিলে সাপ পাঠায়। আত্মসন্দেহের প্রতীক সেই সাপকে যিশু পায়ে পিষে মেরে ফেলেন। হলিউডি হিরোর তুমুল দুঃসাহস যে পরিচালনা-প্রতিভায় অনূদিত হতে পারে: যিশু-কৃপার স্বাক্ষর নির্ঘাৎ।



আরিব্বাপ, কী গরম পড়েছে বলুন তো, সুষমা স্বরাজ অবধি ন্যাড়া হতে চাইছেন (অজুহাত অন্য)। এ দিকে ইন্ডিয়া-পাকিস্তানের পর নয়া হিট-ওয়েভ: ভোট। ইলেকশন কভারেজ-এ তো এন ডি টিভি-র কাছে সব নসি, একটি বাংলা চ্যানেল ইংরিজিমাফিক হতে চেয়ে প্রখর দাবদাহে সবাইকে কোট-প্যান্ট পরিয়ে কেতাদুরস্ত, সামনে খোলা ল্যাপটপ। বহু নজর করেও প্রতিবেদক রেজান্ট ঠাওর করতে পারেন না, শেষে কি-বোর্ডে লুকনো কাগজ চোখের কাছে তুলে ধরে পড়তে লাগলেন! এন ডি টিভি-র 'গুস্তাকি মাফ'-এ সব রাজনৈতিক নেতার বদখত পুতুল গড়ে, তাদের গলা নকল করে, ভেঙিয়ে, দিনের দিন মজার স্কিট চলেছে। সে দিন এলেন হরকিষণ সিং সুরজিত-এর পুতুল। প্রশ্ন হল, 'দাদা, আপনাদের এক কমরেডের একটা মাস্তুর কথার ধাক্কায় সেনসেব্র সাতশো পয়েন্ট পড়ে গেল?' সুরজিৎ: আরে, এত দিন ধরে এত কথা বলে এসেছি, কেউ পাত্তাই দেয়নি, আজ বুঝব কী করে, আমাদের বাকি পাবলিকে বিশ্বাস করবে!

চো প! ক ল চ র চ ল ছে

রবীন্দ্রসদনে ৭ জুন অনুষ্ঠিত ‘ঋতুসুখে বিবর্ণ কবিতা’ নাটক তো শোর মচিয়ে ছল্লাট! সংস্কৃতিমান সংগঠনরা পাইপাই ডেপুটেশন জমা দিচ্ছে। কী? না, দীর্ঘ চুম্বনদৃশ্য দেখানো হয়েছে মঞ্চে। নাটকটি জঘন্য কি নগণ্য সে প্রশ্ন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, বাজে শিল্প বন্ধ করার রেওয়াজ থাকলে তো বাংলায় শিল্প প্রায় উঠেই যেত। তবে কৌতুকপ্রদ, এই গ্রাস্তারি গাজেনি। (কু-লোকের ফটাস করে মনে পড়বে কলকাতা ফিল্মোৎসবে ‘টরাস’-বিতর্ক। অভিযোগ ছিল, এ ছবিতে ১. লেনিনকে পিছন থেকে নগ্ন দেখানো হয়েছে, ২. তাঁকে অসম্ভব অসুস্থ, প্রায় মস্তিষ্কহীন দেখানো হয়েছে। সত্যিই, সকুরভ বিশ্বখ্যাত পরিচালক হলেও, তাঁর অবশ্যই জানা উচিত ছিল ১. অত বড় নেতার নিতম্ব থাকে না, ২. মেহনতি ব্যাকটেরিয়া-ভাইরাসও বিলক্ষণ অবগত, বিপ্লবের নায়কের দেহে অ্যাদূর ঘনঘটা বাধানো চলবে না, যাতে তাঁর দেব-ইমেজ ক্ষতিগ্রস্ত হয়)। চুমু-ডেপুটেশনে কী লেখা আছে কে জানে, আপত্তির সম্ভাব্য কারণগুলি: ১. নর-নারী চুম্বন করে না। ২. করে, তবে অতি দুশ্চরিত্র লোকেরা। এটি দেখে দর্শকগণও ওই পাপে আগ্রহী হয়ে পড়বেন। ৩. চুম্বন খারাপ না, কিন্তু তা ব্যক্তিগত ও গোপন, মঞ্চে দেখানো চলবে না। (সিনেমায় কিন্তু এস্তার চলবে, ঋতুপর্ণর ছবির বিরুদ্ধে তো ডেপুটেশন পড়ে না। পর্দায় শুধু চুমু কেন, আরও বহু কিছুই দিব্য, ওটা তো মঞ্চের মতো সামনাসামনি হচ্ছে না। দ্বিতীয়ত, সিনেমা নিয়ে গুগোলটা শিবসেনার স্পেশালিটি)। ৪. মঞ্চে চুম্বন চলবে, কিন্তু ‘দীর্ঘস্থায়ী’ হতে পারবে না (সঠিক সময়সীমা সংগঠনের কত্তারা বেঁধে দেবেন)। ৫. মঞ্চে দীর্ঘস্থায়ী চুম্বন চলবে, কিন্তু রবীন্দ্রসদনে নয়। বাপের সামনে সিগারেট খাওয়ার মতোই, ঋষিদাদুর নামের ছোঁয়াচ আছে, হেন কম্পাউন্ডে চুমুর মতো অ-রাবীন্দ্রিক কাণ্ড সশব্দে ব্যান। ‘যাহারা তোমার কিসাইছে বায়ু...’। ৬. রবীন্দ্রসদনেও দীর্ঘস্থায়ী চুম্বন চলবে, কিন্তু অপ্রাসঙ্গিক ভাবে নয়। বিঃ দ্রঃ এই শব্দটি দুর্ধর্ষ সুবিধেজনক। প্রাসঙ্গিক চুম্বন দেখাতে পারবেন এমন জিনিয়াস ভূভারতে গজিয়েছেন কি? যাই করুন, বলা হবে, ‘এটার কি দরকার ছিল?’ আরে, সে তো শিল্পই করার কোনও দরকার ছিল না। শিল্প জিনিসটার মহত্বই এই যে তা পুরোপুরি অহৈতুকী। আরও: সব অপ্রাসঙ্গিকতাকে কিন্তু অশালীনতা বলা হয় না। অপ্রাসঙ্গিক প্রকৃতিবর্ণনা, গরিবদরদ, নস্টালজিয়া, কবিতাকেতন, কিছু অশ্লীল নয়। প্রায় সব ভারতীয় সিনেমায় আমূল অপ্রাসঙ্গিক ছ-আটটা গান জোড়া থাকে। আজ অবধি ডেপুটেশন পড়েনি। শুধু অপ্রাসঙ্গিক যৌনতা হচ্ছে অশালীন। পথে এসো। আসল কথা হল, নো ইন্টুমিন্ট। (আসলতর: প্লেন হিংসে। আমি পাইনি, তোকে পেতে দেব না)। আমাদের যৌনতাবিরোধী সমাজ। তার মাথারা মিলে সংগঠন করেছে। এ বার তুমি ও পথে গেছ কি ঠ্যাং ভাঙব। ভাগ্যিস এ সব দাদাবাবু ১৮৬১ নাগাদ

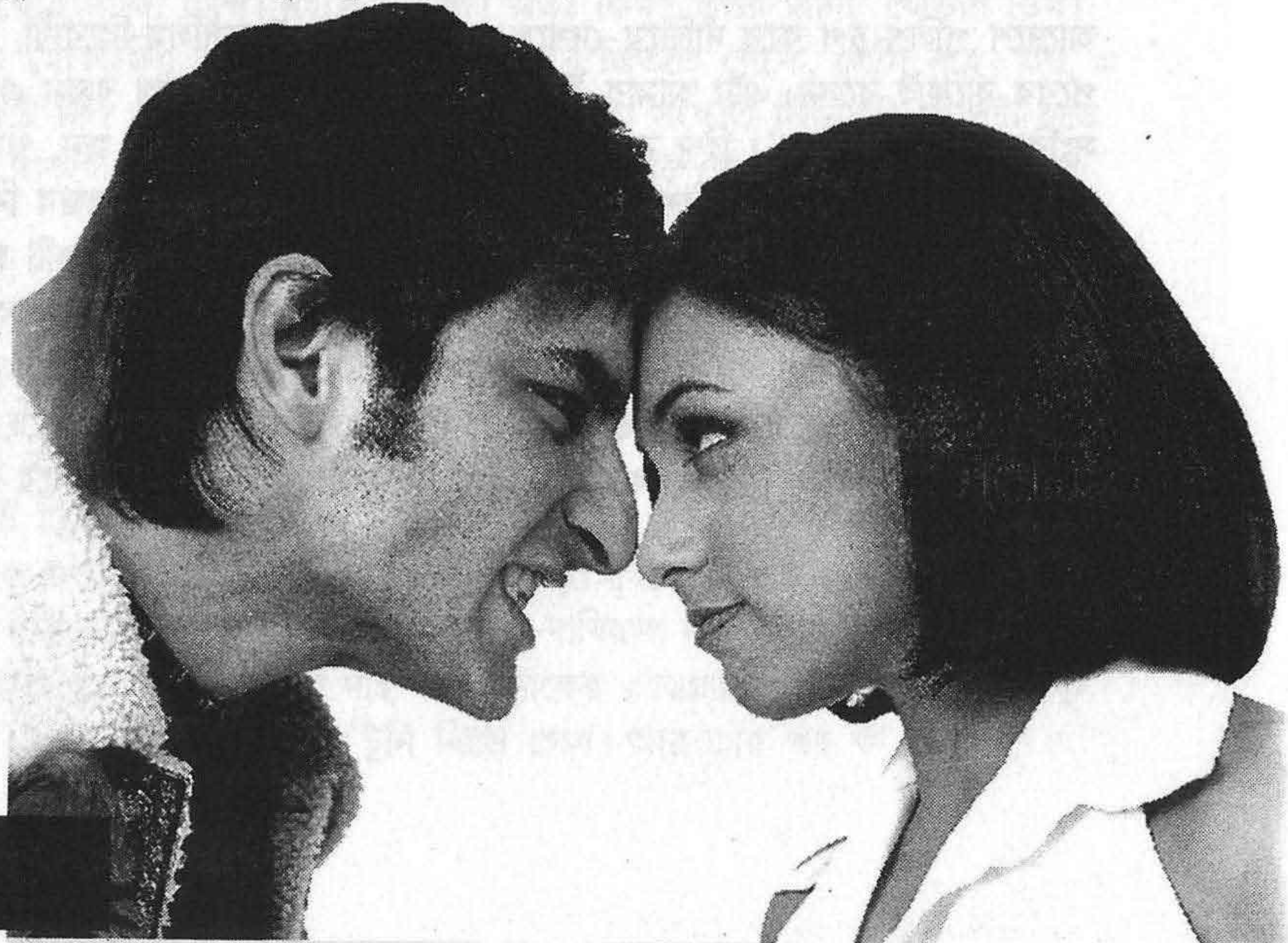
গজাননি, নইলে ধনীর দুলাল বয়ে যাওয়া ছোকরা ‘স্তন’ নামে কবিতা লিখছেন দেখলে (বইয়ের পর পর তিনটি কবিতা ‘স্তন’, ‘চুম্বন’, ‘বিবসনা’!) বা ‘হৃদয়াসন’ কবিতায় ‘কোমল দুখানি বাহু শরমে লতায়/বিকশিত স্তন দুটি আগুলিয়া রয়’ পড়লে যা রক্তচক্ষু-মিছিল বার করতেন, ভদ্রলোকের আর কেরিয়ার বানাতে হত না, নামে ‘সদন’ হওয়া তো দূরস্থান।



‘নয়ে না হলে নব্বইয়ে হয় না’— নগরের প্রাচীন প্রবাদকে টেনে চাঁটা মেরে নিজেকে সাঁ সাঁ ইমপ্রভিয়ে একাকার থেকে মেগাস্টার পদে লং জাম্প সোজা নয়। কিন্তু ‘দিল চাহতা হ্যায়’-এর পর একদম ম্যাজিক মেনে পাণ্টে গেছেন এক জন। সইফ আলি খান-কে ক’দিন আগে অবধি টিটকিরি মেরে বলা হত ‘শেফালি খান’। ‘ওই সিনেমাটায় জানিস না দুটো নায়িকা? কাজল, আর ওই শর্মিলার ছেলেটা’! আর এখন? স্ক্রিনে টিকোলো নাকটি বাড়ানো মাত্র মেয়েরা উল্লাসে চিল্লিয়ে ছত্রখান! এবং সত্যিই, ‘হাম তুম’ ছবিতে একার কাঁধে যা বয়ে নিলেন তুখোড় কমেডিটিকে, লোকে হাঁ। চোখ ফেরানো যাচ্ছে না। ছেলেরা অবধি রানি মুখোপাধ্যায়কে ছেড়ে তাঁকে দেখছে। তেমনি তরতরে ঠাসজমাট চিত্রনাট্য লিখেছেন কুনাল কোহলি (তিনিই পরিচালক)। আর ছবির অভিনব বিজ্ঞাপন-কাণ্ড? রিলিজের ঠিক আগের দিন ‘জস্‌সি য্যায়সি কোই নহি’ সিরিয়ালে সইফ আলি-র চরিত্রটি বেমালুম হাজির! আরও : সিনেমায় সইফ ‘হাম-তুম’ নামে একটি কার্টুন স্ট্রিপ তৈরি করেন, ‘টাইমস অব ইন্ডিয়া’ তা ছাপে। সত্যি সত্যিই কিন্তু ওই কাগজে উক্ত মজাদার স্ট্রিপ বেরিয়ে চলেছে ইদানীং, রচয়িতার নাম : যশরাজ ফিল্মস।



বুড়ো বয়সে সব ফিল্ম-পরিচালকেরই ভীমরতি ঘটে (বার্গম্যান আর বুনুয়েল ছাড়া)। দু’টি ব্যাপার গজায় : ১. ইন্দ্রজাল



হাম তুম : ফুর্তি প্লাস খুবসুরতি

বাষ্পীভূত, কিন্তু তার গন্ধের স্মৃতিটুকু চেখে প্রাণপণে নিজেকে টোকার সার্কাস চলে। ২. 'আর কদিনই বা আছি, এ বার বলে যাই' সূত্রে উপদেশামৃতর হরির লুট তেড়ে। অবশ্য সুভাষিতানির (মানুষ খুন করা ভাল না, হিন্দু-মুসলমান ঝগড়া করা ছি ছি, হায় কী মূল্যবোধ হইল শহুরে টিন-এজারের) সবচেয়ে সুবিধে: এ সব থিমের আবডালে যাত্রাপালা হেভি খাপ খেয়ে যায়, ঔচিত্যের শাক দিয়ে প্রতিভা-হীনতার আঁশটে দুর্ঘ্রাণ দিব্যি ঢাকা চলে, সত্যি, খাটুনি বা কায়দার আর দরকার কী, জরুরি কথা বলছি তো! পলিটিকালি কারেক্ট থাকা আর শিল্প করা (যে দুটোর ধর্ম আসলে বহু ক্ষেত্রেই বিপরীত) টোটাল গুলিয়ে ফেলে ইদানীং যা তুঙ্গ গ্যাড়াকল, বিদ্যাসাগরমশাই 'গোপাল বড় সুবোধ বালক'-এর জন্য নোবেল পেলেন না এই যা আফশোস। অবশ্য এমত ঘেঁটে যাওয়া যুগসম্মত, কারণ মিডিয়োকোর-এর সবচেয়ে সহজে আয়ত্ত: সঠিকতা। সদা সত্য বলিবে, সেক্স করিবে না। গোবিন্দ নিহালানি 'দেব' নামে একটি ছবি করেছেন, সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে। বসে দেখা যায় না। চিত্রনাট্য অশিক্ষিত (মীনাক্ষী শর্মা), সংলাপ চড়ার চড়া (গোবিন্দ নিজে), সিরিয়ালের মতো সর্ব ক্ষণ পেছনে সিঙ্গেসাইজার বেজে যাচ্ছে, সব্বাই জঘন্য অভিনয় করছেন (অমিতাভ ছাড়া, যদিও তাঁরই বিবেকের রোল), অসহ্য গান, একটা আবার করিনা নিজে গেয়েছেন (ব্যান্ডও কানে আঙুল দেবে)। গান্ধী-নেহরুর ছবি টাঙিয়ে অসাম্প্রদায়িকতা, শিবাজির ছবি টাঙিয়ে সাম্প্রদায়িকতা বোঝানো হয়েছে, অবশ্য সে সব পষ্ট বলাও আছে, পাছে দর্শক বুঝতে না পেরে ফের সাম্প্রদায়িক হয়েই বেরিয়ে যায়। সিধে কথা, গুজরাত-কাণ্ড। লোক মরছে, মুখ্যমন্ত্রীর আদেশে পুলিশ চুপ করে দাঁড়িয়ে দেখছে। ওম পুরী প্রকট মুসলিম-বিরোধী, কথায় কথায় টেঁচান 'কিল দোজ বাস্টার্ডস', পরের বাক্যেই বলেন: এটা আমার ইডিয়োলজি! তাঁর প্রাণের দোস্ত বচন একদম সোজা-মেরুদাঁড়া ঠিকঠাক। ভারতীয় সংবিধানই তাঁর 'গীতা'। হিন্দু না ওরা মুসলিম ওই জিজ্ঞাসে কোন জন, ওম পুরী বলো পুড়িছে মানুষ গুজরাত ছারখার। দুজনেই প্রবল পুলিশ অফিসার। তো, সংঘাত। বচনকে অসম্ভব নির্ভীক ও সৎ প্রমাণ করতে প্রথম দৃশ্যে দেখানো হয়, তিনি এক কলেজে প্রিন্সিপাল-ঘেরাও ছাড়াতে গেছেন, একটি ছাত্র আইন সম্পর্কে খুব অশ্লীল মন্তব্য ও ইঙ্গিত করে। বচন তক্ষুনি সটান গুলি করে ছাত্রটিকে মেরে ফেলেন: দেশবাসী যাতে পুলিশকে ভয় পান, সে জন্য এনিথিং! এই রে মীনাক্ষীবাবু, এ তো স্লিপ অব ব্রেন হয়ে গেছে, এক থাবড়া মারলেই যেখানে কাজ হয়, সেখানে গুলি করে মানুষ মারার হিরোকে নয়, ভিলেনকে চিহ্নিত করে। তবে হ্যাঁ, চুমু আছে। একাধিক। প্রত্যেকটা অপ্রাসঙ্গিক, অপ্রয়োজনীয়। গোবিন্দ দেখুন, বলেকয়ে বাংলার বাবাদের ডেপুটেশন খেয়ে যদি এ রদি ছবি চালাতে পারেন।

২০ জুন, ২০০৪

কী সে আ র ক্লি শে!

পঞ্চ ‘ম’-কার কী কী? মদ, মাংস, মৈথুন, মজা, মান্টিপ্লেস্স। নয়া মান্টিপ্লেস্স ঘটেছে স্বভূমি-র পাশে, নাম ‘৮৯’! আসলে ঠিকানা ‘৮৯ সি মৌলানা আবুল কালাম আজাদ সরণি’, আবার টিকিটও আছে ৮৯ টাকার। বেরোবার পথ স্বভূমির ভিতর দিয়ে। তবে কি ৮৯ কিনলে স্বভূমি ফ্রি? ও দিকে বচন বোধহয় প্রথম অভিনেতা যিনি একই নামে দুটি ছবিতে অভিনয় করছেন (‘দিওয়ার’)! এর মধ্যে সাইনবোর্ড সংস্কৃতির অঙ্গ কি না, আকচাআকচি। ‘বাংলাতেই সাইনবোর্ড লিখতে হবে’/‘বাংলাতেও সাইনবোর্ড লিখতে হবে’ দুই বাক্যের তফাতে প্রবল হকচক। জানা, আমার সাইনবোর্ড আমি এসপারান্টো কিংবা সাইন-ল্যাঙ্গোয়েজে লিখব, কার কী বলার। মৌলিক অধিকার কি নয়া-নাৎসি এসে নাক টিপে গেলাবে? সচ। কিন্তু যবে ভদ্রবাবু অসাম্প্রদায়িকতার পমেটম মেখে পলিটিকাল কারেক্টনেস কোঁৎ গিলে ভুবন-মোহন, পশ্চিমবঙ্গের রাজধানীর বুকে যে একের পর এক স্থান বাঙালির কাছে ঘাড়ধাক্কা নো-এন্ট্রি, তার বেলা? নার্সারিও জানে, বাংলা ক্লাস বকওয়াস, মন দিয়ে শিখতে হবে ইংরিজি, হিন্দি। নইলে, রইলে। অতঃ কিম্? উত্তর জানা: ঘোড়ার ডিম। এক কু-চৈতন্যকে আর এক কু-চৈতন্য দিয়ে মোকাবিলা করা যায় না। হেরেছ, এবে জিততে শেখো, লেঙ্গি নহে। প্রশ্ন, এ পরিস্থিতিতে একেবারে সংঘাতহীন জেতা ঘটে কি? যা গড়াচ্ছে, জাদ্যের নিয়মে বাংলা সংস্কৃতি জিনিসটি লোপাট হতে খুব দেরি নেই। কিচ্ছুই না করে হাত ধুতে থাকলে এক সময়ে বাংলা সাইনবোর্ড লিখলেই দোকান ভেঙে দেওয়া হবে, সন্দেহ।



অন্ধদের নাটক দেখার ফুর্তি প্রভূত। বিশেষ মনোযোগের দায় নেই, আহা রে, উহারা তো ঘটমান কুমিরডাঙায় পবিত্র দুগ্ধভাত মাত্র। ‘ব্লাইন্ড অপেরা’র ‘থাকে শুধু নচিকেতা’ দেখতে বাঙালি এলায়ে ঢুকছে, ছাতি ফুলে স্ট্যাচুয়া, নাটক দেখছি কে বললে, সোশ্যাল ওয়ার্ক ওগরাচ্ছি। কেউ স্ক্রিন খুলতেই স্তম্ভিত, ‘সে কী, নচিকেতা গাইবে না?’ বাকিদেরও টোটাল নিরস্ত্র করতে তৈরি ছিলেন রচয়িতা-নির্দেশক শুভাশিস গঙ্গোপাধ্যায়। একদম গোড়া থেকে ভেরীর শব্দের মতোই গম্ভীর ও দুরন্দুর বুঝিয়ে দেওয়া হয়, এ একেবারে নো-ফাজলামি এবং প্রখর মনোযোগ-দাবিয়াল নাটক, কোনও রিলিফ দেওয়ার দায় নেই। ব্রেন চুলকোলে বেরিয়ে যাও। প্রথম ডায়লগ: ‘নরকের দাহ দাও, নরকের আগ্নেয়গিরি, হে যম জীবন’। বিষুও দে র ‘স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যৎ’ কবিতার পংক্তি। ব্যস, আন্ধেক দর্শকের টুনি নিভে গেল। আর তার পর কী যে

দোদগ্ধপ্রতাপ কাণ্ড! প্রধান হ্যান্ডশেক, কোথাও অন্ধত্ব ফলানো নেই। শুভাশিসের অ্যাপ্রোচ: এটা একটা প্লেন নাটক, ঘটনাচক্রে যার অধিকাংশ লোকজন চোখে দেখেন না। তার জন্য কোনও বাড়তি সুবিধে নেওয়া নেই, গ্রেস চাওয়া নেই। চরিত্ররা হুঁ ছুটে বেড়াচ্ছে, ধরছে, পাকড়াচ্ছে, লড়ছে। প্রযোজনা বাকবাক করছে ঘড়ির কাঁটার মতো। বেচারাবাদ-কে শুভাশিস ধাঁ-ঝাপটে উড়িয়ে দেন। ‘ধ্রুবপদ’-এর অভিজ্ঞতা-সংখ্যায় তিনি লিখেছিলেন, ‘যে কোনো দৃষ্টিহীন সম্পর্কে সে যে দৃষ্টিহীন এ কথাটুকু বুঝলেই যথেষ্ট। তার বেশি গুরুত্ব দেওয়ার দরকার নেই। কমও না।’ আর খেলার প্রতিভা? সারা নাটকে কখনও উজ্জ্বল আলো ব্যবহার করা হয় না। সাংঘাতিক স্তিমিত আলো, চাপ অন্ধকার। হইহই করবেন না, তা অন্ধত্বের দ্যোতক নয়। বিষাদের। পরিত্রাণহীন বেদনার। নটিকেতা প্রশ্ন করে, ‘স্বর্গ কী?’ যম: ‘স্বর্গ এক সময়। যখন মানুষ সুখে থাকে।’ অনুসিদ্ধান্ত: নরক, যা প্রায় পুরো নাটক জুড়ে দেখানো হয়, তা-ও কোনও স্থান নয়, এক সময়। জ্বলনের, তিক্ততার, বমির। অসহায় মার খাওয়ার। সেই অসহ গোঙানি বোঝাতেই ওই টুটি চিপে ধরা অনালোক। আর সে জন্যই প্রত্যেকের পুরো মুখ ওড়না দিয়ে বাঁধা। যমের মুখও রং করা, কড়ির মতো সাদা, হিম। শুধু নটিকেতার মুখ উন্মুক্ত। সে দেখতে চায়। এবং অবাক, কোনও পূর্ব-নির্ধারিত থিয়োরি তার দেখার ভঙ্গি ঠিক করে দেয়নি। সে নিশ্চিত সাদা-কালোয় বিশ্বাসী নয়, ভাল-মন্দ ভেদ আদৌ করা যায় কি না, তা নিয়ে সতত প্রশ্নাতুর, নরক মানেই খারাপ কেন, জিজ্ঞেস করে। এই ‘অন্ধত্বহীনতা’র পরীক্ষা দিয়েই তাকে ঢুকতে হয় নরকে। সে দৃশ্যে এ-ও: ‘আকাশের তারার পাশাপাশি কৃমির উল্লাসও থাকুক’! ঠিক নাই যে, ঠিক কথা কে বলবে? নাটকের শুরুতেই বায়ুরা বলে যায়, ‘আমরা কিন্তু কেউ নই, কিছু না। আমরা শুধু বায়ু। আমাদের অস্তিত্ব আমাদের পরমায়ু।’ শিউরে দেওয়া কথাটির মতোই, নটিকেতার ভ্যালু-জাজমেন্ট পরিত্যাগে শুভাশিস সকলই গুলিয়ে দেন। কিন্তু হায়, এই প্রবণতাটি নাটকের প্রাণভোমরা থাকে না। শেষ অবধি এ নাটক মৃত্যুজয়ের উপায় হিসেবে এক বিশেষ ধরনের ‘ঠিক’ জীবন যাপনের কথা বলে। নটিকেতা-নায়কের ন্যায়, নিজ কোলে ঝোল ছাড়াও অন্যদের কথা ভাবো হে, বলে। ইহাও ভ্যালু-জাজমেন্ট। এই ‘ভাল’ জীবন যাপনই বা করব কেন? আমার স্বার্থপরতার কৃমি গ্যাঁট হয়ে থাকলে ক্ষতি কী? সারা নাটক যদি বলি, জ্ঞানের ইজারা কে নিয়েছে, কার অধিকার বলে দেওয়ার এইটা ভাল ওইটা অন্ধ, তা হলে আমিই বা শেষপাতে সাঁ করে বেদী চড়ে ঘোষণা করি কী করে, চারপাশে যা চলছে সুবিধের নয়, অমুক পস্থা শ্রেয়? কিন্তু এ তর্কের উপরে থাক জোরসে সুপার-সাবাস, এ নাটক আমোদিয়ার অবশ্যই নয়, বাকি মাইনরিটি-র দৌড়ে দেখার।



‘ওডিয়ন থিয়েটার ফেস্টিভ্যাল’-এ এই নাটক যে দিন মঞ্চস্থ হচ্ছে, সে সন্ধ্যাতেই ‘তারা চ্যানেল’ দেখাল অন্ধ নায়ক-কেন্দ্রিক টেলিফিল্ম ‘আপনজন’, সৌরভ ষড়ঙ্গী রচিত-পরিচালিত। মূল ভূমিকায় নাটকটির ‘যম’ চরিত্রের অভিনেতা

সুভাষ দে, এবং চিত্রনাট্য সহায়তায় শুভাশিস! ছবির পাঞ্চ-ডায়লগ: ভালবাসা চেয়েছিলাম, করুণা নয়। ও দিকে আরিবাবা, ফিলিম তো অন্ধের প্রতি করুণায় জবজব করছে, টিভি বারে বারে পুঁছতে হয়। নায়ক যথাসাধ্য হতভাগ্য, বাবা-মা মারা গেছেন দুর্ঘটনায়, অন্ধ হয়েছে প্রেসিডেন্সিতে পড়াকালীন, তা-ও হত না, অপারেশনের দিন সার্জন আসেননি, মেয়ের অন্ত্রপ্রাশন ছিল! এই সর্বহারাটি (= ভাল), বলা বাহুল্য, শিল্পী। কবিতা লেখে, সেতার বাজায়, জীবনানন্দ আওড়ায়, রবীন্দ্রসঙ্গীত গায়, ক্লাসিকালও। এবং বিশ্বাস করে, মানুষ মরে গেলে পাখি হয়ে যায়। ‘গাড়ির ভেতর যারা ছিল, সবাই পাখি হয়ে গেল’: দুর্ঘটনার বিবরণ। সারা ছবি জুড়ে প্রায়ই রাস্তাঘাটে দু’হাত দু’পাশে ছড়িয়ে ডানার মতো ঝাপটাতে থাকে, এক পা তুলে! বকপাখি হতে চায় বোধহয়। বেচারার মনোবেদনা বোঝাতে শব্দের মেলা বসে গেছে। ক’মিনিট অন্তর অন্তর ট্রেনের তীব্র হুইস্‌ল, চাকার ধাতব ঘর্ষণ, কুকুরের ডাক, পাখির চিখ, খাঁচায় পাখির তীব্র ঝটাপটি, অন্ধ ভিক্ষুণীর খিলখিল হাসি, পাগলের তাণ্ডব। আবার ফেলে আসা দিনের পবিত্রতা বোঝাতে শিশুর কলস্বর, শহরের কলুষ বোঝাতে ‘তেজাব’-এর ‘এক দো তিন’। কী সরল আর ড্যাবড্যাবে না, শিল্প? গ্রাম্য সিংহলগিরির দোসর সংলাপও, নায়কের সঙ্গে নিষ্ঠুর ছলনা খেলতে যে মেয়েটি লাটাগুড়ি বেড়াতে আসে (সে শহরে+ধনী+চক্ষুস্থান = ভিলেনের ঝুড়ি), ঝাড়া তিন-চার দিন মিলমিশ অস্ত্রে জিজ্ঞাসে: ‘আবার সব কিছু ফিরে পেতে ইচ্ছে করে, তাই না? আবার দেখতে ইচ্ছে করে?’ কতখানি বুদ্ধিমান হলে বোঝা যায়, অন্ধ লোকের দেখতে ইচ্ছে করে! আর ক্লাইম্যাক্সে ফিনিশিং টাচ: ‘পেটে যাদের থিদে থাকে, তারা আর অন্য কোনও স্বপ্ন দেখতে পারে না’! এই ওয়াল-ম্যাগাজিনোচিত কাণ্ডটিতে বহুৎ ঝকঝকে সিনসিনারি আছে, অনাবশ্যক। আর আছেন সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, ঋত্বিকের বিজন ভট্টাচার্যের ক্লোন। বাঙাল বলেন, অবশ্যই। ইংরিজি মিশিয়ে। শেষ ডায়লগে যেই না ‘মাইলস টু গো’ রিপোর্ট দিয়েছেন, সে কী ঘড়ির ঢং ঢং। ও, বলেছি কি, নায়ক যখন নায়িকার হাতে আংটি পরিয়ে দেয়, টিকটিকি ডেকে ওঠে? অভিনয় সকলের খারাপ, সুভাষ ও বুলবুলির বিশেষত। আসলে বাঙালি আঁতেল সমগ্রের ক্রাইসিস: তাঁরা তারকভঙ্কি-ঋত্বিকের মতো করে আঁতেল হতে চান, নিজের মতো করে নয়। মুশকিল, আশ্বে ট্র্যাক করলেই তারকভঙ্কি হওয়া যায় না, ওতে শুধু প্রমাণিত হয় যিনি ট্রলি ঠেলছেন তাঁর হাতে বাত নেই। তেমনই, ঋত্বিকের অতিনাটকীয় সংলাপ ম্যানেজ করতে সেই অলৌকিক প্যাশন চাই। ধীর একঘেয়ে অবাস্তুর ছবি করে ভাবলাম গভীর-গভীর, ঘ্যানঘ্যানে ন্যাকামির গাছ পুঁতে ভাবলাম দরদ ফলবে, হয়? ‘ক্রিশে’ বলে ইংরেজি শব্দ আছে, ‘পাতি’ বলে বাংলা শব্দও। সেগুলো অভিধান থেকে না ছাঁটলে শিল্প করার মানে নেই। ভাগ্যিস অন্ধরা দেখতে পান না। নইলে টেলিফিল্ম-অনুপ্রাণিত হয়ে তাঁরা পা তুলে ওড়া প্র্যাকটিস শুরু করলে ফের খোঁড়া হয়ে যাওয়ার ভয় থাকত। তখন শুভাশিসবাবুও সামলাতে পারতেন না!

১৮ জুলাই, ২০০৪

হে রো র কী গে রো

একটা দুঃখ, ধনঞ্জয়কে নিয়ে জমজমে পাবলিক উৎসবটা শেষ হয়ে গেল। দারুণ মুখরোচক টকঝাল এই ‘মার শালাকে’, টাকনা দিয়ে নালেঝোলে অফিস-টাইম মচানো, সঙ্গে জবাইয়ের আগে পশুর রগরগে ডিটেল্‌স: লোকটা কাউন্টডাউন শুরুর পর সকালে শশা খেল কি না, সন্ধ্যায় ক’ল্লাস জল, বাথরুমে যাচ্ছে হেঁটে না ছুটে, ভরপেট্টা টেকুর না ভেতর মুচড়ে ওয়াক, হাউহাউ কান্না না রেডিয়োয় বিবিধ ভারতী, ‘ফাঁসির আসামী লাইভ’ চাক্কাচাম ধমাকা। কত ভাগ্যে অ্যায়সান গিনিপিগ, অ্যা? মরার আগে শালা ভিলেনটার প্রাতঃকৃত্যের অনুপুঙ্খ অবধি তুলে রাখব, মিডিয়ার কড়ক তো খাওনি, মনে হবে ফাঁসি দে মা মরে বাঁচি। ইস, ক’দিন মহান বাঙালি জাতির খুব ফাঁকা ফাঁকা লাগবে। আচ্ছা, রেপ-মার্ডার তো হামেশা, পরের এপিসোডে আর একটাকে ধরলে হয় না? বুদ্ধবাবু অ্যাম্পিথিয়েটার গড়ন না বাইপাসের দিকটায়, আলিপুরের সিংহটিংহুলোরও এক্সারসাইজ হয়। তবে হুজুগ খুঁজতে ব্রেনি বং বেশি দূর না, ইনফ্লুয়েঞ্জা ঘটাবার ভয় ত্যাগ করে বাবা তারকনাথের মাথায় ঘড়া ঘড়া জল ওন্টানো অধুনা টেরিফিক সাংস্কৃতিক মোচ্ছব। ট্রাফিক দামড়ে সোল্লাস মিছিল (স্লোগান: ট্রামলাইন পার করেরা, ভি আই পি মোড় পার করেরা), রাস্তার গাঁটে গাঁটে নকশাদার বাঁক-স্ট্যান্ড, পাশে মিনি-হিমালয় সাউন্ডবক্স, সর্ব ডেসিবেল চর্ণ করে ভয়াবহ ভোলেবম্ ফাটছে। কান জুড়োলে বোঝা যাবে, সুপারহিট হিন্দি গানের সুরে কিঞ্চিৎ ‘বাবা’, ‘হর’, ‘মহাদেও’ মরিচকুটির ন্যায় ইতিউতি ছড়িয়ে গরমাগরম পরিবেশন। অর্থাৎ ‘দিল ডিং ডং ডিং বোলে’র জায়গায় ‘বোল বোম বোম বোম ভোলে’। এই ‘উন্টা-প্যারডি’ (ভক্তিজীতির সুরে চটুল কথা নয়, চটুল সুরে পেলায় ভক্তিলিরিক) অচিরে থিসিসযোগ্য। ও দিকে অ্যাকোয়াটিকা-য় ঘটল আলফা বাংলার বর্ষা-বরণ ‘মেঘ মল্লার’: সিরিয়ালের ডিংডংগণ রইরই জলকেলি, সঙ্গে কুইনাইনের গান। পর দিন শুটিঙে ক’জন ঘড়ঘড়ে ব্যারিটোন ও হ্যাঁচোরঞ্জিত নাসাডগা কে জানে, তবে সে সন্ধ্যার কম্পালসরি জবজবেপনা অভিনেত্রীদের হেঁকি মানিয়ে একসা। আর হ্যাঁ, সলমন রুশদি বললেন, রক্ষণশীল সমাজে পর্নোগ্রাফি স্বাধীনতার— এমনকী সভ্যতার প্রতীক; চিন ‘নুড-বিচ’ (নগ্ন হয়ে সাঁতার+ভ্রমণের সৈকত) অনুমোদন করল; মার্কেজ আজীবন সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতার সঙিন নামিয়ে হলিউডকে ‘লাভ ইন দ্য টাইম অব কলেরা’ ছবি করার ছাড়পত্র দিলেন। ওগো শুনছ, কী হবে?



হেরো হেরো হেরো বাগবাজারের অমুক আর লয় বাবা, শহরে রমরম চারটি হেরো-বিষয়ক ফিলিম, তায় আবার জোড়া

জোড়া যমজ। দুটি ‘স্পেশাল এফেক্টে আত্মসম্মান-জাগানিয়া’, দুটি ‘ফেমিনিজম-ভাঙানিয়া’। প্রথমে ‘গায়ব’-
 ক্যাটউওম্যান’। হিন্দি ছবিটিতে মুখচোরা ভিত্তি তোলতা তুষার কপূর। মা পেটায়, বন্ধুরা তামাশা ওড়ায়, দারোয়ান
 নাহক অপমান করে। পাশের বাড়ির মেয়েকে ভালবাসে, হয় সে ঘোরে পেশিবহুল বড়লোকসনে। হলিউডি ছবিতে
 হ্যালি বেরি ক্যাবলা বেখাপ্পা বেচারি কর্মচারী। বসের অন্যায় হুকুম, মাঝরাতিরে প্রতিবেশীর উচ্চণ্ড লাচাগানা, সবের
 বিরুদ্ধে রা-হীন। জামাকাপড় বেচপ, মেক-আপ নেই, প্রেম উঁহ। অফিসের গোপন কাজকর্ম জেনে যাওয়ায় বেমালুম খুন
 হয়ে যান। সেইতে না পেরে তুষার ভগবানের মূর্তির কাছে প্রবল কান্নাকাটি, ‘আমাকে তো কেউ দেখেও দ্যাখে না, তার
 চেয়ে অদৃশ্য করে দাও’, এবং, লে তথাস্ত, ধাঁ! মিশরের ডোরাকাটা বেড়াল বহুৎ দিন নিপীড়িতা হ্যালির পাশে ঘুরঘুর,
 এ বার মৃতদেহে জাদু নিঃশ্বাসের শৌঁ হলকা, আর আঁ, পুনর্জাগ্ত মহিলা বেড়াল-ক্ষিপ্ত সুপারউওম্যান, অট্টালিকার ছাদ
 থেকে ছাদে সে কী লাফ! ন্যাজের বদলে চাবুক দিয়ে সে কী দুষ্টের দমন! ফটাস করে প্রেমও আয়ত্ত! অদৃশ্য-তুষার
 প্রথম দানেই অত্যাচারী ছোঁড়ার প্যান্টালুন সড়াং খুলে দেয় মেয়ে-সম্মুখে, আর রাইভাল-প্রণয়ী মাথায় এমন চাঁটা-রত,
 ব্যাটা মনোরোগী-চেষ্টারে। এমন ছিল যত ক্ষণ, দিব্য কমেডি। ব্যস, তার পরেই ‘হলো ম্যান’-এর আদলে তুষার ভেবে
 বসে সে অজেয়, প্রেমিকা বাগাতে ব্যাক লুঠ, ছবিও দুম করে থিলার। তখন আবার সে ক্ষমতার চুরমদে পাক্সা ভিলেন,
 মারধোর-ব্ল্যাকমেল-কটকট চাহনি। অফিসের দুষ্টদের রামপিটুনি দিয়ে শহর কাঁপান হ্যালি, তাঁর প্রেমিক-পুলিশ হন্যে হয়ে
 বেড়াল-নারী খুঁজে বেড়ায়। জঘন্য, বস্তাপচা থিলার। সেই সুপারম্যান-স্পাইডারম্যান আদলে দ্বি-রূপ, দ্বিধা, কোনটি ‘দি
 আমি’। রামগোপাল-ফ্যাক্টরির সামান্য লক্ষণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে: আকর্ষক থিম, যাচ্ছেতাই ছবি। শুরু ভাল, তার পর খেই
 হারিয়ে বেকায়দা বোরিং, এন্ডিংটুকু বাঃ। আসলে আধ ঘন্টার আইডিয়া, ইলাস্টিক করার কু-মতলব। শেষটা খুব অন্য,
 তুষার অদৃশ্যই থাকে, কিন্তু এখন সে ফের ভাল, সবাই হাওয়ায় ভাসন্ত শার্ট-প্যান্ট দেখে হাত নাড়ে, হাসে।
 ভিলেনরাশির অক্সা-অস্তে হাত-টাত ধুয়ে, সব জানাজানি শেষে, হ্যালি থেকে যান মার্জার-রমণী হয়েই, এমনকী প্রণয়
 প্রত্যাখ্যান করে। স্লোগান: ‘স্বাধীনতাই ক্ষমতা’। স্বাধীন মিঁয়াও হয়ে চাঁদনি রাতে শহরের আলসের ‘পর, লঘু থাবাপাতে।



পরের যমজ: ‘মনস্টার’-‘জুলি’। চার্লিজ থেরন বেশ্যা, নেহা ধুপিয়া ‘খান্দেওয়ালি’। চার্লিজকে শৈশবে বাবার বন্ধু ধর্ষণ
 করেন, নেহা-র প্রথম প্রেমিক ল্যাং মেরে বড়লোকের মেয়ে বিয়ে করে নেন, দ্বিতীয় প্রেমিক সটান বসের কাছে তাঁকে
 ভোট দেন। হলি/বলিউডিনি বেদনাময় আতান্তরে বোঝেন, ছেলে জাতটাই গুয়ারলিং, ‘কেউ রাস্তায় ধাক্কায়, কেউ বিয়ে
 বসে, শালারা একটাই চিজ চায়: জিস্ম’! চার্লিজ, সহমর্মিতার কাঙাল, শেষ অবধি এক লেসবিয়ানের প্রেমিকা। তার
 পর এক রাতে তাঁকে ধর্ষণ-খুন করতে চায় ম্যানিয়াক মক্কেল, চার্লিজ আত্মরক্ষার্থে সে ব্যাটাকে গুড়ম গুলি, খুন। নেহা

দিব্য শরীর বেচে দিন গুজরাচ্ছেন, হেনকালে তরুণ কোটিপতি হ্যান্ডসাম তাঁকে ভালবেসে ফ্যালে। না, আসলিয়ত সে জানে না। নেহা ঠিক করেন টিভিতে টগবগে টক-শো ইন্টারভিউ দিয়ে ভারতবর্ষ এবং প্রেমিক, সবাইকে প্রকৃত ব্যাপার জানাবেন (ফারিয়া আলম, তুমি হে শিশু)! চার্লিজ ভদ্রজীবনে ফিরতে চান। কিন্তু হয়, এ রাস্কেল সমাজ আনপড় গোমুখ্য বছর চল্লিশের মেয়েকে ডাক্তার-উকিলের চাকরি দেয় না। মুখে মুখে চোপা অবধি করে। তাইলে কেমনে চলবে সঙ্গিনী-সংসার? অগত্যা তিনি ছেলে জাতের এক একটিকে ধরে খুন করতে থাকেন ও তাদের পকেট মেরে দেন। ইজি, না? নেহা পিতৃতন্ত্রকে টিভিতে তুলোধোনা করেন, পয়সার জন্য নয়, ছিছি, চেতনা ছড়াতে উনি টিভিতে খ্যাত শাঁসালো প্রেমিকের নাম বলেন। হু হা হাঙ্গামা। কিন্তু ওই দ্যাকো, ব্যতিক্রমী প্রেমিক গুটিগুটি স্টুডিয়োতে এসে লাইভ অঙ্গসংবাহন! তিনি: ‘যৌনকর্মীদের জন্য সংগঠন বানাতে প্রথম পাতায় ছবি, আর যৌনকর্মীকে বউ করতে যত শুচিবায়ু?’ হাত্তালি। হেরে যাওয়া নারী জিতলে স্বশুরবাড়ি। চার্লিজও ডায়লগ দাবড়েছিলেন, ‘খুন করা খারাপ কে বললে? ধর্ম আর রাজনীতির নামে গাদা গাদা খুন করে সব মহাপুরুষ বনছে না?’ কিন্তু এ এমন প্রকাণ্ড ক্লিশে, বেচারির ক্ষমা নেই, ধরা পড়েন ও মৃত্যুদণ্ড। আদালত ছাড়ার সময় অবশ্য ফের: ‘লজ্জা করে না, এক ধর্মিতাকে মরতে পাঠাচ্ছেন!’ হেরো হল সুপার-হেরো, কিন্তু হুঁ হুঁ বাওয়া, জিত অন্যত্র, হাতে রইল অস্কার।

১৫ অগস্ট, ২০০৪



ক্যাটউওয়ান-এ হ্যালি বেরি : ছিল পাপোশ, হয়ে গেল বেড়াল

রং মানেই রাইট?

ধনঞ্জয়ের কেস শেষ হয়ে হইছে না শেষ। ‘বসে আঁকো’তে বাচ্চারা পাইকারি রেটে তার জোড়া-পা আঁকছে, যাত্রাপাড়া ঢোল-মেঘর-ঘাঘরে ছয়লাপ: চার চারটে পালা, এ ‘ধনঞ্জয়ের ফাঁসি’, ও ‘ফাঁসি হল ধনঞ্জয়ের’ তো সে ‘ফাঁসির মঞ্চে ধনঞ্জয়’। রাশি রাশি আগাম বায়না, হাঁচোড়পাঁচোড় গিলছে ‘প্রকাশ্য মঞ্চে দেখুন জীবন্ত মানুষের ফাঁসি’, ফের রাইভ্যাল-গ্রুপ: ‘আমরাই একমাত্র দল, যারা প্রশাসন ও কুলডিহি গ্রামের মানুষের সহযোগিতায় প্রকৃত সত্য ঘটনা অবলম্বনে’ পালা বেঁধেছে। কম্পিটিশনে বেয়াকুবরা খাবি খেয়ে অবশেষে হাফ-পাতা বিজ্ঞাপন: ‘যাত্রায় লোকশিক্ষা হয়। বোকা জনগণ বোকা দর্শকবৃন্দ। পশ্চিমবঙ্গের চেতনার মানুষ। সত্যি কি মা-বোন-বৌ’কে নিয়ে যাত্রার আসরে বাচ্চা মেয়ের ধর্ষণ দেখতে যাবেন?...-এর আদি যাত্রাপালা দেখুন! অনুগ্রহ করে সমাজকে সুস্থ রাখুন।’ এই আশ্চর্য সচেতন যাত্রাটির নাম ‘আজব গাঁয়ের আজব লেড়কী’। তবে স্টারডমের দিকে যাঁর অপ্রতিহত ও নিশ্চিত উত্থান: নাটা মল্লিক। বাংলা সিরিয়াল আর্টকে চিরকালই লাথি মারে, এ বারও চান্স লুফেছে, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের বডিগার্ডের ভূমিকায় নাটাবাবু অচিরে টিভি-ময়, অবশ্য এ কাছাখোলা গিমিকবাজি আগেও হয়েছে, টপলেস সুব্রত মুখোপাধ্যায়কে সুইমিং পুলে মুনমুন সেনের সঙ্গে ছপছপ দেখতে কী উৎসাহ সবার! শুধু সিরিয়াল না, শোনা গেল সমাজের দেহরক্ষীটি নাকি পাবলিক ফাংশনও শুরু করছেন, কথা বলবেন, আধুনিক গান গাইবেন। তুশু ফাঁসি কা ফান্দা এমন মান্টিকালার ধান্দার জন্ম দিতে পারে কে জানত। ধন্দ একটাই, নাটা যদি নিজে লিখে সুর বেঁধে গান পাকান, ফাঁসুড়ে-স্টারের সে প্রোডাক্টকে ‘জীবনমুখী’ বলা যাবে কি?



বোঝো, ফর্সা পাত্রী চেয়ে চেয়ে ভারতীয় বাপ-মা অ্যায়সান রোদন গেয়েছেন, হিন্দি ছবির ডার্ট নেটিভ নায়কগণ প্যাশন-পিঙ্ক মেমসায়েব ছাড়া চুমোচুমি করছেন না। পালে পালে হিন্দি ছবিতে দিশি হিরো আর বিলিতি হিরোইনের জুড়ির মাতন। সুভাষ ঘাই-এর ‘কিসনা’তে বিবেক ওবেরয়-এর সঙ্গে ব্রিটিশ মেয়ে অ্যান্টনিয়া বারনাথ, বচ্চন অভিনীত ‘দিল যো ভি কহে’তে ব্রিটেনের অ্যানাবেল ওয়ালেস, পূজা ভাট-এর ‘রোগ’-এ দক্ষিণ আফ্রিকার নামী মডেল ইলিন হামান, আবার অমিতাভ-র হোম প্রোডাকশন ‘বিরুদ্ধ’র জন্য পাঁচ হলিউডিনি লড়ছেন, জন আব্রাহাম-কে প্রেম বিলাবেন। কিন্তু আমাগো ললনা ফিরিস্তি ধিস্তির চেয়ে কম কীসে? পেলায় টুকটুকে, স্কিনের পালিশের মতোই মসৃণ অলজ্জায়

মেথলা খসাচ্ছেন রেগুলার। বোধহয় এ স্রেফ বিদেশিনি ফলিয়ে ‘বিশ্ববাজার ধরার চেষ্টা’ নয়, বরং হঠাৎ টাকা করার গরমে অ্যাদিনের অগ্রাণীয়াকে আমার বাহুঘেরে আনছি: তৃপ্তি। মধ্যখানে সাহেব টেনে ভারতীয়দের দু’ভাগ করা যায়, কেউ সাদা দেখলে পাভলভীয় সারমেয়র ন্যায় নালেঝোলে, কেউ ফরেন-দল সেনেগালের কাছে গো-হার তো স্পেশাল মাংস। দু’পক্ষই ইয়াবড় চক্ষু করে দেখবেন, এক নিতান্ত কালা আদমির বাদামি কলজের তরে নীল-রক্ত রাজকন্যে তড়পে তড়পে মরছে! আমাগো তামাটে ঘেমোবক্ষে ছুটে পড়তে সে গোলাপি-গোড়ালি নায়িকার পাঁশুটে মুখের আবেশকুঞ্জন, ফ্যাকাশে ত্বকের রোমাঞ্চ, ধবধবে ক্লিভেজ-আকুলি: এক অদ্ভুত প্রতিশোধ নয়? কিংবা স্বপ্নপূরণ? প্রভুপত্নীকে অধিকারের? প্রভুকন্যাকে চুলের মুঠি ধরে অঙ্কশায়িনী করার? ঝোপড়পড়ির অশিক্ষিত হয়ে ঠাকুরসাহেবের একলৌতি পুষ্পটিকে ছিন্ন করে বোর, এ বার খাঁটি আর্থরাজ্যে তরোয়াল ঘুরিয়ে ঢুকে পড়ল বুট-খাওয়া উপজাতি, গালে কাটা দাগ, শ্বাসে গন্ধ, কিন্তু এত কাল বুঝিসনি পোড়ারমুখি, হৃদয়পদ্মটি সাক্ষাৎ সোনার?



পুরনো সাদা-কালো হিন্দি সিনেমাগুলোকে রঙিন করার, না না রি-মেক নয়, প্রতিটি ফ্রেম ধরে ধরে রং করে দেওয়ার চক্র চালু। আর দু’মাসের মধ্যেই সিনেমাস্কোপে রমরমাতে আসছে ‘মুঘল-এ-আজম’। বিখ্যাত কাওয়ালি-দৃশ্যে দেখবেন সোনার অলঙ্কার আর উজ্জ্বল কমলা কস্টিউম পরা মধুবালা, ঝগড়াদৃশ্যে গম্ভীর রং-মণ্ডিত দিলীপকুমার আর পৃথ্বীরাজ কপূর, সর্ব্বলে আবার ডলবিতে কথা বলছেন। হলিউডের কিছু ক্লাসিককে এমন করা হয়েছে, এখানেও কাণ্ড শুরু হয়ে গেল। রং-ঢং দারুণ, কিন্তু যা ছিল কালো-ধলো, হোলসেল রঙে রঙে রাঙা হওয়া কি স্বাস্থ্যকর? বুঝতে হবে, ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইটের আলাদা লাভণ্য আছে। গোড়া থেকেই রঙিন সিনেমা আবিষ্কৃত হলে নির্ঘাৎ দিব্যি হত, কিন্তু আরে বাবা, যাঁরা জেনেবুঝে সাদা-কালো ছবি তুলছেন, তাঁরা সেই সীমাবদ্ধতা অনুযায়ীই ‘স্টাইল’ তৈরি করছেন, ক্যামেরাম্যান ও পরিচালক প্রতিটি খুঁটিনাটি এমন ভাবে সাজাচ্ছেন যাতে তা সাদা-কালোয় রমণীয় হয়ে ওঠে। ঝপ করে ডিসটেম্পারে চুবিয়ে দিলে তাঁদের পুলক না-ও জাগতে পারে। এ বার তো তবে চ্যাপলিনের নির্বাক ছবিগুলোকে প্রবল হইহই কথাবার্তা দিয়ে ‘ডাব’ করতে হয়। আহা রে বেচারি, হাত-মুখ নেড়ে বোবার মতো সব বোঝাচ্ছে! আর কী, কম্পিউটার দিয়ে হাঁ করা, আর রসের কথা বচনকে দিয়ে বলিয়ে দে। সব যুগের সব মাধ্যমে কিছু ‘দুর্বলতা’ থাকে, বড় শিল্পীরা সেগুলোকেই জোরের জায়গায় পরিণত করেন। যে কোনও প্রতিভাবানের নিজস্ব শৈলী তৈরিই হয় কতকগুলো বাঁধন, অলঙ্ঘনীয় শর্তের প্রেক্ষিতে। হালফিল কিছু সুবিধে আমদানি হয়েছে মানেই এই নয় যে আমি আগের শিল্পগুলোকে ধরে ধরে আমার ছাঁচে ঢেলে ‘উন্নততর’ করে দেব। তাই ‘আহা উহারা রং দেখাতে পেত না’ বলে আদিখ্যেতা চরম নির্বোধের কাজ। রং দেখাতে পেত না বলেই অন্য রকম ভাবে পোশাক-আসবাব-আলো বিন্যাস করত। ‘মুঘল-এ-আজম’



মুঘল-এ-আজম : করবে ছবি রং দেবে না, তা-ই কখনও হয়?

তো আবার আংশিক রঙিন। তার মানে কত বুঝে-শুনে অ-রঙিন সিকোয়েন্সগুলো তোলা হয়েছে! এ ঝঞ্ঝাটে শুধু যে আবেগ ও নস্টালজিয়া টোল খাবে, তা নয়, সিনেমার ক্ষতি হবে। ছবিগুলি যে ভাবে অষ্টারা করতে চেয়েছিলেন, তার বিরুদ্ধে যাওয়া হবে। অবশ্য রাঙা না শুনে মর্মের কাহিনি, এ জিনিস রটি যাবে ক্রমে। ভাবতেও কাঁটা দেয়, কোন পুজোয় রিলিজ করবে রি-ডান পথের পাঁচালী: লাল টকটকে শার্ট পরে অপু ছুটে যাচ্ছে নীল এক্সপ্রেস ট্রেন দেখতে! বঙ্গ-আঁতেলের তখন গুচ্ছের দ্বন্দ্ব: ‘মেঘে ঢাকা তারা’য় সুপ্রিয়ার দগদগে যক্ষ্মারক্ত দেখা গেলে শেষ দিকে অতটা ‘দাদা আমি বাঁচতে চাই’ দরকার আছে কি? আরও: ‘গুগাঝাঝা’ পুরো সিনেমা সাদা-কালো, শেষ শট রঙিন। এ বার কি পুরোটা রঙে ধুইয়ে, শেষ শট সাদা-কালো করে দেওয়া হবে?



তুলসীর শ্বশুর মারা গেলেন। শাশুড়ি সকালে টিপ পরতে ভুলে গেলেন, হাত থেকে পুজোর থালা ঝনঝনিয়ে স্লো মোশনে পড়ে গেল, তবু বুঝতে পারেননি। শ্বশুরের মা তখন ক্যারম খেলছিলেন, পুতি-পুতনিদের সঙ্গে। একটা বেস ফেলেও দিলেন, হেনকালে চোখে-জল তুলসী এসে মোক্ষম ডায়লগ, ‘সব বয়স্ক কেন আপনার মতন মায়ার বন্ধনে আটকে থাকতে পারেন না?’ বুড়ি তো শুনে তড়াক। ঘোরালো বাংলা করলে দাঁড়ায়, তুই মরছিস না ইদিকে সবাই যে সটাসট মায়ী কাটাচ্ছে রে! কিন্তু একে হিন্দি সিরিয়াল, তদুপরি তেড়ে শোক, বৃদ্ধা কিচ্ছু মনে করলেন না। আসলি ঝামেলা: স্টার-এর সঙ্গে কাদের হ্যাভক কলহ, চ্যানেল অনেক জায়গায় আসছে না, ইস, বহু যথাযথ মর্যকামী দর্শক এই বেদনা-সপ্তাহে বেমক্কি অ্যাবসেন্ট হয়ে গেলেন। শুধু বাংলা রোলারলি দেখলে আমাদের চলবে? হিন্দি মড়াকান্না রোজ ডিনারের আগে খাই না? তা হলে গোটা দেশের এই সমষ্টিগত অশৌচ থেকে বঞ্চিত রইব ক্যান?

১২ সেপ্টেম্বর, ২০০৪

ও হে মন স্টার তম

আজ, যখন মাদ্রাসায় ঢুকে পড়ছে মাল্টিমিডিয়া, শিবসেনা ক্রিশ্চান ভোট টানতে পোস্টারে ছাপছে 'দ্য প্যাশন অব দ্য ক্রাইস্ট' ছবির স্টিল, 'টাইম' পত্রিকার প্রচ্ছদে জুলজুল শাহরুখ খান, লেননের হত্যাকারী চব্বিশ বছর জেল খাটার পর এ সপ্তাহে ছাড়া পাওয়ার চাল হাই, এলটন জন বলছেন ম্যাডোনা ফাংশনে গান না গেয়ে লিপ দেন, অস্কার ওয়াইল্ডের সমকামী প্রেমিক অ্যালফ্রেড ডগলাস-এর তেড়ে-গালাগাল-পাণ্ডুলিপি নিলাম হচ্ছে সদবি'জ-এ, নন্দিতা দাশ পরিচালিত ছবি 'গ্রিন অস্কার'-এর ফাইনালে (ওর আসল নাম 'পান্ডা অ্যাওয়ার্ডস', লন্ডনে অনুষ্ঠিত দ্বিবার্ষিক উৎসবটি পরিবেশ ও বন্যপ্রাণী বিষয়ক ছবির), 'মুসাফির' ছবির 'আইটেম বন্ড' খুঁজতে তুলকালাম স্বাস্থ্যবতীদের লাস্য-অডিশন হয়ে যাচ্ছে কলকাতায়, 'লাইফ ইজ বিউটিফুল'-এর পরিচালক রবের্তো বেনিনি এ বার ইরাক যুদ্ধের প্রেক্ষিতে কমেডি তুলছেন 'দ্য টাইগার অ্যান্ড দ্য স্নো', মীরা নায়ারের হলিউডি ছবি 'নেমসেক'-এ ডাক পাচ্ছেন কঙ্কণা সেনশর্মা, দূরদর্শন ক্রিকেট দেখিয়ে দু'দিনে বিজ্ঞাপন তুলছে আশি কোটি টাকার, ব্রিটেনে বেরোচ্ছে 'নেকেড সিটি' ছবির বই যাতে পার্কে-দোকানে-বাসস্টপে নগ্ন হয়ে নাগরিকরা স্বেচ্ছায় ও স্বস্তিতে পোজ দিচ্ছেন, শেখর কপুরের ছবিতে রিচার্ড গেরার ও শ্যারোন স্টোনের কাজ করার কথা প্রায় পাকা (পরামর্শদাতা হিসেবে দলাই লামা থাকবেন এটা নিশ্চিত), মুম্বইতে সব্যসাচী দেববর্মণের পরিচালনায় মিউজিকাল নামছে 'ম্যায় সচিন তেডুলকর', বুশকে সপাট থাপ্পড় তথ্যচিত্র '৯/১১' আমেরিকায় রমরমিয়ে সফলতম ডকুমেন্টারির রেকর্ড গড়ছে কিন্তু ভারতীয় সেন্সর বোর্ড 'মাসির দরদ বেশি' প্রমাণ করতে তার নাকে দড়ি দিয়ে এ কমিটি ও কমিটি ঘোরাচ্ছে, 'ব্রাইড অ্যান্ড প্রেজুডিস' ছবির সাংবাদিক বৈঠকে বার কুড়ি ঐশ্বর্য রাইকে প্রশ্ন করা হচ্ছে জীবনের প্রথম ইঞ্জিরি ছবিতে তিনি শ্রেফ ললাট ছাড়া কোথাও চুমু অ্যালাউ করলেন না কেন, তখন আর তথ্যের গত্তে না পড়ে প্লেন কচালি হোক পর-প্যারা থেকে।



পুজো আসি গেলা। সংস্কৃতির বাম্পার সিজন। আর যায় কোথায়, গুদাম-চিলেকোঠা-ঘুলঘুলি, ঠান্মার তোরঙ্গ ময়ূরের ন্যাজ, যেথা হতে যা, হাঁকড়েপাকড়ে প্যাণ্ডেল গড়ে ফেলছে কমিটি। বাচ্চারা খেলনা আর পাগলরা পুঁটলি আগলাচ্ছে, কখন না মগুপসজ্জায় জুড়ে যায়। কারা যেন লজেন্স-এর প্যাণ্ডেল করছে। বিস্কুটের প্রতিমা শুনেছি অষ্টমীর মধ্যেই

পিঁপড়েরা সাবড়ে দিয়েছিল, এটা দেখতে যাওয়ার জন্য এখনই লোকের যা নাল পড়ছে, মনে হয় পিঁপড়ের চাকরি বাতিল। কোম্পানির নাম লেখা গেঞ্জি পরে দোকানের সামনে ঢাকিরা প্রাণপণ ঢাক তো বাজাচ্ছেই, তার ওপর হাঁ করে আছে শারদীয় ফাংশন, আবাসনের ভুঁড়িওলা এক্সিকিউটিভরা আগমনী গেয়ে স্টেজ ছাড়তে না ছাড়তে সরসর করে ছোটদের দল, ‘আমি কলকাতার রসগোল্লা’ সমবেত নৃত্য হবে। লোফারদের তো অলিম্পিক, তিন দিনে তেত্রিশশো মেয়ে দর্শন, বছরকার নয়া আওয়াজ আবিষ্কার: কম সংস্কৃতি! একডালিয়ায় ‘চাম্পিস’ বলে এলে বাগবাজারে তো ‘চিহ্নাঙ্ক’ বলতে হবে, নাকি? এর মধ্যে আবার তকতকে হোর্ডিং পড়ে গেছে, সিংহের মুখে হাত ঢুকিয়ে জুন মালিয়া আতঙ্কিত হয়ে কী মিষ্টি পোজে শোভাচ্ছেন! ‘রোমান হলিডে’র দৃশ্যকেও সুতীর বংফাই করে ঝড়াকসে পুজো-অ্যাডে এনে ফেলব, তবে না বস কলকাতা!



মনোজ নাইট শ্যামলন-এর ‘দ্য ভিলেজ’ এমনিতে বোর, কিন্তু আইডিয়া তুখোড়, তদুপরি গান্ধীর ছায়া ওই যে পষ্ট দেখা যায়! একটা গ্রামে কেউ কক্ষনও সীমানার বাইরে যায় না, জঙ্গলে নাকি অ্যায়সা বিকট মনস্টার-রাশি, নাম অবধি মুখে আনতে নেই। গ্রামের ছেলেমেয়েরা শহরের কথা শুনেছে, কিন্তু যাওয়া তো কল্পনার বাইরে, ফরেস্ট দাঁড়ায়ে যে বাব্বা! সন্ধলে এমনিতে সুখী। আর ভয়ে কাঁটা। লাল রং গ্রামে ঢোকা বারণ, ও রঙের ফুল ফুটলেও মাটিতে গোর দাও, কারণ ওই বর্ণ ‘ওঁদের’ আকর্ষণ করে। ‘গুরুজন’দের একটা কমিটি গ্রাম চালান। গ্রামে কোনও পয়সার চল নেই, এ কাঠ চেরে তো ও বাঁধাকপি ফলায়। পরব-পাব্বনে সব্বাই সবার ঘাড়ে হাত রেখে নেচে, উদযাপন করে এই বন্ধ, স্বস্তিময় কুঠুরি। গল্প বহু দূর গড়ায়। শেষে বোঝা যায়, মনস্টার নেই, ছিল না। ‘গুরুজন’রা হলেন বারে বারে নিষ্ঠুর সমাজের খচাং ঘা খাওয়া কিছু লোকের দল, একটা কাউন্সেলিং সেন্টারে তাঁদের দেখা হয়েছিল, বন্ধুত্ব, তার পর এক জনের এই আশ্চর্য আইডিয়া। জঙ্গলে এসে গাঁ-পত্তন, পরবর্তী প্রজন্মকে মনস্টার-গল্প শোনানো, যাতে কোনও দিন, কখনও, তারা মুখোমুখি না হয় শহর-অসভ্যতার (যে মনস্টারতর)। অর্থাৎ দাও ফিরে সে অরণ্য, লও টাকা, টিভি, টেনশন। লোভ। লোভ নেই, তাই অপরাধ নেই এখানে। শ্রেফ পবিত্রতার রাজ। বাহির-ফোবিয়ার এ সেফ খেলা বুঝেবুঝে খুঁকখুঁক করে এক রকম হাসি পায়, কারণ তবে তো বাপু জীবন (ও মৃত্যুকেও) অন্য ভাবে সংজ্ঞায়িত করতে হয়, ওষুধপত্র ছাড়া টিকতে গিয়ে সর্দিজ্বরে পটল তুলবে যখন। সভ্যতার লাল টকটকে পাপ-প্যাকেজ ফেলতে গিয়ে অন্য কালারের আশীর্বাদগুলো বেঘোরে নালায় ওন্টালুম, কাজের কথা না (প্লাস যৌন ঈর্ষার রক্তধ্বজা বস এড়াতে কোন কন্নারে গিয়ে দুনিয়ার), আর একটা সময় তো ওই গাঁ-গোষ্ঠীর মধ্যেই বিয়ে হতে হতে জিনের ক্রস-ওভার টোটাল বন্ধ, তখন ইনসেস্ট-মহামারিতে মরবি নাকি? দ্বার বন্ধ করে দিয়ে নগরেরে রুখি, এ নিতান্ত গ্রাম্যতা। তার চেয়ে খরখরে কাঁটাওলা জীবনের ওপর বুক

দিয়ে পড় বাপ, ‘ওহে মনস্টারতম’ নির্যোষে। মশারি
খাটিয়ে কামড় থেকে বাঁচবি, হাওয়ার আদরও তো
কম পাবি বোকাসুন্দর। তবে আসল লক্ষণীয় গান্ধীর
তত্ত্ব: তৈরি করো এমন গাঁ, যা স্বনির্ভর হবে, বাইরের
কোনও কিছুর ধার ধারবে না, এ ভাবে নগরজীবন-
শিল্পায়ন-দূষণ-দুর্নীতি-লালসা, যাকে আমরা শটে
‘আধুনিক’ জীবন বলি, তার সমস্ত পাপ ও মালিন্য
থেকে দূরে কোথাও আরও দূরে গিয়ে ভারত এক
চিরন্তন শান্তির আখড়া হয়ে উঠবে। বাপ্পো, কেমনে
শ্যামলন পেরেছে সেটা জানতে! আর, গান্ধীকে হরর
ফিলিমেও এনে ফেলার যুগান্তকারী ‘নাইটহুড’ দেখে
সেমিনার-পণ্ডিতদের পেপার হরে গেছে কি?



দ্য ভিলেজ : লাল ফুলে নিরাপদ হলুদ লাগালে কেস জডিস



‘মঙ্গল পাণ্ডে স্মৃতি কমিটি’ কেতন মেটাকে ওয়ার্নিং দিল, ‘দ্য রাইজিং’ ছবিটি মঙ্গল পাণ্ডেকে নিয়ে তোলা হচ্ছে, ওতে যেন
কোনও চুম্বনদৃশ্য না থাকে। শ্যাম বেনেগালের নতুন ছবিতে নেতাজি সঙ্গিনীর হাত ধরে হেঁটেছেন বলেও হ্যান্ডাম ঘটেছে। সত্যি,
প্রণয়, তার যমজ ভাই যৌনতা, সে সব নশ্বর বদভ্যাস কিনা আলো-পুরুষদের? ওঁরা বাথরুমেও নাগাড়ে সমাজের কথা ভেবে
চলেছেন না! ফাজিল ফিলিম্যানগুলোকে শত ধিক একশো ছি! কোন দিন কোন বেঁড়ে হয়তো দেখাবে মনীষীদের সন্তানও হয়।
হলে নিশ্চয়ই ভগবান বা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ বাড়ি বয়ে উপহার দিয়ে যান, টুকটুকে রিবনে প্যাক করে। আসলে আমরা
ভারতীয়রা আজও সেই ক্লাস সিক্সের অমোঘ দিনটিতে, লাস্ট বেঞ্চার নিতম্বপঙ্ক ছোঁড়া প্রজননপ্রক্রিয়া ফাঁস করার পর কানে-
আঙুল বলছি, ছ্যাঃ, আমার বাপ-মা কক্ষনও নয়! যখন মোটামুটি ম্যাচিয়োর সমগ্র ধরণী, রেখেছ হে মাটি করে, স্মাট-ই করোনি!

১০ অক্টোবর, ২০০৪

ভূ তে র ভূ ত ? ধূ ত !

আজ, যখন এমিনেম-এর মিউজিক ভিডিয়োয় ব্যঙ্গবিন্যাসে নাচতে নাচতে মাইকেল জ্যাকসনের নাক খসে পড়ছে, প্রিন্স-এর মিউজিক ভিডিয়োয় একটি মুসলিম মেয়ে ৯/১১-উত্তর সমাজে সর্ব ক্ষণ কর্কশ নজর সইতে না পেরে কল্পনা করছে বোম মেরে একটা গোটা এয়ারপোর্ট (এবং নিজেকেও) উড়িয়ে দিলে বেশ হত, ফ্রান্সে এ বছরের শেষে আট বছর বয়স থেকে ইংরিজি পড়া বাধ্যতামূলক হচ্ছে বলে প্রতিবাদের ঠেলায় দেশ উত্তাল, ২৬ নভেম্বর নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে আসছে দুর্দান্ত রাশিয়ান সার্কাস যাতে ৪০ ফুট ব্যাসের স্টেজ তৈরি হবে পুরো বরফ দিয়ে এবং থাকছে চারটে সামুদ্রিক সীল, ১৩টা এক্সিমো-কুকুর, ১০০টা পাখি (পেঙ্গুইন আর মেরুভালুকের জন্য অ্যাপ্লাই করা হয়েছিল কিন্তু নাকচ হয়ে গেছে), 'দ্য পোলার এক্সপ্রেস' অ্যানিমেশন ছবিতে টম হ্যাক্সস পাঁচটি চরিত্রের স্বর একাই দিচ্ছেন (একটি আবার সান্তা ক্লজ), গার্সিয়া মার্কেজ দশ বছর পরে উপন্যাস লিখছেন 'মোমোরিজ অব মাই মেলানকোলি হোর্স' যার অন্তিম অধ্যায়টা বুক-পাইরেসির ভয়ে বদলে দিচ্ছেন শেষ মুহূর্তে, তখন তথ্য-গত্ত ছেড়ে প্লেন কচালি পর-প্যারা থেকে।



শীত-শীত কলকেতায় সংস্কৃতির জোড়াফলা: দু'দুখানি ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল (সরকারেরটা নন্দন চত্বর+কিছু হল, সিনে সেন্ট্রালের 'গ্লোব'-এ), এ মওকায় অ্যাবসেন্ট হলেই আঁতেলরা বেমক্কা ডিসকোয়ালি। এ সিজনে বার্গম্যানকে 'বেয়ারম্যান', ঘরানাকে 'জঁর' ও গাঁজাখোরকে 'ক্রিয়েটিভ' আখ্যায় ভূষিত করতে হয়। প্রথম উৎসবে হাঙ্গেরিয়ান পরিচালক ইস্তভান জ্যাবো-র রেট্রোসপেক্টিভ, অন্যটির স্টার ইরানীয় পরিচালক মহসিন মাকমেলবাফ। অবশ্য অত বলতে হবে না, ফিল্ম স্টাডিজ পড়লে 'বাফ' বললেই চলবে। 'বাফ কী ফাটাচ্ছে' শুনে মুখ্য তুমি রেগে বলে ফেললে 'বাফ তুলছেন কেন', পুঁদিচ্ছেরি! 'তারক' মানে বাঁক কাঁধে ভোলেবোম নয়, হিহি, আসলে তারকভস্কি জপতে আছিল!

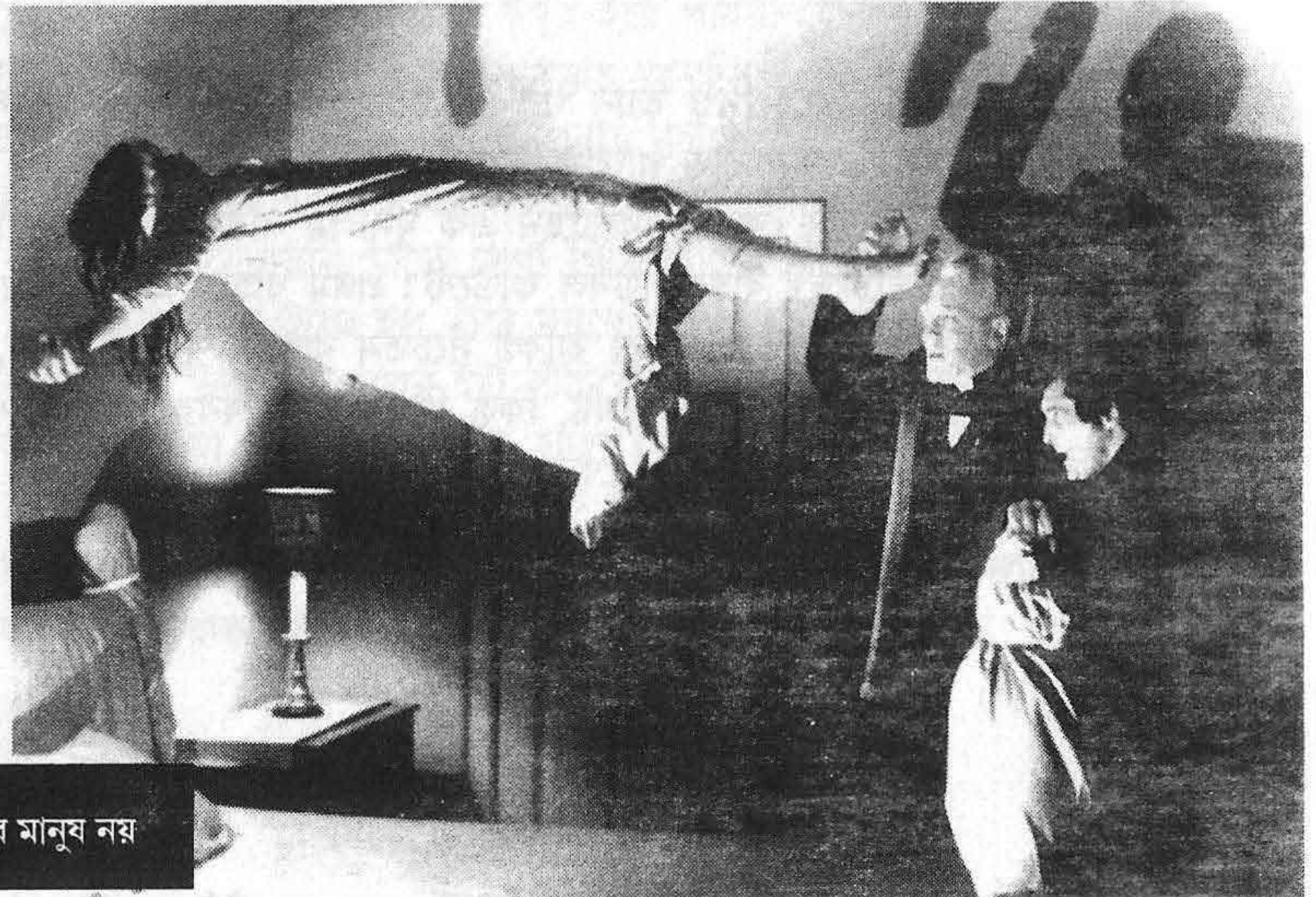


ইদিকে যখন মা কালী সুপারমডেলের সাজে ও পোজে সোয়ামীর বুক মাড়িয়ে জিভ কেটে অ্যাল, এথনিক ফেমিনিজ্‌মের পিদিম জ্বলে পোয়াচোদো, উদিকে 'কহানি ঘর ঘর কি' সিরিয়ালে কৃষ্ণ ৩৩% সম্পত্তির বিনিময়ে স্ত্রীকে এক রাত্তিরের জন্য ভিলেন-ভাইয়ের কাছে সটান বিক্রিবাটা। সম্পত্তি উদ্ধারকল্পে এর আগে মহামানুষ কাব্যগুণায় উক্ত কাণ্ড

ব্লাভারিছেন, তখন কৃষ্ণঠাকুর রইরই এসে ভিকটিমেয়ের লজ্জাহর। সেই থেকে শরমঝঙ্খায় হর লড়কি কেঁপেচরণশরণং (আবার 'কিঁউ কি...' -তে নন্দিনী যখন দাম্পত্য ধর্ষণের শিকার, তার আত্ননাদ ঢাকতে বদমাশ স্বামী চালিয়ে দিয়েছে গোবিন্দবন্দনার ক্যাসেট: ট্র্যাজেডি ফেঁপে চতুর্গুণ), আর এখানে, স্ত্রীর সংলাপে, 'সেই কৃষ্ণই মোরে লজ্জায় চোবালে! এ বার থেকে তো, যেমন কেউ সন্তানের নাম রাবণ বা কংস রাখে না, তেমন কৃষ্ণও রাখবে না!' এবং সারেভার-স্বামীকে দেঁড়েমুশে প্রতিশোধিয়ে: 'হ্যাঁ, আমি যাব। ওর বিছানায়। এ রাতের পর ফিরে এসে আমি আর আয়নার দিকে তাকাতে পারব না, কিন্তু আমার দিকে তাকিয়ে তুমি ভাঙা আয়নার মতো চুরচুর, তা দেখে আমি তৃপ্তি পাব।' কুর্নিশ। এরেই বলে উদ্ভাসিত নায়িকা দর্পণে, কিংবা রাদার: দর্পণ নায়িকায়।



ভূতের মরসুম। শহরে 'এক্সরসিস্ট : দ্য বিগিনিং' এবং 'বাস্তুশাস্ত্র'। দুটিই যাচ্ছেতাই, তবে রামগোপাল-ফ্যাক্টরি লক-আউট অবিলম্বে। সারা সিনেমা জুড়ে একটা হলদে ক্যাম্বিস বল গড়িয়ে আসছে আর খ্যানখ্যান করে বাচ্চার গলায় শাঁকচুনি-টাইপ অটু, এতে কে ভয় পাবে কে জানে। চোখের তলায় কিছু কালি আর ঠোটে নীল লিপস্টিক লেপে দিব্যি মানুষগুলোকে ভূত বলে চালানো হল, কেন যে তারা তাবৎ হোমো স্যাপিয়েন কোতলিতে চায় কারণ বোঝা গেল না, বৃত্তান্তটি যে জানত সেই বন্ধ পাগল এত ভাল অভিনয় করেছে যে তার কোনও প্রলাপ সত্যিই বোঝা যায়নি। এর চেয়ে একশো গুণ দড় কারুকাজ নিয়ে জঘন্য শিল্প রচা হল ভূবিখ্যাত ভয়ছবির 'প্রিকোয়েল'টিতে (কোনও হিট ছবির যখন পার্ট টু বা থ্রি হয়, তাকে বলে 'সিকোয়েল'। অর্থাৎ মূল ছবিটা যখন শেষ হল, তার পর কী ঘটল। আর যখন কোনও ছবি দেখাতে চায়, মূল ছবিটি যেখান থেকে শুরু হয়েছিল, তার আগে কী ঘটেছিল, তাকে বলে 'প্রিকোয়েল'। 'এক্সরসিস্ট' খুব সোজা ছবি নয়, কতকগুলো হায়না হামলালে আর দাঁড়কাকে চোখ ঠোকরালেই সাজা যায় না মাস্টারপিস ভূতছবির ভূতপূর্ব! বীভৎস ও ঘিনঘিনে কিছু স্পেশাল এফেক্ট ওই ছবিটির মূল লক্ষণ নয়। হ্যাঁ, নাৎসিদের অত্যাচার দেখে আন্তিক পুরুত নাস্তিক হয়ে গেছেন, এ



দ্য এক্সরসিস্ট : ভূত মানেই মাটির মানুষ নয়

দেখিয়ে একটা সাদৃশ্য আনার চেষ্টা হয়েছে, মূল ছবিতেও এক পাদ্রি বিশ্বাস হারিয়েছিলেন ও পরে শয়তানের অস্তিত্বে নিশ্চিত হয়ে অনুসিদ্ধান্ত অনুযায়ী ঈশ্বরের অস্তিত্বে প্রত্যয়ী হন, কিন্তু বাকি যে বহুস্তর ঘনঘটা? সবচেয়ে অসহ্য ন্যাকালু তো শেষে কৃষ্ণাঙ্গ মুসলিম শিশু এবং শ্বেতাঙ্গ কেরেস্তান বয়স্কের যৌথ প্রয়াসে ডেভিল বিতাড়ন। ব্যাটা তুই বাগাচ্ছিস তুলকালাম সিনেমার দোসর, তো পলিটিকালি কারেক্ট হওয়ার তাড়নায় মরচ্ছিস কেন র্যা? আসলি ছবিটায় মা মেরির মূর্তির চরম অপমানজনক বিকৃতি, বয়ঃসন্ধির প্রাপ্তে মেয়েটির ঘরভরা অতিথিদের সামনে হিসি করে দেওয়া, চূড়ান্ত অশালীন খিস্তি, ক্রুশ দিয়ে হিংস্র স্বমেহন করে রক্তাক্ত কৌমার্যনাশ, বিজ্ঞানের হামবড়া-সবজান্তা ভেক কিন্তু আদতে দ্বিধাচুলকোনো স্বরূপ ও চিকিৎসাবিজ্ঞানের মানুষের শরীরের ওপর স্বৈরাচার (অসংখ্য প্রতীকে যা প্রায় যৌন অত্যাচার হিসেবে উপস্থাপিত), মনস্তত্ত্ববিদকে পুরুষাঙ্গ খেঁতলে অপমান, পরম ওঝার প্রথম আবির্ভাবে তাঁকে কালো অন্ধকারে রেখে শয়তানের জানলা থেকে মায়াবী আলোর বিম রচনা, এবং সর্বোপরি ‘গুড এগেনস্ট ইভিল’ নয়, ‘ইভিল এগেনস্ট ইভিল’ দিয়ে (পাদ্রি নিজের শরীরে শয়তানকে নিয়ে, আত্মহত্যা করেন) ভয়াবহ সমাধান— রাশি রাশি পলিটিকালি ইনকারেক্ট দ্যোতনা ম-ম করছে! আরে বাবা, উচিতগন্ধী পারফিউম নিয়ে কারবার করবে কিছু সেমিনারবাজ আর খবরকাগজ-কলমচি, যারা পপুলার কালচার থেকে প্রবণতাগুলি খুঁটে খুঁটে নিয়ে তত্ত্ব বানাবে, কারণ তাদের আর কোনও কাজ নেই। শিল্পী এ রঙে রাঙলে পৃথিবী পিকাসো পেত না, দালিও না। বার্গম্যান-এর ‘ক্রাইজ অ্যান্ড হুইসপারস’-এর বিপক্ষে অবধি পণ্ডিতনিরা নারীবিশ্লেষের হিড়িক তুলে ফাটিয়ে দিচ্ছেন। মা আমার, যদি ওই ছবি করতে শাভিনিস্ট হতে হয় তবে সেহেন ভয়পুরুষ যেন ঘরে ঘরে জন্মায়, বসুধা ওঁদের প্রসব করে ধন্য বই হবে না।



হল্যান্ডের ছবি-করিয়ে থিও ভ্যান গখ-কে হত্যা করা হল, ইসলামীয় সমাজে মেয়েদের নির্যাতন নিয়ে ফিল্ম করেছেন বলে। আমস্টারডামের ব্যস্ত রাস্তায় তাঁকে গুলি করে এবং ছুরি মেরে খুন করা হল। কী? না, স্বল্প দৈর্ঘ্যের ছবি ‘সাবমিশন’-এ তিনি কেন দেখিয়েছেন এক মুসলিম নারীকে তাঁর স্বামী অত্যাচার করছেন? এ কখনও, কভু, কোনও দিন, কদাপি ঘটেছে? বাহবা। ডবল কাউন্টে। প্রথম বাহবা এই ফতোয়া-ঐতিহ্যের যথাযথ মর্যাদা-রক্ষাকারী গামবাট শিল্পবোধকে, আর দ্বিতীয় বাহবা আকর্ষণ সচেতন বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের, যাঁদের কলমের কাঁউকাঁউ অশ্রুপাত উসকে দিতে এমনিতে দেড় সেমি খবরই যথেষ্ট, কিন্তু থিও-হত্যার খবর সর্বত্র ছাপা হলেও, এই মৌলবাদ নিয়ে কোনও বক্তৃতি/সন্দর্ভের ঢল নামেনি। কেন?

১৪ নভেম্বর, ২০০৪

ব ড় দা - ঘা ত ক স্প র্ধা

তসলিমার সৌজন্য কলকাতার পক্ষে বিলক্ষণ মঙ্গলজননী। শ্রীমতী নাসরিনের ব্যক্তিগত সিনেমা-সংগ্রহ 'ভাল ছবি' থেকে নির্বাচিত কয়েকটি দেখানো হল ক'দিন ধরে গোর্কি সদনে, আইজেনস্টাইন সিনে ক্লাব-এর সহায়তায়। প্রতিটি ছবি বিশ্বখ্যাত, কিন্তু ফাটিয়ে দিলেন লার্স ফন ট্রায়ার। ডেনমার্কের এই ঈশ্বরটি নিঃসন্দেহে এই মুহূর্তে এ গ্রহের সর্বাধিক চমকপ্রদ পরিচালক, গোদারের পর এমন দুরন্ত বালক সিনেমাখেলেনা ধরেনি। গোদার-এর তুলকালাম অবদান, তিনি গাঁদামালামণ্ডিত বেদী থেকে ঝড়াকসে নড়া ধরে সিনেমাকে নামিয়ে এনেছিলেন পোষা গলতায়। বাংলার এক সেরা কবির লাইন ঈষৎ পেঁচিয়ে, গোদার বললেন, 'রাখো গরম পেয়ালা এই ফ্রেমের উপরে। জলের গেলাস রাখো। শোনো এ-ও কাশে। তোলে হাই। যেন কালা, শোনে না অপ্রিয় সত্য।...তাকে দিও যত পারো ঘরের খুচরো কাজ। পয়সা কাটো।' এই ভাবে, কোর্টশিপের যৌনাঙ্গহীন ডিওডোর্যান্টবাচক শুচিতায় টেনে লাথ মেরে, শ্বাসগন্ধী আশ্লেষের মাধুর্য ও বিবমিষা যুগপৎ ছড়িয়ে দিলেন ফরাসি বিপ্লবী। ফন ট্রায়ার এ মিশনেরই সঞ্জীবনী রিনিউ করছেন। টেকনোলজি যে শিল্পকে উপর্যুপর ধর্ষণ করে চলেছে, তার বিরুদ্ধে যেতে লার্স ও কয়েক জন সতীর্থ মিলে ম্যানিফেস্টো লিখেছেন, 'ডগমা ৯৫', এর দশটি সূত্র মেনেই তোলা হয়েছে 'দ্য ইডিয়টস', যা দেখানো হল গোর্কিতে। প্রতিটি শিল্পেই কুলীনরা কিছু ব্রাহ্মণ্য মশারি খাটিয়ে রাখেন বাউন্ডারিময়, যাতে নিজস্ব তেজগর্দান ঘ্যামরসে টম্বুর হয়ে পায়রা-ফোলন পায়, তাই অনুশাসন এমত, 'আগে ছন্দ জেনে তবে ছন্দ ভাঙো', বা 'সুললিত ক্যামেরাকাজ সিনেমায় আবশ্যিক', ও গোছের ফিলিম-পুরোহিতদের ননীকপোলে ছিপটি মারতেই 'ডগমা', তবে তারও কিছু বালখিল্যপনায় মুচকি তো বটেই (শুটিংস্থানে কোনও জিনিস বাইরে থেকে আনা যাবে না, অর্থাৎ, যে বাড়িতে শুটিং হচ্ছে, সেখানে মরণ-দরকার হলেও সবুজ মগ আমদানি উঁহু, বরং সবুজ মগ আছে যে বাড়িতে, ক্যামেরাতল্লি ঘাড়ে সেথা গিয়ে শুটিং শুরু করতে হবে। ফের, তাবৎ ধ্বনি লোকেশনেই রেকর্ড করতে হবে। অর্থাৎ, আপনার ইচ্ছে হল মাঠে মরবে ঘোড়া আর ব্যাকগ্রাউন্ডে পৌঁ করুণ তারসানাই, বাজনদারকে আলকুশি ঝোপের আড়ালে উবু হয়ে খুরের চাঁট বাঁচিয়ে অশ্রুসজল থিম বাজাতে হবে!), তবে এ সব নির্ঘাৎ বাষ্পীভূত হবে ও থাকবে শাঁসটুকু, যা শিল্পের মূল কথা: সাহস। স্পর্ধা। সত্য। যে শিল্প ডিসটার্ব করে না, সে ভাল হতেই পারে, কিন্তু দাঁতে নীচের ঠোট নিষ্ঠুর কামড়ে দিগন্তকে পুশ করার প্রয়োজনীয় কাজটি তার দ্বারা হওয়ার নয়। এ কাণ্ডে ফনবাবুর ধারেকাছে কেউ নেই। গোদার যা-ই করুন, তাঁর বক্তব্য ছিল অতি কড়া ভাবে ও আক্ষরিক অর্থে পলিটিকালি কারেক্ট। লার্স কাউকে তোয়াক্কা করেন না, যে কোনও কুমিরের জলকে নেমে

পড়েন। তাঁর একটি ছবিতে প্যারালিসিস হয়ে যাওয়া পতির অনুরোধে সতী বহুপরিচর্যা করেন ও ফিরে এসে রগরগে বিবরণ দেন, যাতে স্বামীর আরাম হয়। এক সময় নারীটি ঈশ্বরের আদেশানুযায়ী, মৃত্যু নিশ্চিত জেনে ধর্মকামী খালাসির কাছে যান, এই ত্যাগে স্বামীর প্যারালিসিস সেরে যায়। স্বর্গে ঘন্টা বেজে ওঠে। অ্যায়সান চোয়াল খেবড়ে দেওয়া 'ইডিয়োলজিকালি ডেঞ্জারাস' প্রেমছবি এই পিতাপিতে বিধবা-পিসিময় জমানায়! গুচ্ছ উচিতবাদী হায়নার একবগ্না নজরসম্মুখে! বঙ্গীয় হাফ-গেরস্থ আঁতেলরা ডায়লগসর্বস্ব ও লোকেশনবৈচিত্রহীন ছবি দেখলেই 'টেলিফিল্ম' বলে পিছে ধায়, তাদের নাকে ঝামা ঘষে কলকাতা ফিল্মোৎসবে দেখানো হল লার্সের 'ডগভিল', প্রায় তিন ঘন্টার ছবি, পুরোটা একটা থিয়েটার স্টেজের ওপর তোলা। বক্তব্য: সাধারণ মানুষ মূলগত ভাবে ফ্যাসিস্ট! আর 'ইডিয়টস'-এ এক দল লোক মানসিক প্রতিবন্ধী সেজে থাকে। শুধু সমাজের চলতি মূল্যবোধ-আদর্শ-ফটরফটর পরিহার নয়, এরা 'স্বাভাবিকতা' ধারণাটাকেই সটান আঁস্তাকুড়ে। ও দিকে নিরন্তর বাড়তি সুবিধে নিচ্ছে চাঁদমুখে, রেস্তোরাঁয় মিনিমাগনা খায়, বিচ্ছিরি মোমবাতি গড়ে প্রচুর দাম নেয়। দর্শকরা সবে ভাবছেন ইহা বুর্জোয়া সমাজের

হেবির সমালোচনা, সংলাপও আছে, 'এ সব করছি আমার অন্তর্গত হাবাটিকে ছোঁয়ার জন্য', কিন্তু এক জন প্রশ্ন করে, অনেকে তো সত্যিই দুর্ভাগ্যজনক ভাবে এমন অসুস্থ। তাদের কি অপমান করছ না? এটাকে জাস্টিফাই করবে কী ভাবে? উত্তরে প্রধান চরিত্রটি বলে, 'পারব না'। এক দৃশ্যে সত্যিকারের মানসিক প্রতিবন্ধীর একটি দলের সঙ্গে এদের দেখা। ঘাসে ঢাকা লনে কেউ কেউ তাদের জড়িয়ে আদর করে, কেউ খাবার এগিয়ে দেয়, কেউ তিত্তিবিরক্ত উঠে যায়: ব্যাব্যাগো, তুমি থাকো তোমার ওই 'সো কিউট'দের সঙ্গে। আবার শেষ সিনে নিজের সন্তানবিরোগের চরম যন্ত্রণা প্রকাশার্থে এক নারী চামড়ার সব 'সত্যতা' ঝেড়ে ফেলে খাওয়ার টেবিলে মানসিক প্রতিবন্ধীর মতো আচরণ করে, স্বামীর কাছে চড়ও খায়, কিন্তু ও-ই তার শ্রেষ্ঠ আত্ননাদ, সেরা নিরাময়। ছবি আহামরি না হোক, আহা-বাঁচি অবশ্যই। আধমরাদের রেগুলার রাবণ-ঘা দেওয়া মানুষটির প্রতি কুর্নিশ+কোলাকুলি।



১৯৯৩ সালে ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে একটা বোম ফাটানো হয়েছিল। ছ'জন মারা যান, আহত প্রচুর। তা নিয়ে এইচ বি ও চ্যানেল বানাল 'পাথ টু প্যারাডাইস' ছবি, দেখানো হল গত মঙ্গলবার। ওর বকলমে আসলে যে কোন ঘটনার পানে তর্জনী



লার্স ফন ট্রায়ার

সুলসুলোচ্ছে, সহজে মালুম। ফিলিমের শেষে দুই মুসলমানদের শাস্তি, সি আই এ-র জয়, কিন্তু মূল লক্ষণীয় ছবির লীন-তাপ: এই দেশে অভিবাসীদের জন্যও আমরা যে পরিমাণ গণতন্ত্র ও স্বাধীনতা দিয়ে রেখেছি, ব্যাটারা আমাদের খেয়ে-পরে আমাদেরই দাড়ি ওপড়াচ্ছে! দিলদরিয়া দেশটা ফ্রি কিসমিসের ন্যায় সুযোগ-সুবিধে-উদারতা-সৌভ্রাতৃত্বে ঠাসা, উগ্রপন্থীরা অবধি বার বার উল্লসিত বিস্ময়ে বলে, আরে, এখানে তো সবই অ্যালাউড! লিগাল! জেলে থাকা বদমাশ তার শাগরেদকে ফোনে: ‘মজাসে খাচ্ছিদাচ্ছি আর কালার টিভিতে মিউজিক ভিডিও দেখছি। এরা কম্পিউটার কোর্সও করাচ্ছে। আজব জায়গা!’ গাড়ির ডিকি খুলিয়ে প্রকাশিত থরে থরে বন্দুক, কিন্তু লাইসেন্স আছে বলে ছেড়ে দেওয়া হল। সন্দেহজনক ব্যক্তিদের বাড়ি বাড়ি হানা দিতেই শ’গোছা জেহাদমূলক কাগজ/ক্যাসেট, যাতে স্পষ্ট বলা, পশ্চিমি সভ্যতার স্তম্ভগুলি (‘টাওয়ারস’) ধ্বংস করো, সেটাকে ভাবা হল ‘ইসলামিক পোয়েট্রি’, তা ছাড়া, একটা লোকের তো এ কথা লেখার অধিকারই আছে। নায়ক-নায়িকা গোয়েন্দাদ্বয় যত পইপই ওয়ার্নিং মচায়, কতরা বলেন উঁহ, এটা মৌলিক ওটা গণতান্ত্রিক সেটা নাগরিক অধিকার। শেষে অবিশ্যি ব্যাটারা অধোবদন। এবং প্রতিষ্ঠিত: ব্যক্তিস্বাধীনতা শ্বেতাঙ্গদের দরকার, তাদের নয়, যারা এর মূল্য দিতে জানে না, শ্রেফ বেইমানির জন্য ব্যবহার করে। গামবাটের আবার অধিকার কী? আগে ওরা অধিকারের যোগ্য হয়ে উঠুক! মার শালাদের। মনে পড়ে যাচ্ছে, একদা কারা ভারত সম্পর্কে বলেছিল, এরা স্বাধীনতার যোগ্য নয়? নিতান্ত নিজেরা দেশটা চালাতে পারবে না, তাই আমরা শাসন করছি। এর’ম ছবি আর গোটা পাঁচেক হলেই ওঁয়াদের এয়ারপোর্টে নামলে প্যান্টালুন খুলিয়ে সার্চ করা হবে, নিলডাউন/নাকখতও চলতে পারে। যাদের ইউটোপিয়ায় যাওয়ার জন্য অনিবার লাল পড়ে যাচ্ছে, দ্রুত করুন, সাইরেন বাজল বলে।

১২ ডিসেম্বর, ২০০৪



ব্রেকিং দ্য ওয়েভস : সতী-ব্যভিচারিণী

জো র বা জা র = মি ডি য়ো কা র

ঋতুপর্ণ ঘোষের তুখোড় হাতে মধ্যবিত্তর নাড়ি টেপা তো বটেই, দাড়িও টেপা। মধ্যবিত্তকে টোপ দিতে যে কোনও শিল্পকে বাঁধতে হবে নিক্তি মেপে অ্যায়সা নিখুঁত তারে, যা অ্যাভারেজের চেয়ে জা-স্ট সামান্য উঁচু। অর্থাৎ, এত উঁচু নয় যে মাথার ওপর দিয়ে বেরিয়ে যাবে, এত নিচু নয় যে পেটে গোঁজা দিয়ে কাতুকুতু রচাবে। একজ্যাক্টলি ওই বিন্দুতে লাল কাঁটাটি নড়নড়ালে, সাধারণ লোক দেখে বলবে, ‘সত্যি, কী আর্ট ফিলিম! আমি বলে রক্ষে, পাবলিক বুঝলে হয়।’ আর সেনসিটিভ লোকরা: ‘আরে হাজার হোক, পরিচ্ছন্ন ছবি, যত্ন আছে, বুদ্ধির ছাপ। তা ছাড়া সত্যজিতের পর এমন সংলাপ লেখা আর যাকে-তাকে দিয়ে দারুণ অভিনয় করিয়ে নেওয়া এক জনেরই আয়ত্তে।’ এ ভাবে দু’কূল রেখে একে-এক করে পর এক ছবি হিট করিয়ে যাওয়া এক অবিশ্বাস্য ট্রাপিজ, যা ঋতুবাবু তুড়ি মেরে পারেন। তদুপরি সত্যজিতের যেমন সৌমিত্র, কুরোসাওয়ার মিসুনে, ঋতুর তেমনই ঐশ্বর্য। রূপ দেখতেই দু’সপ্তা হাউসফুল। অভীক মুখোপাধ্যায়ের তুলনাতীক্ষণ ফোটোগ্রাফির কথা আর কত বলব। মোট কথা ‘রেনকোট’ও লোকে দিব্যি দেখবে, এবং ঋতুপর্ণের গত তিন-চারটে ছবির মতোই, এ-ও নিতান্ত পাতি, দেখনশোভা, ভেতর-চনচনে, না-করলেই-চলত টাইপ ছবি। মাঝে মাঝে অবশ্যই গলাগা কাছটা ব্যথা করে, ও হেনরি-র নিপুণ অভিঘাত নিয়ে ছবি শেষ হওয়ার পর পুটুস পুটুস করে ক’ফোঁটা অশ্রুও অপ্রতুল নয়, কিন্তু মেঘলা বিকেলে বন্ধ ঘরে প্রাক্তন প্রেমের আবহ যদি স্রেফ পাত্র-পাত্রীর আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে মিথ্যাভাষণে তাবৎ জটিলতার সম্ভাবনা নিঃশেষ করে দেয়, সে তারল্যে বড় ক্লান্তি ঘটে। আফটার অল এ বিশ্বে নারী-পুরুষ লয়ে বার্গম্যান ছবি করেছেন। উডি অ্যালেনও। ‘বিরাত কিছু না বলতেই পারি’ পোজিশন নিলেও নিদেন পুং-স্ত্রীর মৌলিক থরথরানি তো চারিয়ে দিতে হবে। প্রাচীন পেন্টিং, ঘষা কাচের আড়ালে নায়িকার গুনগুন আর অসম্ভব বোকা বোকা ফ্ল্যাশব্যাক, এই হল একরৈখিক ছবির ডেলিকেট কাণ্ড। ডেকরেটরের ফরাসের মতো দীন, ফ্ল্যাট। একটা ঘর ও দীর্ঘ সময় তো এক অবিরত অপারেশন থিয়েটার, এখানে পুরুষ ও নারীকে চড়া ক্ষমাহীন আলো ফেলে নিষ্ঠুর ব্যবচ্ছেদের তুমুল সম্ভাবনা কেউ ছাড়ে? যেখানে ছবির শেষে শিরা লাল জড়ুল ফুসফুসের স্ফীতি সব উন্টেপাল্টে পড়ে থাকবে? কী তীব্র আরক সম্ভব ছিল! তা নয়, এ বানিয়ে বলে, ‘জানো তো, আমি এখন সিরিয়াল প্রোডিউস করি’, ও বলে, ‘জানো তো, আমার স্বামী টুরে যায়’। ব্যস ও-ই: সখী-সখী আন্তরণখেলা। বাংলায় আর যাঁরা এখন ছবি করেন, তাঁদের কাছে আদৌ আশা করার কিছু নেই, কিন্তু একমাত্র শক্তিমান শিল্পীটি যদি মিডিয়োক্রিটির কাছে বলিপ্রদত্ত হন, গ্যাদাড়ে বেবিফুড উৎপাদনের মিশন নেন, দুঃখের। রাজনৈতিক গোষ্ঠীতে শুনেছি উজ্জ্বল মানুষরা নিজেদের ছোট, সরু, বেঁটে করে নেন,

যাতে তাঁদের দীপ্তিতে খামখা সমষ্টির প্রতিজ্ঞা আড়াল না হয়। কিন্তু সিনেমায় নিজ প্রতিভা বনসাই করে, প্রবল ক্ষমতা সত্ত্বেও বিচ্ছিন্ন খেলো স্ক্রিপ্ট লিখে, এটু রবীন্দ্রনাথ এটু মা দুর্গা এটু নাকী কান্না মিশিয়ে এস্তার খ্যাতির হাজার স্কোঃ ফুঃ বানিয়ে মিডিয়োকোর হব মিডিয়োকোর হব বলে আসিতেছি চলে, কেমন অবিশ্বাস্য ঠেকে। অবশ্য নির্বোধ মেজরিটিকে আনন্দ দেওয়ার জন্য শিল্পীর আত্মোৎসর্গ লক্ষণীয়। হয়তো ইতিহাসের চ্যাপটার হবে।



‘দ্য ইনক্রেডিবলস’ অ্যানিমেশন ছবিটি সুপারহিরোদের নিয়ে। তাঁরা অলৌকিক শক্তিমান, কারওর গায়ের জোর একশো হাতির সমান, কারও ইলাস্টিক-দেহবল্লরী। নাগাড়ে তাঁরা মানুষকে আত্মহত্যা থেকে, ব্যাঙ্ক-কে ডাকাতি থেকে, ট্রেনকে বেলাইন হওয়া থেকে বাঁচিয়ে চলেছেন, হঠাৎ বিরুদ্ধে এস্তার মামলা। যেমন সুইসাইডেচ্ছুর রাগ, সে যখন একশো তলার ওপর থেকে লাফিয়েছিল, শূন্যে জাপ্টে বাঁচালেন বটে মিস্টার ইনক্রেডিবল, কিন্তু কাঁধের হাড় সরে গেছে। গুচ্ছ আন্দোলন: ‘গো সেভ ইউরসেল্ফ’, আমাদের জীবনে নাক গলাতে হবে না তো বাপু, বরং নড়তেচড়তে দেওয়াল ভাঙছ বাড়ি খেঁতো করছ, ড্যামেজ ভরবে কে? সামলে সাধারণ হও, স্বাভাবিক, দুর্বল। শেষে রাষ্ট্রের তরফ থেকে সুপারদের বারোয়ারি বামনীকরণ, মিস্টার ইনক্রেডিবলকে হতে হয় ইনসিয়োরেন্স কোম্পানির দশটা-পাঁচটার কর্মী। এবং কড়ার: কখনও যেন কোনও সুপার-পাওয়ার না দেখা যায়। দাঁতে দাঁত চেপে মুঠি পাকিয়ে নিজেকে ধরে রাখতে হয়, অবিশ্বাস্য শক্তি, তবু প্রয়োগ চলবে না, মানুষ মার খাচ্ছে, কাঁপিয়ে ঘুঁষি মারা চলবে না, নর্মাল হয়ে, নির্বিবাদী পাবলিক হয়ে বাঁচতে হবে। সুপার-হিরোইনের সঙ্গেই বিয়ে হয়েছে নায়কের, সন্তানরাও জিনসূত্রে সুপার। ছেলেটি দৌড়য় বিদ্যুতের চেয়ে দ্রুত, তাকে স্পোর্টসে নামতে দেয় না বাবা-মা। কারণ তা হলে তো সবাই বুঝে যাবে, সে সুপিরিয়র, ‘আমি তোমাদেরই লোক’ সিনড্রোম বিচ্ছুরিত হবে না। মেয়েটিরও পেছায় ক্ষমতা, সে খাওয়ার টেবিলে কাঁদে। নর্মাল হবে। নইলে ছেলেরা প্রেমে পড়ছে না। চার পাশের ফুলে ফুঁসে ফেঁপে ওঠা মিডিয়োক্রিটির গদগদে পিণ্ডের কাছে প্রতিভার বাধ্যতামূলক নতজানু হওয়ার গল্প, এই ছবি। নায়ক এক সময় আর না পেরে চেষ্টা করে ওঠেন, ‘এই মিডিয়োক্রিটির উদযাপন আর সইছে না!’ ছোট ছেলেটি বলে, ‘আমি স্পেশাল, সেটা আমার দোষ?’ মা বোঝায়, ‘সোনা, সকলেই তার মতো করে স্পেশাল।’ ছেলে বলে, ‘যার মানে হল, কেউই স্পেশাল না।’ ভিলেন যে, সুপারহিরো হতে চেয়েছিল। কিন্তু অলৌকিক ক্ষমতা নেই। তাই চায় আশ্চর্য যন্ত্র আবিষ্কার করে উড়তে, ছুটতে, সেরা হতে। মিস্টার ইনক্রেডিবল তাকে ষোড়ান, কৃত্রিম উপায়ে প্রতিভার ছদ্মবেশ ধরা যায় না। তাই সে ঠিক করে, সব সুপারদের খুঁজে খুঁজে মারবে, যাতে কেউ ‘অন্য, আলাদা, বিশেষ’ না থাকে। মাঝারিয়ানার স্বর্গ আমেরিকায় দাঁড়িয়ে এই ছবি! ‘ফরেস্ট গাম্প’ ভাবুন। মার্কিন মত হল, গামবাটও চ্যাম্পিয়ন হতে পারে, যদি অমানুষিক শ্রম, অধ্যবসায় থাকে। ‘দ্য ইনক্রেডিবলস’ উন্টে

প্রতিভার অনতিক্রম্য শ্রেয়তার কথা বলে। ঝলমলে অ-সাম্যের কথা বলে। হাঁদার কোনও দিনই ট্যালেন্টকে খর্ব করার অধিকার নেই এবং সেন্সর-সইসাবুদ-সংখ্যাবাজি, সহস্র শলাকা দিয়েও এই সমীচীন জাতিভেদ তোলা যাবে না: সাফ ঘোষণায় ‘কান্টঅব দ্য কমন ম্যান’কে দাবড়ে ভুবন দেখিয়ে দেয়। ইদানীং যে মূর্খতার গণতন্ত্র চলেছে, শিল্পীর কলার ধরে জন্মগাড়লও হাঁকছে, ‘আ বে, আমি তো গানটা বুঝলুম না, তার মানে তুই লিখতে জানিস না’, উদ্ধত গবেট ভাবছে গাঁটের কড়ি খরচা করে কনজিউমাছে বলে কবি-চিত্রকর তার কাছে জবাবদিহিতে দায়বদ্ধ, ফুলো পার্সের আমোদগেঁড়েটি প্রগাঢ় বাইসেপ ও কড়াইশুঁটি-ব্রেন নিয়ে হাঁক দিচ্ছে: অশিক্ষা আমার জন্মগত অধিকার, রোল কল শুনে একে একে এসে উষ্মীষ খুলে রেখে যাও সুপিরিয়রগণ, দলে ভিড়ে যাওয়ার মুচলেকা সহ, নইলে পুঁতে দেব, আমরা মেজরিটি— এই ‘টার্মিনাল নর্মালিটি’ অসুখটিকে শেলবিদ্ধ করতেই এ অ্যানিমেশন-প্রতিবাদ। জোরে মনে রাখুন রবার্ট গ্রিন ইংগারসল-এর কথা, ‘ইন দ্য রিপাবলিক অব মিডিয়োক্রিটি, জিনিয়াস ইজ ডেঞ্জারাস’। গোটা গ্রহে মধ্যমেধার আগ্রাসন, এদের দৌরাত্ম্য এ যুগের সবচেয়ে বড় এপিডেমিক। এড্‌সের বাবা। এদের বিষকামড়ের ভয়ে প্রতিভাকে মাথা নিচু করে সটকে যেতে হয়, পাছে লোকে আঁতেল বলে বিছুটি মারে, কাফকা গিলে নিয়ে বচনালোচনা করতে হয়, নইলে খেলতে নেবে না। শয্যা শূন্য থাকবে। অতএব ছাঁচা অনুযায়ী খাঁচা বদলানো। সমান হও, সড়াং নিচুস্তরে নেমে এসো, চিন্তা বর্জন করলেই অধিকার অর্জন। এ সাম্যবাদী হাওয়ায় পাবলিকের পছন্দসই ফোকলা শিল্প বানিয়ে অটোগ্রাফ বিলোবার আরাম, আর তার বিরুদ্ধে গেলে বুকের পাঁজর জ্বালিয়ে একলা হওয়ার হাড়হিম ভয়: দোটানায় মানুষ কী বাছবে? ইনক্রেডিব্ল হয়েও করতে হবে বিমার দালালি, মুখ মচকে চেপেচুপে রাখতে হবে জ্ঞান, যেন তা উদগত মল! পিকনিকবাজ ট্রিভিয়া-উৎসব ফাটিয়ে ‘হ্যাঁ, পড়েছি শুনেছি, ক্ষমতা আছে এবং তার জন্য মাইরি বলছি লজ্জিত নয়’ বলতে শেখাল ‘বাচ্চাদের’ অ্যানিমেশন-ছবি।

৯ জানুয়ারি, ২০০৫



দ্য ইনক্রেডিব্লস : ঝলমলে অ-সাম্যের গল্প

পুল সে পুশ - ত ক

রেডিয়ো মিচি কিন্তু বাপু মনোহর সাজায়েছে কলকেতা-ট্রাম, হলে বা ব্যাটা জীবনানন্দ-ঘাতক, এবে গা-ময় সাদা-কালো ফোটোগ্রাফে যে দিকে চোখ যায় গ্ল্যামার ও নস্টালজিয়া-চুপচুপ: 'মৃগয়া' ছবিতে মিঠুনকে নির্দেশ দিচ্ছেন মৃণাল সেন, ১৯৭৩-এ ফিদেল কাস্ত্রো কলকাতায় এসেছেন, সামনে জ্যোতি বসু দাঁড়িয়ে, মোহনবাগানের সঙ্গে ম্যাচে বল নিয়ে এগোচ্ছেন পেলে, ১৯৭৪-এ উত্তমের ছবিতে ক্ল্যাপস্টিক দিচ্ছেন সৌমিত্র, ইডেন গার্ডেনে চ্যারিটি ম্যাচ খেলতে এসেছেন বচন, সি পি এম পার্টি জন্মাচ্ছে... সব ছবির সঙ্গে লেখা: লিসনিং টু ইওর সোল, কলকাতা। সত্যি, অফিসটাইমে নিত্য যাতায়াতে সোলের সোল ক্ষয়ে গেল যাঁদের, এটু নগরস্মরণ মন্দ না। অবশ্য হেভিডোজ পিনিক নিয়ে ঘাড়ে তো পড়েছেই বইমেলা, কী প্রেসার রে ভাই! না গেলেই অ্যা মা টিকটিকি, তোর গায়ে আনকালচরের গন্ধ! অগত্যা সারে সারে ছকবাজ ছোকরার গিটার কোলে গ্যাঙরগ্যাঙ পেরিয়ে, চালে নাম লেখার হুড়োহুড়ি এড়িয়ে, বিদেশি স্টলগুলোয় মেমসাহেব টেরিয়ে, তার পর ফ্রান্সের প্যাভিলিয়ন দেখে 'দ্যাখো খুড়ি, অতিকায় প্লাস্টিকের বুড়ি!' বললেই গাঁট্রা। ওই স্বচ্ছ অর্ধবৃত্তটি ল্যুভ্র-এর প্রবেশপথ-ডোম-এর অনুরূপ, এবং বইমেলার গোটা ইতিহাসে একমাত্র 'স্ট্রাকচার', যা সংরক্ষিত হবে। আধুনিক শিল্পপ্রদর্শনীর স্থায়ী মণ্ডপ করা হচ্ছে এটিকে। ডিজাইনার মনীশ চক্রবর্তীকে তালিয়াঁ। তবে সেরা প্যাভাল বাগিয়েছেন দেব সাহিত্য কুটীর, এক পাশে বিশাল করে বাঁটুলের একটি কমিক্স পুরোটা আঁকা, সব্বাই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাঁ করে পড়ছেন-হাসছেন আর নিশ্চিত ভাবছেন টুলটুলে ছোটবেলার কথা, যখন চমস্কিপনা এসে জীবন হুতুমথুমো করে দেয়নি। বাহবা পাবেন 'পথের পাঁচালী' সংগঠন, যাঁদের স্টল আস্ত এক-কামরার ট্রেন, বিশাল স্টিম-ইঞ্জিনের মাথা দিয়ে হিসহিস করে সত্যি বাষ্প বেরোচ্ছে! এবং অবশ্যই, চতুর্দিকে থকথক করছে কুইজ কনটেস্ট। এই যে শুনছেন, গান্ধীজি অনশনের দিন কী খেতেন? পারলে অ্যান্ডবড সাবান। হল না? তা হলে শিম্পাঞ্জির ন্যাজ দিয়ে কী তৈরি হয়? আপনার পানে কিন্তুক চেয়ে আছে কফি-কাপ। অশিক্ষায় টম্বুর জাতের এই হল আসলি সংস্কৃতি। লোক টানার জন্যে ঘন্টায় ঘন্টায় ছিঁচকে প্রশ্ন আর খুচরো প্রাইজ, সঙ্গে টিভি চ্যানেলগুলোর নির্বোধ ও নিঘিনে সঙ্গত, এ চিটচিটে অশালীনতাই আমাদের আসল কলচর চিহ্নিত করে। যদি কাউকে বই দেখাতে খুড়োর কলের গোড়ায় পেরাইজ লটকাতে হয়, তবে বইমেলায় সে লোকটাকে না-দেখা ভাল ছিল তো বইয়ের পক্ষেও। স্টলের বারান্দায় ইন্দ্রনীল সেন গান গাইলেন আর অরিন্দম শীল অটোগ্রাফ বিলোলেন আর সাড়ে তিন লাখ বোদা ক্রাউড গজাল, এতে

বইয়ের কোন বাপ পিতেমো'র পিণ্ডিটি হল কে জানে। তবে রুক জানা নেহি, এ বার 'সিগাল' নেই 'ফুরিজ' আছে, অতএব জিন্দাবাদ।



এ এক্স এন-এ দেখানো হল মার্কিন দেশে নিষিদ্ধ বিজ্ঞাপনের সিরিজ। একটি পুরুষ উর্ধ্বাঙ্গে স্ত্রী-অন্তর্বাস বাগিয়ে বাড়িতে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, পোষা কুকুর দিব্য মমতা নিয়ে চেয়ে আছে, ভদ্রলোক ও অবস্থায় রাস্তায় বেরোতেই শহর ধাঁ ও বানচাল। স্লোগান: পোষ্যরা ভালবাসবেই, নো ম্যাটার হোয়াট। 'আরও জন্তু পুষুন'-এর অ্যাড। সমুদ্রতীরে ক্যাবলা ছোকরা ঘুরে বেড়াচ্ছে, তুমুল বিকিনি পরা তিনটি মেয়ে নিরন্তর চিমটিবাচক 'অ্যাডাম-টিজিং' করতে থাকে, শেষে তারা সমুদ্রে নামে, ননীঠোট টিপে ছেলেটাকেও ডেকে নেয়। কোমর অবধি জলে, মেয়েরা ফট করে নিম্নাঙ্গের ইয়েগুলি খুলে ফ্যালে, ছেলেটির দিকে সেগুলি ওয়েভ করে, যথাযথ খিলিখিলিসহ। ছোকরার হাত এত ক্ষণ জলের তলায় ছিল। এ বার সে ওপরে তোলে, ও কী রে, হাতে ক্যামেরা। মেয়েগুলি ফ্যাকাশে। জলের তলায় ফোটো-তোলা ক্যামেরার বিজ্ঞাপন।



আজ, যখন দুবাই-তে গ্লোবাল ইন্ডিয়ান ফিল্ম অ্যাওয়ার্ডস-এ সলমন খান-কে আনতে গাড়ি পাঠাতে ভুলে গেলেন সংগঠকরা, রাজু মুখোপাধ্যায় তাঁর বই 'ক্রিকেট ইন ইন্ডিয়া— অরিজিন অ্যান্ড হিরোজ'-এ লিখলেন খেলার জন্ম ভারতে, ক্রিকেট এ দেশেই তৈরি হয় সেই মহাভারতের আমলে, পরে পারস্য হয়ে গ্রামীণ ইংল্যান্ডে পাড়ি দেয়, রিংগো স্টারকে 'সুপারম্যান' বানিয়ে অ্যানিমেশন শুরু হল আর সে কার্টুন-চরিত্রের গলা দিলেন স্বয়ং রিংগো, আমেরিকার 'ন্যাশনাল বুক ক্রিটিক্স সার্কল' প্রাইজের জন্য বব ডিলানের আত্মজীবনী প্রথম খণ্ড হইহই করে উঠল শর্টলিস্টে, আমেরিকার 'পেরেন্টস টেলিভিশন কাউন্সিল' নালিশ করলেন এম টিভিতে প্রতি ঘণ্টায় ১৩টি যৌন দৃশ্য ও ৩২টি খিস্তি উপচে ওঠে, মেক্সিকোর লা পালমা জেল-এর সব কয়েদিরা মিলে পয়লা নম্বর দৈনিক 'রিফর্মা'য় এক পাতা জুড়ে বিজ্ঞাপন দিল অসহ বেদনা জানিয়ে, তাদের নাকি 'কুকুরের মতো' রাখা হয় কারণ গারদে ফ্ল্যাট-স্ক্রিন টিভি, মোবাইল ফোন, পিৎজা ডেলিভারি বা দেখা-করতে-আসা সঙ্গীর সঙ্গে যৌনতার ব্যবস্থা, কিচ্ছুটি নেই, অনুপম খের-এর অভিনয়-স্কুল 'অ্যাকটর প্রিপেয়ারস'-এর উদ্বোধনে বচন বললেন, অভিনয় শিখলে তাঁর কেরিয়ার আরও ভাল হতে পারত, জাপানে 'কিট ক্যাট' চকোলেটের বিক্রি অসম্ভব বেড়ে গেল ভাষাতত্ত্ব-ম্যাজিকে কারণ টিন-এজাররা মনে করল ওটা টিফিনবাক্সে রাখলেই

পরীক্ষায় পাস, আসলে জাপানি ভাষায় ‘কিটো কাটসু’ হল জনপ্রিয় পরীক্ষা-মন্তর, ওর মানে ‘প্রাণপণ চেষ্টা করব সফল হতে’, ভ্যানিটি ফেয়ার-এ ব্র্যাভোর বন্ধু লিখলেন যে মার্লন ব্রু বার ‘গডফাদার’-এ অভিনয় করতে অস্বীকার করেন কারণ ‘আমি মাফিয়াদের গ্লোরিফাই করতে চাই না’, ইংল্যান্ডের সবচেয়ে পুরনো নৃত্য সংস্থা ‘র‍্যামবার্ট’ তৈরি করল ‘কনস্ট্যান্ট স্পিড’ নামে একটি ব্যালে, যার ভিত্তি আইনস্টাইনের $E = mc^2$ সমীকরণটি, তখন এই তত্ত্ব-গন্ত থেকেই বেরোক কচালির খোশবো।



‘এক আকাশের নীচে’ শেষ হয়ে গেল, আমির খান ওই ভুঁড়ো শেয়ালের ন্যায় গোঁফ ছেঁটে ফেললেন, আর জীবনে রইল কী? ‘একদিন প্রতিদিন’ সবে শুরু হয়েছে, পেপ্লায় প্রোমোর পর প্রথম দিনই ‘পর্ব-৩’ দিয়ে তার গালা-স্টার্ট, পোস্টমডার্ন কেতা কি না ভাবতে ভাবতেই অবশ্য বিজ্ঞাপন দিয়ে ম্যানেজ করে ফের প্রথম এপিসোড চালানো হল। এখনই কিচ্ছুই বলা উচিত নয়, তবে ছবিগুলো কেমন যেন বড্ড অন্ধকার। দেখতে দেখতে ও-ঘর থেকে টর্চ আনতে হাত নিশাপিশ করে। আর বলা দরকার, আমাদের ‘ইন্ডিয়ান আইডল’-এ বিচারকদের অভদ্র ব্যবহার, দর্শকদের অকথ্য বিচার এবং অধীর সাসপেন্সের নামে অসহ ন্যাকা ধীরতা (আজ থেকে আমাদের মধ্যে যিনি থাকবেন না এক মিনিট চুপ। ভারতীয় জনতা এই রায় দিয়েছেন যে মিস্টার অমুক দু’মিনিট চুপ। তা হলে বলেই ফেলা যাক যে শেষ অবধি যিনি থেকেই গেলেন তিনি তিন মিনিট চুপ। এ কি হিচককীয় থিমবাজনা না ফুটেজ খাওয়ার গবেটগাজন?) যতই লাফাক, হারাতে পারবে না বড়দা ‘আমেরিকান আইডল’কে (স্টার ওয়ার্ল্ড-এ হয়), সেখানে গানের চেয়ে ‘পারফরম্যান্স’-এ জোর (যা শিখে বোধহয় ফারহা খান আশ্চর্য্য বোকা বোকা মন্তব্যগুলো করেন) অ্যাদ্দুর, সে দিন এক ললনা এসে গানের প্রথম কলি গাইতে গাইতে চুল খুলে ফেললেন, পরের লাইনে জামা, তার পর স্কার্ট, শেষে নিতান্ত টু-পিস পরে সঙ্গীত শেষ করা হল! একেলা ভয়েসের নহে তো গান!

৬ ফেব্রুয়ারি, ২০০৫

ম র বে ইঁ দুর বে চা রা

গাদিয়ে ঘাড়ে পড়েছে উৎসব: ফিল্মফেয়ার, অস্কার, বাজেট। ফিল্মফেয়ার অবশ্য পরের বছরেরটাও এখনই তৈরি। শ্রেষ্ঠ ফিল্ম, সেরা অভিনেতা, অভিনেত্রী, সহ-অভিনেত্রী, ক্যামেরাম্যান-এর প্রাইজ কারা পাবেন, যাঁরা 'ব্ল্যাক' দেখেছেন তাঁরাই জানেন। চিন্তনীয়: প্রথর ঝাড়লণ্ঠনবাজ কমার্শিয়াল পরিচালক, ঢোলবাদ্যি আর শাড়ির প্যাঁচের দেখনদারিতে বাজিমাত যাঁর নিত্য অভ্যাস, তিনি বিশাল-বাজেট 'বাজিরাও মস্তানি' করার আগে নিতান্ত একটি ছোট সা ব্রেক নিয়ে যদি এমন অবিশ্বাস্য ছবি তৈরি করে ফেলতে পারেন, যাঁরা শ্রেফ আর্ট ফিলিমের ঘাটে গভোলা ভিড়িয়ে উচ্চনাসা ফলাচ্ছেন তাঁদের ইগো টলমলায়মান কি না। ব্ল্যাক-এর বিরুদ্ধে খুচখাচ অভিযোগ যা হচ্ছে প্রায় সবই কষ্টকল্পিত/ হাস্যকর। কেউ আবার আঙুল উঁচিয়ে বলছেন: মেলোড্রামা। লাও ঠেলা। ঋত্বিক ঘটক করলে সেটা 'মেলোড্রামা ইউজ করা' আর বনশালি করলে গ্রাম্যতা? মানুষের দুঃখ দেখিয়ে মানুষকে অঝোরে কাঁদানো শিল্পের প্রাচীন প্র্যাকটিস। লজ্জা পাবেন না আঁতেলগণ, রুমাল নিয়ে যান। ফিল্মফেয়ার অ্যাওয়ার্ডস-এর স্ক্রিপ্ট এখন পেলায় পরিণত, সইফ আলি খান-এর ঝলমলে ডানপিটেমিতে ভর দিয়ে মধুর ভাঙারকর থেকে রানি এলিজাবেথ, হক্কলের কাছা ধরতঃ নিরন্তর টানাটানি। এ রসিকতার মোচ্ছব যেখান থেকে আহত, সে আমেরিকাবাবাজি কিন্তু গত বছরের এক অনুষ্ঠানে জ্যানেট জ্যাকসন নাচতে-গাইতে সহসা এক স্তন অনাবৃত করার পর থেকেই সমূহ সম্ভ্রস্ত ও সমূলে সেন্সরবিদ্ধ (একাধিক উন্মোচনে কী ঘটত ভাবতেও গলা শুকোয়)। এখন ভয়ে-ডরে অস্কার অনুষ্ঠানও 'লাইভ' টেলিকাস্ট করা হচ্ছে সাত সেকেন্ড দেরি-তে (ফের এক পোস্টমডার্ন প্যারাদক্স ধারণা: 'ডিলেড লাইভ'), যাতে কেউ আচম্বিতে অসৈরন কাণ্ডাকাণ্ড বা অশালীন রসিকতা বাধালে, ঝটিতি কেটে বাদ দেওয়া যায়। কোন তীব্র মহাপুরুষ যে ওই সময়টুকুর মধ্যে ধাঁ-নির্ধারণ করে ফেলবেন কোনটা ডার্টি আর কোনটা চলেব্ল, কে জানে! প্রতিবাদে প্রখ্যাত অভিনেতা রবিন উইলিয়ামস অবশ্য অস্কারের স্টেজে এলেন মুখে সাদা 'টেপ' এঁটে, কিন্তু বাকি কেউ নট নড়ন-চড়ন। আমাদের এখানেও তো টেলিভিশনে সেন্সর লাগু হল বলে। আর যৌনতার নামে এক বার হাতকড়া চালু হয়ে গেলে অচিরেই তা প্রধানমন্ত্রীকে ব্যঙ্গ করার অপরাধেও চেপে বসবে, সহজ সন্দেহ। এ বাজারে পাকিস্তানি মেয়েকে কেউ আবার ভুল করে চুমু খেয়ে বসবেন না, মানে রূপোলি পর্দার কথা বলছি। ফতোয়া দেওয়ার কনটেন্ট শুরু হয়ে যাবে। সম্ভাব্য বয়ান: মহেশ ভট্টের 'নজর' ছবিতে চুম্বনের জন্য পাকিস্তানি মহিলা মীরা ও ভারতীয় পুরুষ অস্মিত প্যাটেলকে আপনি কী ভাবে খুন করতে চান? এস এম এস করুন অমুক নম্বরে, 'গর্দান কেটে' হলে 'অপশন এ', কুপিয়ে: বি, গায়ে

লালপিঁপড়ে ছেড়ে: সি। কনটেস্ট ও ওপিনিয়ন
পোল-এর হিড়িক কাছাকাছি চলে গেছে ইতিমধ্যেই। ‘সাঁস
ভি...’র বৃদ্ধা ‘বা’ মারা যাবেন অমুক এপিসোডে, আপনার মতে
তা ভাল না খারাপ? আরও: সিনে-অভিনেত্রীদের মধ্যে সর্বাধিক
সুন্দর নিতম্ব কার? (‘জুম’ চ্যানেলে নিয়মিত ঘোষণা
চলছে)।

আর হ্যাঁ, এ ব্যাপারটা প্রকাণ্ড হাঁ-কারক, সিরিয়ালের
সর্বসাংঘাতিক টুইস্টগুলো (যথা: বা-র মৃত্যু) এখন ঘোষণা করে
দেওয়া হচ্ছে মাসখানেক আগে থেকে! তুলসী মা হয়ে ছেলেকে
খুন করবে, এ তো চরমতম সাসপেন্স, যা দর্শককে আগের মুহূর্ত
অবধি আন্দাজ না করতে দেওয়ার মধ্যেই রুদ্ধশ্বাস সিরিয়ালের
সার্থকতা? হা, জমানা টোটাল চেঞ্জুরা। ও ঘনঘটার দু’সপ্তাহ
আগেই কাগজেকাগজে ছ’কলাম ইন্টারভিউ: অংশ-বাবু, মরতে
কেমন লাগল? কোমল তলপেটে ক’টা গুলি? নির্ধারিত সন্ধ্যায়
লোকে শীঘ্র ডিনার সেরে দেখতে বসবে, ‘আজকে রাতে মরবে
ইঁদুর বেচারী’। অর্থাৎ, পুরাণটি পারফেক্ট উলট। সবচেয়ে
প্যাঁচালো কাহিনি-মোচড় ফাঁস না করে দেওয়ার জন্য ‘সাইকো’র
আগে হিচকক বিজ্ঞপ্তি দিতেন, আর এখন পেট-পাতলা বলে-
দেওয়াটাই সেরা প্রোমো। পরিবর্তিত ব্যাকরণে আস্তিন থেকে
সিরিয়ালের তুরূপ উঁকি মারবে বহুত আগাম, তাতে দর্শকের
মজা অনেকাংশে গাপ করে দেব বটে, কিন্তু ওটাকে মার্কেটিং
বাগিয়ে এমন মেগা-ইভেন্ট করে



বাঁয়ে জ্যানিট জ্যাকসন। এই ফাংশনেই ‘ম্যালফাংশন’, অস্কার অবধি গড়াল সেন্সর

তুলব, ওই এপিসোডে স্পনসরদের কাছ থেকে ন'গুণ বেশি খাজনা। অভিনেতা-অভিনেত্রীরাও আসন্ন ও নিশ্চিত মৃত্যুর গ্ল্যামারে টুবটুবে ও অধিক স্টার, অন্য সিরিয়ালের লোভনীয় চুক্তি কোল জুড়ে। অবশ্য পণ্ডিতরা বলবেন আপত্তি কী, এ ঘনঘটা আবার এক অন্য রকম 'দেখা' সূচিত করবে, আপনি তো সতেরো দিন ধরে অংশ বা বা-কে দেখছেন দণ্ডিত হিসেবে, উহাদের নিয়তি আপনি সম্যক জানেন: বেচারাদের আয়ু একজ্যাক্টলি আর কত ঘণ্টা, চরিত্রগুলো এ দিকে তা আদৌ না জেনে তেড়ে জীবনবাচক কাণ্ড করে চলেছে, আশ্রয় ভাবী-লাভ হাঁকড়ে ডিবেঞ্চার কিনছে হয়তো! এ ভাবে একতা কপুর আপনাকে ঈশ্বর-ঈশ্বর খেলার একটা চাস দিলেন!

যাক গে, যে কথা হচ্ছিল, নিতম্ব। ভাইটালস্ট্যাটের জোরে শুধু ক্রিকেট কমেড্রিতে নয়, এখন সৈঁধিয়ে যাওয়া যাচ্ছে বাজেট বিশ্লেষণেও, এম টিভি এবং সি এন বি সি আয়োজিত বাজেট-বিচারের আসরে শিল্পপতি, বাজার-বিশারদদের সঙ্গে হাজির ছিলেন বডিবিলাসী মল্লিকা শেরাওয়াত। ভারী গভীর ও অভিনব কথা বলেছেন: 'সকলের জন্য শিক্ষা চাই, মেয়েদের জন্য বিশেষত'। সঙ্গী এক্সপার্ট ছিলেন হ্যান্ডসাম জায়েদ খান। সন্কেবেলা সানগ্লাস পরনে। তা হলে এ বার থেকে নোবেল পেতে হলে পড়াপুস্তকের পাশাপাশি প্লাস্টিক সার্জারি মজুত রাখুন।

আর হ্যাঁ, অস্কারের কথায় মনে হল, সোনাগাছির ছেলেমেয়েদের নিয়ে তোলা তথ্যচিত্র পুরস্কার পেয়েছে বলে নাকি সোনাগাছি উন্নয়নে উক্ত সিনেমা-করিয়েদের পেলায় দায় অনুভূত হওয়া উচিত, রেটে গোঁসা চলছে। ন্যাকামি! মরুভূমি নিয়ে ছবি করে প্রাইজ পেলে উটদের পাত পেড়ে খাওয়াতে হবে না কি? শিল্পের অন্যতম 'উপকরণ' ছাড়া এক জন অভিনেতা আর কিছুই নয়। তাও কাহিনিচিত্রে মিনমিনে আর্গুমেন্ট চলতে পারে, তথ্যচিত্রে পাত্র/পাত্রীর অবদান আরও কম। পাতি বাস্তবকে কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহার করে যখন ছবি নির্মাণ করা হয়, পুরো বাহাদুরিটাই পরিচালকের। সত্যজিতের ডকুমেন্টারি 'রবীন্দ্রনাথ' যত বার প্রাইজ পাবে ট্রেন ধরে গিয়ে বিশ্বভারতীকে ভাগ দিয়ে আসতে হবে না কি?

টাকার কথায় মনে পড়ল, আমাগো টিভি-মানসে শেয়ার কেনাবেচা এখন আর জুয়ার মেজোভাই নয়, প্রায় সব বাংলা চ্যানেল শেয়ার বাজার নিয়ে পৃথক অনুষ্ঠান দেখাচ্ছে রোজ। সঙ্গে বাজেটকেও সোজা ভাষায় গোলা মাথায় ঢুকিয়ে দেওয়ার প্রশংসনীয় চেষ্টাপত্তর। নামের দিক থেকে অবশ্য সেরা এ টি এন কলকাতা: 'যুক্তি তক্কো শেয়ারের গল্পো'। এ ভাবে বঙ্গহাটে 'ফোন-ইন ফেং-শুই' বা গাঁদামালা জড়ানো উদ্বাহ নেতরত জ্যোতিষী, যিনি মাঝে মাঝে নাক টেনে টেনে কান্নার অ্যাক্টিং করে 'গোবিন্দ গোওবিন্দোও বল' বলে মহাপুরুষ বনার চেষ্টা করেন বা হাতের উন্টোপিঠে প্লাস্টিকের জ্যালজ্যালে ত্রিশূল সঁটে যে সাধবী হাঁকেন, 'ছেলেমেয়ের তো উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা সামনে, ওদের আজকের এপিসোড দেখার দরকার নেই, তবে শেষ দিকে এক বার টিভির সামনে আনবেন, আশীর্বাদ করে দেব', তাদের পাশাপাশি সুট-টাই ফিটফাট 'ইনফোসিস আজ কিনলে কবে বেচব' দিব্যি বিবিধের মাঝে দ্যাখো টি আর পি মহান।

হ ও হে ডেঞ্জারসিক

বাবলি নামের মেয়েদের তো হয়ে গেল। লোফার-চুড়ামণিরা ‘ওয় বাবলি ওয় ওয় বাবলি’ এমনকী প্রোপোজধর্মী ‘বি মাই লাভার বাবলি’ আওয়াজ প্রদানান্তে শুদ্ধশিশু মুখ করে ‘আপনাকে তো কিছু বলিনি দিদিমুণি, পেপসি-গীতি গাইছিলাম’ বললে একগাল মাছি ও অন্য গালে ক্রোধ চিবিয়ে সরে পড়া। অ্যাডটা বহু কারণে সাংঘাতিক। নাভি থেকে সুরেলা ‘ওয়াও’ নির্গত হওয়ার চিত্রকল্প মহাকাব্যেও নেই, উপরন্তু দর্শককে রঙচঙে বিকিনি-নারীদের অন্য কিছু না দেখে স্রেফ নাভি দেখতে বাধ্য করা: টপ-কেতা। এবং কী তীর ভয়াল: এক জন বার্গার গান গাইছিল, হেনকালে তার মুড়ু চিবিয়ে খেয়ে ফেলে সে গান লুপ্ত করা হল! এমত সহস্য নিষ্ঠুরতা ডিসকভারি-চ্যানেল ছাড়া কোথাও কেউ দেখেছে! বার্গার বেচারাটি র্যাপ বেঁধেছিল, এ বার মেগাস্টারের দেখেশুনে যদি গোঁড়া বাঙালি মধ্যবিত্তগণ জীবনমুখী-গায়কদের প্রতি উক্ত আচরণ প্র্যাকটিস করেন, কতগুলি পনিটেল-সমৃদ্ধ মুণ্ড কচাৎ হবে! অ্যাড-শেষে ফের সারপ্রাইজ: একটা আখান্সা অলপ্পেয়ে বাড়ি শাহরুখকে গিলে ফ্যালে! বোঝো। আমাদের সুপার-তারকা কি এ ভাবে জীবিতে ও মৃতে অতর্কিতে গলাধঃকরণীয়? কে জানে কী করিতেছে এ সব পানীয়। রাইভ্যাল কোকাকোলা তো আবার আমির খান-কে মেয়ে সাজিয়ে ছেড়েছে: ‘মানো ভাবী’। অবশ্য ওই বিজ্ঞাপনেই আমির এক এন-আর-আই যুবকের রোলেও আছেন। সত্যি, কত ভাগ্যে একটা দেশ এমন স্টার পায়, যিনি জঙ্গলের মতো গোঁফ রাখলেও উইশ্বা আবার আলুলায়িত বউদি সাজলেও ইল্লি। অ্যাডটা প্রচারের আগেই দেখিয়ে দিল ‘জুম’ চ্যানেল, আমির-এর ছোট্ট সাক্ষাৎকারে। ব্যাপার সুবিধের নয়। ভাঁড়ামোভিত্তিক। অবশ্য তাতে কিছু এসে যায় না, কারণ বারে বারে প্রচারিত হলেই বিজ্ঞাপন হিট। আপনি চান, না-চান, লাইন বাই লাইন সত্তায় খচিত। (অচেতনে ‘ওয়াশিং পাউডার’ বলে দেখুন, জিভ যদি না অবধারিত ও সড়াৎ ‘নিরমা’ বের করেছে)!



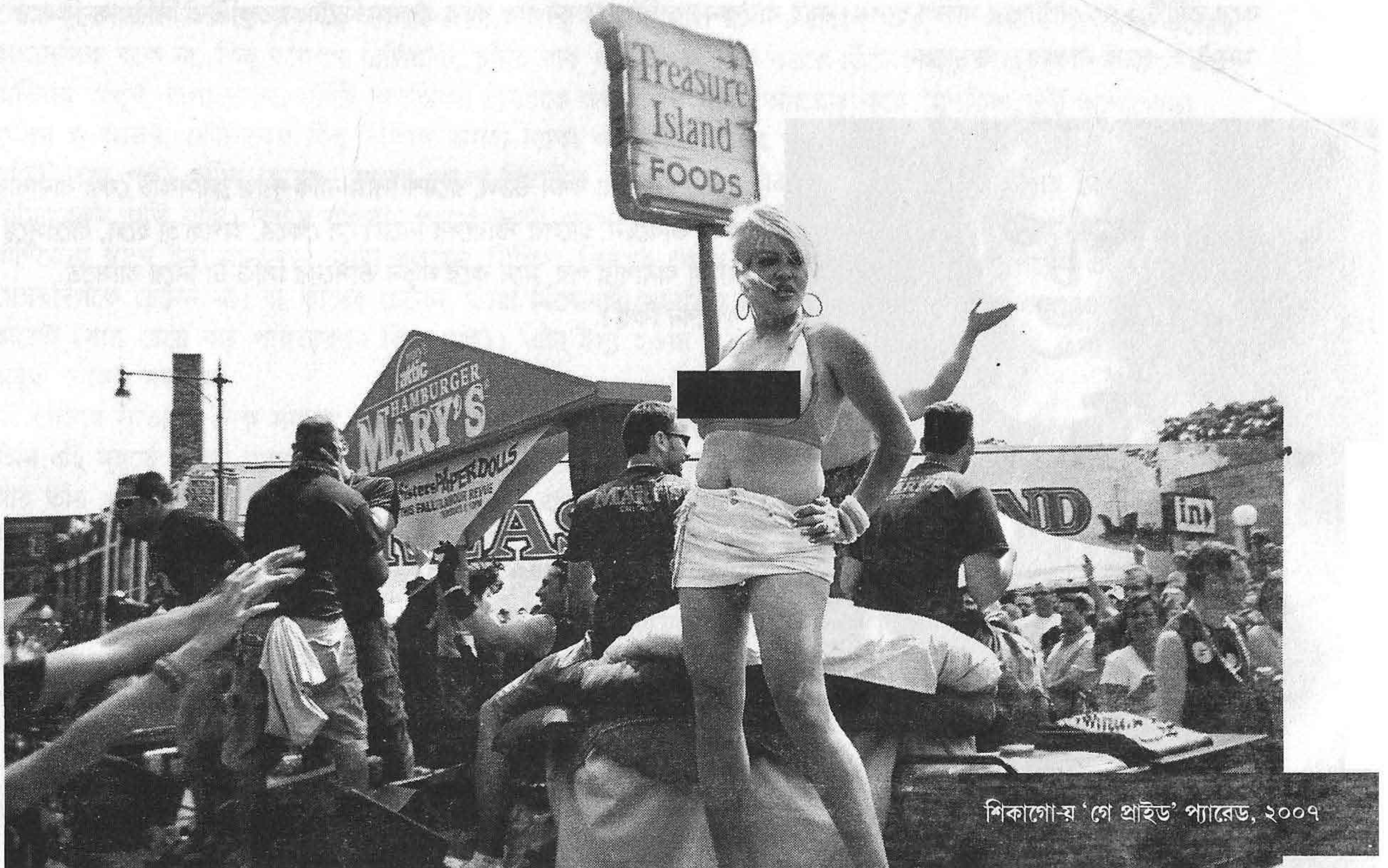
‘জুম’-এর কথা যখন এসেই গেল, কালীমন্দিরের পাশ দিয়ে যাওয়া কেরানির মতো পেন্নাম-সিরিজ ঠুকে নেওয়া যাক। স্মৃতির দিকে ‘ডেঞ্জারাস’ নামে অনুষ্ঠান, সেক্স-বিষয়ক। ফোন-ইন, লোকেরা প্রশ্ন করেন, উত্তর দেন কমল সিধু ও সমীর কোছার। উরে মা, কী অনির্বচনীয় ফ্র্যাংকতা! অকপটে তাবৎ আলোচনা, প্রেমিকার ‘ভরা বুক না বুকভরা ভালবাসা’ পুরুষ-ডিলেমা কেবল নয়, নারী-চিত্তে বয়স্ক্রেডের পুরুষাঙ্গের দৈর্ঘ্য নিয়ে খুঁতখুঁতানিও ঝাড়া ও ঝাপ্টা

ঘোষিত! সপ্রতিভ নিঃসঙ্কোচ মুচমুচে উত্তর। ভাবা যায়, ভারতে যৌনতা নিয়ে একটা প্রোগ্রাম হচ্ছে, যেখানে ভগামি-ন্যাকামি-পাকামি দিয়ে সত্যিকে ঢেকে + সমস্যাগুলোকে অপরাধবোধ দিয়ে সাঁতলে, দু'নৌকোয়-পা ট্রাপিজখেলা হচ্ছে না! পুরো জিনিসটার মধ্যে কোথাও 'লজ্জা' নেই, 'আনন্দ' আর 'সমঝদার সহমর্মিতা' আছে। মহিলা বলছেন, 'স্বামীর সঙ্গে মিলনে অর্গ্যাজম কিছুতেই হয় না, কী করব', পুরুষ বলছেন, 'ফোরপ্লে ভাল্লাগে না, কিন্তু বান্ধবী খুব চাইছে', আমাদের ভাষায় আমাদের সহ-নাগরিকরা এগুলো উচ্চারণ করছেন, আর উত্তর দেওয়া হচ্ছে চোখ পিটপিট না-করে: সেক্স-এডুকেশন চালু করতে 'জীবনশৈলী' গোছের ঘুরিয়ে ইয়ে দেখানো চৌবাচ্চায় এ কাণ্ড ঘটছে তো প্রতি রাতে! দাদারা, প্লিজ এ প্রসঙ্গে আগের 'তারা' চ্যানেলের 'ফুল্লি ফাটাফাটি ফ্যান্টাসি' অনুষ্ঠানের কথা তুলবেন না। দু'জন আপাদমস্তক অশিক্ষিত মহিলা-অ্যাংকর, যাঁরা বাংলা বলেন ইংরিজি উচ্চারণে আর ইংরিজি বলেন নাকে কেঁদে, পৃথিবীতে কোনও সঠিক শব্দ চয়ন বা বাক্য গঠন যাঁদের সাধ্যাতীত, গোটা সময়টা গবেট-কাম-রক্ষণশীল ক্লিশে আওড়ে যাওয়া অথচ সঙ্গে সুড়সুড়িঙ্গাপক মিউজিক ভিডিয়ো দেখানো যাঁদের কাজ, তাঁদের সঙ্গে এই অবিশ্বাস্য স্মার্ট বাক্যকে সিধু-সমীর যুগলের তুলনাই চলে না। ডেঞ্জারাস-এ ভিডিয়ো দেখানোর স্পিরিট হল: যৌন আনন্দ পাবেন, তাই দেখুন। প্রতি এপিসোডের বেশ কিছু ভাগ আছে, বাছাই 'সেক্স গেম' বিজ্ঞাপিত হয় (হ্যাঁ, সেক্স একটা দারুণ মজাদার খেলা, মানুষ একত্বা সহায়ক-ক্রীড়া উদ্ভাবন করেছে, স্ট্রবেরি ফ্লেভার বডি পেন্ট থেকে 'বিংগো' বোর্ড-গেম তক), 'ওয়ার্ল্ড সেক্সপিরিয়াল' অংশে এমন চিঠিও শুনবেন যেখানে স্বামীর আনুগত্যকে সন্দেহ করে স্ত্রী নিজের বান্ধবীকে বলেন, 'অমুক সময় এসে ওকে সিডিউস করিস। যদি সাড়া দেয়, পুরো সময়টা এই লুকনো টেপ রেকর্ডার অন করে রাখবি'! তাবৎ উচ্চ/মধ্যবিত্তের প্রাথমিক সমস্যা যৌনতা, সারা দিন সব্বাই 'আরও আরও প্রভু' ক্ষুৎকাতর আর্তনাদ করছে আর যে পরিমাণ দীর্ঘশ্বাস ছাড়ছে ঠিকঠাক ব্যবহার করতে পারলে উইন্ডমিল চালানো যেত, ও দিকে ঠোটে মরচেদীর্ঘ পেরেক। এ সয়েলে এই বিপজ্জনক বরিষণ হুড়মুড়িয়ে নামুক মা।



ঘিনঘিনে ঢাকাঢাপা ছুড়ে ফেলে আরও চমৎকার ঘটছে দেশে, পাসপোর্ট-আবেদন ফর্ম-এর ওয়েবসাইট-বয়ানে Sex-এর পাশে M, F ছাড়াও এ বার থেকে থাকবে 'E'। হ্যাঁ, ওটার মানে 'Extraterrestrial' হলে আপনি স্বস্তি পেতেন, কিন্তু তা নয়: 'Eunuch'! আমরা প্রান্তিকদের মানুষ বলেই ধরি না, সমকামীদের মিছিল দেখলে বাসেট্রামে হাসির ধুম, স্বর্ণহৃদয় বেবুশ্যে নিয়ে শরৎবাবু কান্নার জোলাপ লিখলেও ও-পাড়া দিয়ে শর্টকাট করা পথিকের কানের ডগা রেড-এভারেডির ন্যায় লাল, আর হিজড়েদের তো এ গ্রহে অস্তিত্বই নেই। ফুটপাথে দেখতে পেলে মুখ ঘুরিয়ে নিই, নবজাতকের বাড়ি দল বেঁধে এলে ঘেন্নায় বিরক্তিতে হৃদয় কুঁচকে যায়, কত অনায়াসে বার বার বলি, মানুষ তো

দু'রকম: ছেলে আর মেয়ে। প্রবচন অবধি আছে: কী আর হবে, হয় ছেলে নয় মেয়ে নয় গর্ভপাত! অন্য সম্ভাবনার স্বীকৃতিটুকুও আমাদের বাচনে যাপনে নেই। শুধু ভীষ্ম-র প্রতিশব্দ হিসেবে টিকে আছে 'নপুংসক' (স্মর্তব্য 'শোলে': ঠাকুর হিজড়ের ফৌজ বানিয়েছে)! আজকের এক্স এক্স এল-জটিল ও স্ট্রেসঝঙ্ক জমানার এইটা কিন্তু বড় গুণ, সব গোষ্ঠীর জন্যই কিছু না কিছু লড়াই জারি আছে। 'ব্রহ্মভাগব পুরাণ' (হিজড়াদের নিয়ে তুমুল দরদি বই, লেখক কমল চক্রবর্তী) তো আর টেক্সট হিসেবে কম্পালসরি করা যাবে না, কিন্তু রাষ্ট্রের তরফ থেকে এই অনন্ত অমানুষিক অপমানের কণামাত্র হলেও সুরাহার লক্ষণ দেখা গেল, এ বড় ভরসার। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে হিজড়েরা নির্বাচনেও লড়ছেন। আশা করা যায় পঞ্চাশ বছর পর অন্তত তিন-চার জন সাধারণ লোক চায়ের দোকানে 'হিজড়াদেরও আমাদের সমান অধিকার' মর্মে



শিকাগো-য় 'গে প্রাইড' প্যারেড, ২০০৭

চাউি বাক্য বলবেন। কিছু না হোক, সচেতনতার হজুগ চড়ে প্রফিটজনক আইডিয়াও তো ফলাতে পারেন বর্তমান বং-গোশিল্লীরা! গিমিকবাজ টেলিফিল্মওলাগণ একটা ‘বৃহন্নলা’ নামান (সিকোয়েলের নাম ‘শিখণ্ডী’)! ‘জগন্নাথ হে, পরজন্মে আমাদের ছেইল্যা কোরো হে’ কোরাস-আর্তনাদ দিয়ে ফাটাফাটি প্রোমো। আর যাঁরা আর কিছু না পেরে ডকু-মেকার! ঝাঁপ দিন! প্রান্তিকবাজির চেয়ে বড় প্রাইজ-উইনার আর কী? ওহো, এই সূত্রে মজার কোটেশন। এ বার শ্রেষ্ঠ অভিনেতার অস্কার পেয়েছেন জেমি ফক্স, অস্কার গায়কের রোলে অভিনয় করে। আর সেরা অভিনেত্রী হিলারি সোয়ান্স সেজেছিলেন মেয়ে-বক্সার। যুগে যুগে প্রতিবন্ধী/পাগল/পিকিউলিয়ার (=মার্জিনাল) সাজলেই পুরস্কারের স্টেজে ইয়াহু। ১৮ বছর বয়সী মার্কিন নায়িকা লিভসে লোহান বললেন, ‘অস্কার পেতে গেলে নায়িকাকে হতেই হবে মুখ্য/ কুৎসিত/ ন্যাংটো/ লেসবিয়ান/ মুটকি।’ উল্লেখ থাক, অমন যে সুন্দরী সালমা হায়েক, ‘লোনলি হার্টস’ ছবিতে বিস্ত্রী আর বিকট মোটা সিরিয়াল-কিলার হতে চলেছেন। ইচ্ছে করে তথ্যটি ১৪০ পাউন্ডের মহিলা হবেন। নয়ই বা কেন? চার্লিজ থেরন গত বছর একদম ডিটো: হতকুচ্ছিত সিরিয়াল-কিলার ‘মনস্টার’ হয়েই না অস্কার জড়ালেন!



‘শোলে’র কথা যখন উঠল, রমেশ সিঙ্গি নাকি দুরন্ত ক্লাসিকটি ফের বানাবার কথা ভাবছেন, হালের স্টারদের নিয়ে। সে ক্ষেত্রে, অপহৃতা হলে, ধীরেসুস্থে ম্যাগি বানাবার পর, মনে করে নতুন ভার্সনের সিডি-টা নিয়ে আসতে বলবেন কিন্তু!

৩ এপ্রিল, ২০০৫



লিভসে লোহান : অপ্রিয়ভাষিনী

যদি বলি মন + হরমোন

প্রথমে টিজার পড়ল: ভরা বুক না বুকভরা ভালবাসা? যেন এ দুটো মিউচুয়ালি এক্সক্লিউসিভ! অর্থাৎ, ‘ভরা বুক ভরা ভালবাসা’ বলে কিছু থাকতে পারে না। সটান সাদা/কালো প্রবলেম: ‘দেহ না মন?’ সরেস-তর হত: ‘মন না হরমোন?’ কিন্তু এতে দোষের কিছু নেই, কারণ জোরের সঙ্গে অ-প্রচলিত কিছু বলতে গেলে পার্টিজান পোজিশন এসে যাবেই। এর পর ‘শূন্য এ বুক’ বাগাল কিছু সেমিনার। সেলিব্রিটি, রসালো গল্প, কমন-সেন্সিকাল নারীবাদ। ঠিক আছে। প্রেমে-যুদ্ধে-পাবলিসিটিতে সকলই অ্যালাউ। শেষে এন্ট্রি নিল আসলি ছবি— প্রকাশ থাক, তা খুবই ভাল। দ্রুত এগোয়, অপ্রাসঙ্গিক বকে না, কিছু ডায়লগ ব্রিলিয়ান্ট, চূর্ণীর বার বার আঁচল ঠিক করার ডিটেল অতুলনীয়, কৌশিক সেন-এর অভিনয় অপূর্ব, রূপা দারুণ, ছবিটি অস্বস্তিকর বিষয়কে জড়তাহীন সটান অ্যাপ্রোচ করে। মুশকিল: চূর্ণী আগাগোড়া কৃত্রিম ও আড়ষ্ট, কৌশিকের কিছু সংলাপ অসহ্য ন্যাকা ও তৃতীয় শ্রেণির কবিজনোচিত, তাদের ‘লাভ অ্যাট ফাস্ট সাইট’ তস্য পাতি ছবির চেয়েও জোলো-খেলো চিত্রায়িত, নীচ কুঁদুলে চরিত্রকে শেষকালে হঠাৎ উদার দেখানোর গিমিকবাজি অতি রদ্বি। বিশদে যাওয়ার আগে একটা প্রসঙ্গ: বলা হচ্ছে, এটা একটা নন-ইস্যু, যাকে পরিচালক বাণিজ্যের স্বার্থে ইস্যু বানালেন। যাঁরা বলছেন, নিশ্চিত ভিনগ্রহ থেকে এসেছেন এবং হোমো স্যাপিয়েন প্রজাতির পুরুষ মেম্বরদিগকে চেনেন না। বা, যাঁদের চেনেন, তাঁরা মিথ্যেবাদী/মানসিক প্রতিবন্ধী/যৌন ফ্যান্টাসির ক্ষেত্রেও পলিটিকালি কারেক্ট (যার চেয়ে বড় পারভারশন কিছু নেই)। ‘এটা ইস্যু হওয়া উচিত নয়’ আর ‘এটা ইস্যু নয়’ কথা দুটোর মধ্যে অযুত যোজন ফারাক।

পেল্লায় সত্যিকে নেকু সমাজে আছড়ে ফেলার তুমুল সাহস ছাড়া আর যে জন্য পরিচালককে একশো সাধুবাদ: তিনি এই মুহূর্তে বাংলা বাজারে এমন একটা ছবি করলেন, যার কেন্দ্রে নায়ক-নায়িকা নেই, আছে একটা গনগনে প্রশ্ন, আর তার পক্ষে-বিপক্ষে কিছু যুক্তি ও আবেগ। ওই প্রশ্নটাই এই ছবির হিরো(ইন)। এ পথ ধরে বাংলায় আইডিয়া-কেন্দ্রিক ফিল্ম তৈরির ঢল নামবে, আশা।

ছবির গল্প সবাই জানেন। সৌমিত্র ভালবেসে বিয়ে করে তিস্তাকে। ফুলশয্যার রাতে অন্তর্বাস সরিয়ে দেখতে পায়, তিস্তার স্তন অস্বাভাবিক ছোট। সৌমিত্র বলে, তিস্তা তাকে ঠকিয়েছে। ফলে সৌমিত্র ভিলেন হয়। কারণ নারী তো শুধু ‘ওই জায়গাটা’ নয়, সে তো সবটা মিলিয়ে এক মানুষ। এটা স্পষ্টাস্পষ্টি বলে দেওয়া যাক, এই কলমটি ঝান্ডা নিয়ে সৌমিত্রকে সমর্থন করছে। তিস্তা যা করে, তা আত্যন্তিক ও নিখাদ চিটিংবাজি। বিবাহ হল মূলত যৌনতার ওপর

আধারিত এক সামাজিক চুক্তি। মানুষ তার ওপর ‘প্ৰেম’ বা ‘সহমৰ্মিতা’ বা অন্য ফ্লেভাৱেৰ টপিং দিয়েছে, ভাল, কিন্তু বিয়েৰ মূল প্ৰণোদনা: নিয়মিত যৌনতা। এ ক্ষেত্ৰে, যৌনাস্থেৰ অ-স্বাভাবিকতাৰ ইনফৰ্মেশন ভাবী পাৰ্টনাৰকে না-দেওয়া চূড়ান্ত ন্যাক্কাৰজনক কাজ। পৰ দিন ঝগড়ায় সৌমিত্ৰ জানতে চায়, এটা তাকে আগে বলা হয়নি কেন? উত্তৰে যখন ‘বুক ছোট ক্ষতি নেই হৃদয় তো বড়’ মৰ্মে সংলাপ বলে তিস্তা, সৌমিত্ৰ জিজ্ঞেস কৰে, তা হলে তিস্তা প্যাডেড-ব্ৰা পৰে কেন? যদি তাৰ কোনও কমতি আছে বলে সে না-ই মনে কৰে, তা হলে এই অপটিকাল ইলিউশনে নিজেকে গ্ৰহণীয় কৰে তোলার দায় কোথেকে? এৰ চেয়ে ভ্যালিড পয়েন্ট গোটা ছবিতে আৰ কেউ তোলেনি। লক্ষ কৰুন, সৌমিত্ৰৰ মূল অভিযোগ: তথ্য চেপে যাওয়া। তিস্তা জানে প্ৰশ্নটা উঠবেই, তৰে আগে বলেনি কেন? আৰ, সৰ্ব ক্ষণ স্পঞ্জঠাসা স্ফীত কাঁচুলি পৰে থাকলে পুৰুষটিৰ মিথ্যে ধাৰণা হবে সে বুঝতে পাৰেনি? আৰে যৌনতা তো দূৰস্থান, যদি কোনও পুৰুষ ফুলশয্যাৰ ৰাতে ঠং কৰে একটা পা খুলে ফেলে বলে, ‘এই যা, বলিনি বুঝি, ওটা তো সুধা চন্দ্ৰনেৰ মতো জয়পুৰ-ফুট, যাকগে তুমি তো আৰ আমার পা-কে বিয়ে কৰোনি, মনকে কৰেছ’, কম হুজুত?

এ ৰাৰ ঝটিতি শৰ্মিষ্ঠা-ৰ কথা, যিনি বচনোচিত ক্ল্যাপ-কুড়োনো নাৰীবাদী ডায়লগ ছড়ান। সৌমিত্ৰকে ঘূৰিয়ে এক থাবড়া মাৰাৰ কথা বলেন। তিস্তাকে তাঁৰ প্ৰশ্ন তিনটি। ১. ও কি তোকে বিয়ে কৰেছে না তোৰ শৰীৰটাকে? প্ৰশ্ন শুনে তাঞ্জিম-মাঞ্জিম ঘটে। বিয়ে কৰেছে শুধু শৰীৰটাকে নয়, কিন্তু আলবাত শৰীৰটাকেও। তা যদি না হত, তৰে কোনও পুৰুষ বিয়েৰ পৰ ‘আমি যৌন মিলনে অক্ষম’ বললে তাৰ বিৰুদ্ধে বিচ্ছেদেৰ মামলা কৰা যায় কেন? শৰ্মিষ্ঠাৰ যুক্তি আৰ একটু সম্প্ৰসাৰিত কৰে এ প্ৰশ্নও: শৰীৰ ফ্যাক্টৰ না হলে’ মেয়েৰা মৰতে ছেলেদেৱই বা বিয়ে কৰেছে কেন? বা ছেলেৰা মেয়েদেৱ? (প্ৰশ্নটা সমকামীদেৱৰ জন্য উন্টে)। দুটি সুন্দৰ মনেৰ মিলনই বিবাহ, তৰে তিস্তা শৰ্মিষ্ঠাৰ সঙ্গে জুটে গেলেই মিটে যেত।

২. ওৰ ফ্যান্টাসিৰ দায়িত্ব কি তোকে নিতে হবে? ধৰা যাক, স্বামীৰ ফ্যান্টাসি, স্ত্ৰীকে ৰোজ ৬৪ ঘা স্কেলপেটা কৰবে। সে দায়িত্ব স্ত্ৰী নেবে, এ সহজে ঘটবে না। কিন্তু স্বামীৰ ফ্যান্টাসি যদি হয়, স্ত্ৰী স্লিভলেস পৰে পিকনিক যাবে বা আজ একসঙ্গে বসে ব্লু-ফিল্ম দেখবে, তা কি প্ৰায় সব মেয়েই মনে নেবে না? অৰ্থাৎ, স্বামীৰ ফ্যান্টাসিৰ দায়িত্ব স্ত্ৰী নেয়, যত ক্ষণ না ব্যাপাৰটা বিতৰিকিচ্ছিৰি স্তৰে যাচ্ছে। সৌমিত্ৰৰ ফ্যান্টাসি কী ছিল? তাৰ স্ত্ৰীৰ স্তন অ-স্বাভাবিক হবে না। এ কি ভয়াবহ অন্যায় ফ্যান্টাসি? এক মাৰকাটাৰি পাৰভাৰশন? (যদি তা-ও হয়, মানুষেৰ মৌলিক অধিকাৰ: নিজ ফ্যান্টাসিৰ সঙ্গে সমঞ্জস সঙ্গী নিৰ্বাচন)। সৰ্বোপৰি: স্বামীৰ ফ্যান্টাসিৰ দায়িত্ব স্ত্ৰী নেবে না, স্ত্ৰীৰ ফ্যান্টাসিৰ দায়িত্ব স্বামী নেবে না (হ্যাঁ, নেয়, সে গোঁফ ৰাখে/ দাড়ি কেটে ফালে/ ডাক্তাৰ-ডাক্তাৰ খালে), তৰে যৌনজীবনটা কি তত্ত্ব আৰ ফুটনোটকে চুমু খেয়ে কাটবে?

৩. ছেলেদেৱ যখন কোনও প্ৰবলেম থাকে, তাৰা কি প্যান্ট খুলে বলে, দ্যাখো, আমার এই ডিফেক্ট আছে? এৰ জন্য

অবশ্য প্যান্ট না খুললেও চলে, মুখ খোলাই যথেষ্ট। যদি না বলে, তবে সে বাজে ছেলে। সে বিয়ের চুক্তিটাকে শ্রদ্ধা করে না। আর, ছেলেরা প্রায়ই এই অন্যায় করে, অতএব এ বার মেয়েরা করবে, এটা যুক্তি নয়। তা ছাড়া এ কী ধরনের নারীবাদ, যেখানে নারীদের শরীরক্ষুধারহিত মনসর্বস্ব সুপিরিয়র প্রাণী হিসেবে নির্মাণ করা হচ্ছে? এ তো আদতে নারীবিরোধী! পুংতন্ত্রের স্ট্র্যাটেজি: শক্তি/দেবীর জাত বলে মেয়েদের তোলাই দিয়ে তাদের সাধারণ মানুষের স্টেটাস (ও সুতরাং অধিকার) কেড়ে নেওয়া। মেয়েরা কি পির? তারা কি চিমড়ে অষ্টাবক্র সিড়িঙ্গে ছেলেদের দলে দলে চুমু খেয়ে, লট কে লট বাইসেপবিলাস ছেড়ে ব্রেনবাজির দিকে ঝুঁকে, আমির খানের পোস্টার ফড়ফড়িয়ে ছিঁড়ে জীবনানন্দের আড়ষ্টমুখো ছবির জেরক্স দেওয়ালে সাঁটছে? আসল কথাটা তো অন্তরের সৌন্দর্যের চেয়ে বাহ্যিক রূপকে বেশি গুরুত্ব না দেওয়া। সে দোষে শুধু পুরুষরা দোষী নয়।

আর ছবির শেষে তো, উরিব্বাস, মহৎ কেলো! তিস্তার বর্তমান স্বামী বলে, ‘সুখী হতে গেলে কিছু জিনিস মেনে নিতে হয়’। তার মানে, সে ‘মেনে নিয়েছে’, বিয়ের সঙ্গে একটু সমাজকল্যাণও মিশে আছে তার। ‘আমার তো দিব্যি লাগে’ বলতে পারছে না। তার পর তিস্তার সংলাপ। তার বক্তব্য, সে যদূর জানে, স্বামী সুখীই। আর, তার মেয়ে এই বুকেরই দুধ খেয়েছে। ডাক্তার বলেছেন, তার গ্রোথ খুব ভাল। যাক্কালা! সৌমিত্র কি বলেছিল, আমার সন্তানের গ্রোথ ভাল হবে না, তাই তুমি ভাগো? তর্কটা তো স্পষ্টত যৌনতা নিয়ে। মাতৃত্বের তামা-তুলসী ঠেকিয়ে ডজ করে বেরিয়ে যাচ্ছ কেন? এখানে তুমুল অপমান করা হল যৌনতার প্লেজারকে। আর, বলা হল এক ভয়াবহ নারীবাদ-বিরোধী কথাই: নারীরা যৌনতার চেয়ে বেশি করে মাতৃত্বে সার্থক। এ তত্ত্ব প্রচারে পুংতন্ত্রের সুপার-সুবিধে: নারীর যৌন আনন্দভোগের অধিকার কেড়ে নেওয়া যায়, (লালনের) দায়িত্ব বাড়িয়ে দেওয়া যায়। স্তনকে/যৌনতাকে আনন্দের চেয়ে বেশি উপযোগিতার অ্যাঙ্গল থেকে দেখার বস্তাপচা ধারণা এর আগে ছবিতে খাজুরাহোর গাইডের মুখেও ধ্বনিত, শেষে এই হাস্যকর উক্তি চলে প্লাস সৌমিত্রকে হাতজোড় করে ক্ষমা চাইয়ে পরিচালক সস্তা ক্যাচি হাফসেদ্ধ নারীবাদকে তুট্ট করলেন, ছবিটার অবিশ্বাস্য পোটেনশিয়াল বালি কামড়ে কাঁদতে লাগল।

১ মে, ২০০৫

জ য তু বা ঙা লি স্তা ন

ক'দিন আগে এক জন নিজ-ওয়েবসাইটে একটা মিষ্টি তুলতুলে খরগোশের ছবি দিয়ে লিখলেন, 'এর নাম টোবি। আমার পোষা। একে ৩০ জুন আমি রান্না করে খেয়ে নেব, যদি না আপনারা সকলে মিলে আমাকে ৫০,০০০ ডলার পাঠান বা সমমূল্যের 'সেভ টোবি' টি-শার্ট, মগ, এ সব কেনেন। কী ভাবে ওকে কাটব-কুটব-ছাল ছাড়াব-মশলা দিয়ে মাখব, সে জম্পেশ রেসিপি নীচে দেখুন।' হইহই, চাঁদা, প্রতিবাদ, হাসাহাসি। কেউ বলছে 'আরে দূর, আদৌ কোনও খরগোশ আছে না একটা ফোটো দিয়ে ঠকাচ্ছে, সেটা আগে দ্যাখ।' কেউ পেট-শপ দেখে ভাবছে, ইস, ছুট্টে ক'ডজন বেড়াল-টিয়াপাখি কিনলেই দু'মাসে কোটিপতি। কেউ ওয়েবসাইট-টা তুলে দিতে পুলিশ ডাকছে, কিন্তু বলা হচ্ছে, 'খরগোশ খাওয়া তো আইনবিরুদ্ধ নয়'। ইন্টারনেট কী ভাবে এমনকী ব্ল্যাকমেলেরও নতুন দিগন্ত খুলে দিল! অ্যাডিন ব্ল্যাকমেলের থিম ছিল কোনও নির্দিষ্ট মানুষের গোপন ঘটনা জানিয়ে দেওয়ার হুমকি। আর এখানে, ব্ল্যাকমেল করা হচ্ছে এক জনকে নয়, গোটা বিশ্বের পাবলিককে। এবং আরও দুর্ধর্ষ: ভয়টা পাওয়ানো হচ্ছে মানবিকতার ওপর ভরসা করে! আমার বিয়ের আগের প্রেম জানতে পারলে স্বামী মেরে ফেলবে। তাই বাঁচতে টাকা দিলাম। বেশ। কিন্তু ওই খরগোশটা মরলে কার কী ঘন্টা হবে? অথচ, টাকা উঠছে, প্রচুর। অর্থাৎ সংজ্ঞাটাই বদলে গেল। আমার স্বার্থ রক্ষার্থে নয়, একটা খিচখিচে খারাপ লাগা এড়াতে, সম্পূর্ণ অচেনা প্রাণীকে বাঁচাতে আমি গাঁটগচ্ছা দেব। এই বায়বীয় ফিনফিনে ফুলেল বৃত্তির ওপর ভরসা করে ব্ল্যাকমেলের মতো কুচ্ছিত চক্রান্ত ফাঁদা যায়: ব্রেনতরঙ্গ নোবেলবাচক।



কলকাতা শহরে বনবিভাগের আটটা পার্কেই ছাতা নিয়ে ঢোকা বারণ হয়ে গেল। কেন, কর্তৃপক্ষ চাইছেন নাগরিকগণের বৃষ্টিতে ভিজে নিউমোনিয়া হোক? বা রোদে সঁকে সানস্ট্রোক? আরে না না, নূতন তথ্য: যুবক-যুবতীরা ওই ছাতার আড়ালে চুমু খায়! হ্যাঁ, চু প্লাস মু! অ্যায়সা বেলেল্লাপনা! আর যা করে, উচ্চারণ করতেও ঘেন্নাপিড়িতে পেট গুলিয়ে ওঠে: সেক্স। শুনতে পেলেন না? আর একটু জোরে বলছি: সেক্স। তাও হল না? সরাসরিই হানি অসুব্য কথাটা। সেক্স। আ ছি, আ ছি, শত ধিক, একশো গলাধাক্কা। বড় কাগজ, বিশাল পোশাক নিয়ে ঢোকাও নিষিদ্ধ! বোধহয় এগুলোকে ঠিকঠাক মেলে ধরতে পারলে ছাতার মতোই ক্ষণিক আড়াল গজাবে। (তবে অমন ম্যানুয়াল মশারির মতো টানা ধরে থেকে যৌবনকুস্তি মানে তো গাঁটে গাঁটে স্পন্ডি)! ঝোপের পিছনে, দেওয়ালের আবডালেও বসা নাস্তি।

ঘি+আগুন+আড়াল=যৌ! ন!! তা!!! কী অশ্লীল কী নোংরা কী ঐতিহ্যবিরোধী। অ্যাঁদিনে অথরিটি বেহায়াগুলোকে সঠিক টাইট দিয়েছেন। এমনিতেই তো লীলেখেলার চোটে রাস্তায় বেরনো দায়। অবশ্য পার্কের দারোয়ানগুলো ভাল, যুগল দেখলেই কারণে-অকারণে যথেষ্ট কৌতুকা দেয়। আমরাও টিটকিরির সুযোগ পেলে ধুইয়ে দিই। ছাড়ব কেন? আমরা শালা বিয়ের দেড় বছরের মাথায় বাচ্চা পয়দা করে অয়েল ক্লথ মধ্যখানে রেখে শুয়ে থাকলাম গোটা জীবন, আর তোরা প্রখর বয়সে ভরপুর আমোদ করে নিবি চোখের সামনে? এত বড় আশ্পদা, যৌনতাকে গা-ঘিনঘিনে ওয়াক তোলা জিনিস না ভেবে আনন্দযজ্ঞ ভাবলি? প্রেমাস্পদকে প্রকাশ্যে আদর করার তুমুল পুলক ভোগের অধিকার কে দিয়েছে? আমরা যে এতগুলো বুভুক্ষু পকেটে দুঃখু চেপে ঘুরে বেড়াচ্ছি, সইব কী করে? তুমি কি সোমালিয়ার গড়ের মাঠে দেখিয়ে দেখিয়ে পিংজা খেতে পারো?

কর্তৃপক্ষবাবু, খবরদার, এটুকুতে ছেড়ে দেবেন না। হারামজাদাগুলোর জন্য আরও নিষেধাজ্ঞা বাগান। ছাতা ছাড়া বসলেও যদি গায়ে গা ঠেকায়? বরং একটা মাপ দিয়ে দিন। যুবক-যুবতী পাশাপাশি অন্তত ৬৫ ইঞ্চি ব্যবধান এবং মুখোমুখি অন্তত ৭৩ ইঞ্চি গ্যাপ না রেখে বসলে জেলে যাবে। মাপের ফিতে নিজেদের নিয়ে আসতে হবে। কথাতেও তো সেক্স থাকতে পারে। হয়তো ভাল(লা)গার গল্প করছে! কাপল প্রতি একটা করে ‘শুনতে-পাচ্ছি-কিন্তু’ দারোয়ান বসান। ঘাড়ের ওপর উবু হয়ে ঝুঁকে থাকবে। বেগড়বাই দেখলেই ইমিডিয়েট বাটাম। চাউনিতে লোল কটাক্ষ দেখলে চৌকিদার এসে ঝাঁটার কাঠি দিয়ে চোখ গেলে দেবে। ওঃ, এ যা সুযোগ পাওয়া গেছে না, সমষ্টির যৌন ঈর্ষায় রাষ্ট্রের সমর্থন! সেক্স-স্টার্ডড জনপিণ্ডের সাফাই অভিযান! মার শালা প্রেম-মজারুদের। ন্যাংটো করে ঘোরা। মেয়েছেলে হয়ে শার্টপ্যান্ট পরে পাড়া দাপিয়ে যাওয়া হচ্ছে, আবার টিটকিরি মারলে রুখে দাঁড়ানো! মার। কাপড় খোল। ওড়না ছাড়া কলেজ করবি, শিক্ষিকা হয়ে লিপস্টিকের দিকে নজর? মার। সাসপেন্ড কর। চাকরি ছাড়িয়ে দে। চলুন তো সত্যি একটা শুচি মুভমেন্ট গড়ে তুলি। একটা সুস্থ রুচিমান বাঙালিস্তান! নন্দনে-লেকে-ট্যাক্সিতে-গলিতে-গলতায় প্রেম দেখলেই ধোলাই। খোলামেলা পোশাক দেখলেই আরও ছিঁড়ে দিন। বাসে লেডিজ সিটে না বসে বয়ফ্রেন্ডের পাশে বসেছে, আমাদের একটা সিট লস! কান মূলে নামিয়ে দে। ব্যাচেলর হয়ে ফ্ল্যাট ভাড়া নিচ্ছে? দরজা ভেঙে মার। শুষার, তোমরা এম-টিভি দেখে ঔপনিষদিক হেরিটেজের মুখে মোবিল মাথাবে আর আমরা ছেড়ে দেব? জানো না, আমাগো পবিত্র সংস্কৃতিতে ছিট্টে-ফোঁটাও যৌনতা নেই? ঝড়ে যায় উড়ে যায় গো আমার ‘মুখের’ আঁচলখানি, আমরা লিখি। হ্যাঁ, নিজেদের জীবনে ও সব এক-আধ বার একদমই ঘটেনি বলব না, নইলে তোরা এলি কী করে? কিন্তু সেটা নাক সিটকে চোখ মটকে, নিতান্ত করতে হয় বলে। মলত্যাগের মতো। ওইটে কি লোককে দেখিয়ে দেখিয়ে করার জিনিস? আমাদের আপত্তি যৌনতায় তো নয়, প্রকাশ্যে ওই নোংরাগি করা নিয়ে। নিজের বেডরুমে গিয়ে যত খুশি ঢং কর না।

বেসিক প্রশ্নাবলি: ১. প্রকাশ্যে করলেই বা ক্ষতি কী? দুই সম্মত মানুষের মধ্যে শরীরক্ৰীড়া দেখে তা খুব সুন্দর জিনিস



আমাদের দেশটা তো ঞপাস্কি হয়ে যায়নি।
তাই পারি না।

না মনে হয়ে আমাদের যে অস্বস্তি/ বিরক্তি/ গা রি-রি ঘটে, তা আদতে সভ্যতার বোধ না পারভার্ট কুসংস্কার? একটা জিনিস প্রচলিত বলেই তা মেনে নেব, না দৃষ্টিভঙ্গিটাকে প্রশ্ন করব? যে জিনিস সিনেমায় দেখালেই ন্যাজ তুলে লাইন দিচ্ছি তা প্রকাশ্যে দেখলে শিউরে উঠছি কেন? যা জীবনে অসম্ভব স্বর্গীয় আনন্দ দিচ্ছে তাকে ‘নোংরা’ ভাবছি কোন মুখে? ২. আমরা কি সমাজটাকে এমন করে গড়ে তুলেছি যাতে শরীর সম্পর্কে সবার বেশ তকতকে ধারণা এবং ‘আচ্ছা মা, আমরা ঘরে আছি, তুমি খাবার দিয়ে ডেকো’ বলে টিন-এজারটি তার পার্টনার নিয়ে দোর দিতে পারে? আন্ধেকের এক চিলতে প্রাইভেসি-ঘর নেই, যাদের আছে, এটা করার অনুমোদন নেই, তবে সে কোথায় গিয়ে যৌনতা করবে? ৩. না কি, এক জন মানুষ তার অসহনীয় উদ্ভাত ইচ্ছেটাকে বারে বারে কোঁৎ কোঁৎ করে গিলে গিলে কুড়ি বছর কাটাবে, তার পর চাকরি পেয়ে থিতু হয়ে ফ্ল্যাট কিনে তবে ছিমছাম যৌনতা শুরু করবে? এ কী আদিগন্ত ধাস্টামি! সেক্স একটা জৈবিক খিদে, তাকে অনবরত গিলে যাওয়া আর সে বিষয়ে লাগাতার ভণ্ডামি থেকেই তো ছালের ভিতরে কুটকুটে তেতো বিরক্তি জন্ম নেয়, যাতে ‘আদিখ্যেতা দেখে বাঁচি না, অটোয় পাশাপাশি সিট না পেলে নেকুরা যাবেন না!’— এই হিংসুক নীচ পরপ্রেমকাতর ডায়লগ জন্মে। প্রেম দেখলেই অতলান্ত হিংসেয় বুক জ্বলে যায়: এ আমাদের সেরা অ্যাসিডিটি।

আসলে, ন্যাদাগোবরা বাঙালির বাপের ভাগ্য যে এ জাতে কোনও জাঁ জেনে বা জর্জ বাতাই জন্মাননি। সে ছিলাছেঁড়া যৌনতা উদযাপনের জিনিয়াস ঘাড়ে পড়লে, ওই প্রজ্বলন্ত তরবারির একটি সাঁ-কচাৎ ঘোরালেই ফিনাইলগস্কী ভণ্ডামি একেবারে বাউন্ডারি ছাড়িয়ে গিয়ে পড়ত। অবশ্য এঁদের ক’দিন বাদেই ময়দানে ঢিল ছুড়ে হত্যা করা হত সরকারি মদতে, কিন্তু শহিদের ক্ষমতা তো অনন্ত। যাক গে, বঙ্গ-প্রতিভাধরেরা যৌনতার প্রশ্নে সাধারণত সুপার-সেফ খেলেন কেন, অন্যত্র। আপাতত রোদ কামড়াচ্ছে বর্ষা আসছে এবং পার্কে বসলে ছাতা নেওয়া বারণ। জয় যৌনতাবিরোধী বাঙালি, প্রেমিক-প্রেমিকার প্রতি শত্রুতা ও ঘেন্না ছড়াতে ছড়াতে তা হলে মানবাধিকার-হরণ অবধি গেলাম আমরা!

২৯ মে, ২০০৫

কাঁচি মা রা কে রা নি

দেশে দেশে কালে কালে সেন্সরব্যবস্থা উজবুকময়। যেহেতু মেজরিটি নির্বোধ এবং আমি তার প্রতিনিধি, অতএব মৌলিকতায় পিন ফোটানো আমার জন্মগত অধিকার, নতুনত্ব গিলতে না পারা আমার আবশ্যিক যোগ্যতা, প্রতিভাকে উত্ত্যক্ত করা আমার প্রিয় শখ— ম্যানিফেস্টো। আর সত্যিই তো, ঝাড়েবংশে সকল সিনেবাজ মম অনুমোদনের অপেক্ষায়, এ চূড়ান্ত ক্ষমতার মানে কী, যদি না তাদের রাস্তায় বাছাই পেরেক বিছিয়ে দিতে পারলুম? অধীন মানুষকে যদি যখন-তখন অপমান না করা যায়, ক্ষমতার মজা কই? বেশ আমি ক্লাসে ঢুকলেই ভয়ে সবার প্যাণ্টে ইয়ে হয়ে যাবে, নিরীহ ছেলেটিকে কান ধরে বেঞ্চির ওপর দাঁড় করাব, অফিসে অধস্তন যুবাব অ্যাপো আছে জেনে ঠিক পাঁচটার সময় কাজ ধরিয়ে দেব, কলোনিতে চাবুক হাতে পায়চারি করব আর ক্রীতদাসগুলোকে ‘তুই না করলে তোর বাপ করেছে’ বলে আছড়াব, তবে না পেশিবিলাস? আসলে, রাষ্ট্রের ধর্ষকাম চরিতার্থ করার কিছু এজেন্সি দরকার। সেন্সর তার মধ্যে একটা। তাই এক সুন্দর সকালে আক্কেলদাঁত মাজতে মাজতে ভিত্তিহীন নিষেধাজ্ঞা চাপিয়ে দেওয়া, মাসতুতো বোনের অপছন্দ হলে লেট নাইট ফিল্ম বন্ধ করে দেওয়া: এ নীতিমস্তানি চলছে চলবে।

এমনিতে আমাদের সমাজে গার্জেনি ফলাবার এক প্রখর চুলকুনি সাধারণ জনগণের মধ্যেও অহরহ বিদ্যমান। তার ঝাপড়টা খেতে হয় চোর, প্রেমিক-প্রেমিকা, নেড়ি কুকুরদের। সেন্সরকত্তারা একে গভীর পাওয়ারফুল, তায় বাগে পেয়েছেন সমাজের ক্রিমস্য ক্রিম, ছাড়বেন কেন? হ্যাঁ, যদি তুমি চলতি প্রথার গোড়ালি যত্নে চেটে নাদুস পোষমানা গয়গবেট হও, ভেরি গুড। জয় মুখ্য। নইলে, কপালে দুঃখ। এতে মজা পেলায়। যাঁরা ছকভাঙা ভাবনাচিন্তা করছেন, সেই মাইনরিটির ওপর অত্যাচার করে একটা নিশ্চিত আনন্দ পাওয়া যায়। আর এই হাউমাউ তর্জনের আবহে, সাহসী জিনিয়াস গজিয়ে ওঠার সম্ভাবনা কমে। আনন্দ আহরণের এই যুক্তিযুক্ত প্রক্রিয়াগুলির ওপর এমনিতে আলগোছে একটা মূল্যবোধের চাদর ফেলে দেওয়া থাকে, কিন্তু এ বার যেটা হল, তা একেবারে নগ্ন ও নখওলা খামখেয়াল। ছবিতে কোনও চরিত্র সিগারেট খেতে পারবে না। তা দেখালে নাকি সবাই অনুকরণ করে প্রাণপণ সিগারেট খাবে। কী অলোকসামান্য ধাস্টামি! এই যুক্তিতে তো ছবিতে ধর্ষণও দেখানো উচিত নয়। বা খুন। বা চুরি। বা আত্মহত্যা। বা দাঁড়িপাল্লা ইচ্ছে করে বাঁ দিকে হেলিয়ে ধরা/ বন্ধুপত্নীগমন/ মা-বাবাকে মিথ্যে বলে পার্টিতে যাওয়া/ মেজকার সঙ্গে বেইমানি/ বোনকে হিংসে। বা কপট পাশা। বস্ত্রহরণ। নিকুণ্ডিলা যজ্ঞগৃহে উপাসনারত নিরস্ত্র মানুষের ওপর অস্ত্রবর্ষণ। বিড়ি-যুক্তির অপরিহার্য পরধাপ: বিশ্বের তাবৎ নেগেটিভতা (ধ্রুব/ আপেক্ষিক) চলচ্চিত্রে প্রকাশ করা নিষিদ্ধ, নইলে

দর্শকরা তা ত্বরন্ত শিখবে। তবে হাতে রইল কী? ‘পথের পাঁচালী’তে সর্বজয়া ইন্দির ঠাকরণকে দূর দূর করে তাড়ায়। ব্যান। ‘মেঘে ঢাকা তারা’য় বোনের প্রেমিক ফুসলে নেয়। ব্যান। ‘চোখের বালি’ তো নোংরামির আশ্রম: বিধবার সঙ্গে এক বার এর প্রেম, এক বার ওর। ব্যানব্যানাব্যান।

তা হলে ছবি কী রকম হবে? সবাই ফুলছাপ জামাপ্যান্ট পরে সবাইকে হাসিমুখে নমস্কার করছে আর স্বামীরা স্ত্রীদের বুড়ো আঙুল ছাড়া কিছু ছুঁচ্ছে না? বাবা মদ খায় না, বাচ্চা পরীক্ষায় চোতা নিয়ে যায় না, মা পি এন পি সি করে না, দাদু এফ টিভি দ্যাখে না? মলমূত্রবাতকস্মহীন এই আবক্ষ মিষ্টি শূকররা মাঝে মাঝে দারুণ সুরে গান গেয়ে ওঠে আর পথশিশুকে ক্যাডবেরি কিনে দেয়? বিশ্বময় এই ঝলমলে মিথ্যে কার্টুন নেটওয়ার্ক বিছিয়ে ভারত নিজমুন্ডু রোশন করবে? এতটুকু একটুও কণামাত্র খারাপ দেখাব না, জীবন দেখাব? ন্যাকামি? শিল্প হল মুক্তির, স্পর্ধার লীলাঞ্চল। সে ‘যা ঘটে’ তা তো দেখাবেই, ইচ্ছে হলে ‘যা ঘটে না’ তা-ও দেখাবে। চার পাশে যা নিয়ত চলেছে, ‘তাকে দেখাতে দেব না’ মানে? সমাজে সব্বাই সিগারেট খাবে আর পর্দায় তা দেখানো যাবে না? ক’দিন আগে এমত গাড়ল-ডিক্রি জারি হয়েছিল, কনস্টেবলের ওপরের র্যাংকের কোনও পুলিশকে দুর্নীতিগ্রস্ত দেখানো যাবে না। নেতাদের তো নয়ই। মাঝখানে কিছু ছবিতে যা-ও গালাগাল অনুমোদন পাচ্ছিল, এখন তার ওপরে কচাকচ খাঁড়া। যেন আমরা কেউ থিস্তি করি না। যেন গালাগাল, অশিষ্ট কথা ভাষার অবিচ্ছেদ্য এবং জরুরি অংশ নয়। যেন থিস্তি দিয়ে যে ফ্লোভ, বিষ উগরে দেওয়া সম্ভব, তা ভদ্র ভাষাতেও দিব্যি করা যায়। সেন্সরবোর্ডে আবার নির্দিষ্ট কোটা আছে! সত্যি। অমুক ‘চার অক্ষর’ তিন বার আওড়ানো যাবে, তমুক স্ল্যাং এক বার, আর ওইটা নেভার। অর্থাৎ ছবিতে কেরানি আধলা ইটে হোঁচট খেয়ে যেটা এক বার বলে উঠতে পারেন, এক ধর্মিতাও তাঁর ধর্মকের লোমশ জন্তুবাজির উদ্দেশে হাউহাউ ওয়াক তুলে সেটা এক বারই টেঁচিয়ে উঠতে পারবেন। বাহবা। শিল্পের তোয়াক্কা না-করা কাঁচিমারা কেরানি মদীয় হুজুর মায়-বাপ।

স্তুভিত হয়ে দেখার, যত দিন যাচ্ছে, সর্বভূতে রক্ষণশীলতার স্বৈরাচার জিতে হাল্লাক। এই ছবি-কাঁচিবাজি ভুঁইফোড় নয়, এ আসলে গবেটাক্স গোঁয়ারগুণ্ডা সামাজিক সেন্সরেরই ল্যাংল্যাঙানো চ্যালা। স্বাধীনতার টুটি মটকানো এখন দৈনিক তামাশা। ডেলি কে ডেলি শমন জারি হবে, প্রেমিক-প্রেমিকার পার্কে ছাতা নেওয়া বন্ধ। মুম্বই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভি-সি বলবেন, ছাত্রীদের ছোট পোশাক পরার বিরুদ্ধে নিয়ম জারি হোক। উত্তরপ্রদেশের বিজনোর-এর বাড়াপুর-নাগিনা অঞ্চলের ১৪টি মসজিদের পেশ ইমাম মিটিং করে সিদ্ধান্ত নেবেন: মুসলিম মহিলাদের বাড়ি থেকে বেরনো বন্ধ, সিনেমা বা টিভি সিরিয়াল দেখা বন্ধ, আধুনিক গান শোনা বন্ধ। এবং বাড়ি বাড়ি ঘুরে সাত-সদস্যের এক কমিটি নজরদারি চালাবেন, অনুশাসনগুলো ঠিকঠাক মানা হচ্ছে কি না। এবং বিজনোরের নগরপালিকা-র চেয়ারম্যান হাঁ হয়ে বলবেন, ‘এই নিষেধের সঙ্গে নারীস্বাধীনতা খর্ব হওয়ার সম্পর্ক কী?’ এবং পরে একটি মসজিদের কাজি অনুগ্রহে দ্রব হয়ে শেকল শিথিল করবেন, ‘না, নিতান্ত দরকার হলে বেরোন মহিলারা, কিন্তু বোরখায় সর্বাস্ত ঢেকে।’ এবং মেরিন ড্রাইভে মাতাল

কনস্টেবল যুবতীর শ্লীলতাহানি করলে শিব সেনা বলবে, ‘ও রকম ছোট ও প্ররোচক পোশাক পরলে তো ধর্ষণের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবেই!’ শিব সেনা ভিনখাঁচের সেন্সরে বিশ্বাসী। বার্নার্ড শ’ বলেছিলেন, ‘মানুষকে খুন করা সেন্সরশিপেরই উগ্রতম রূপ।’ এরা শ’ পড়েছে শ’বার! জানে, মারের বাড়া সেন্সর নেই। হলের কাচ ভাঙ। ডিরেক্টরের বাড়িতে বোম মার। ‘শোলে’র মুসলিম অভিনেতাদের বাদ দিয়ে অন্য বয়ান তৈরি করতে অর্ডার দে।

আমাদের পশ্চিমবঙ্গে অবশ্য এই সব নেই। ভীষণ লিবারাল, শিক্ষিত ওয়েদার। যা খুশি করুন। যে ভাবে খুশি বলুন। শুধু বিকেলের কনে-দেখা-আলোয় বুদ্ধবাবু নন্দনে ঢোকান সময় সুট করে পোস্টারগুলো লুকিয়ে ফেলবেন। বলা যায় না, হয়তো সংস্কৃতিমান টকটকে মুখটির ভুরুদ্বয় স্বল্প কুঁচকে গেল। তার পর তো আর নন্দনে সিনেমা চলতে পারে না, তাই না? উনি মার্কেজ-লোরকা-মায়াকভস্কি অনুবাদ করেন, নাটক লেখেন, ওঁকে কেন্দ্র করে বঙ্গকবিতার নক্ষত্ররাজি হেঁ-হেঁ ধ্বনিতে হাত কচলে আবর্তিত হন। নেত্রপাতমাত্র উনি বুঝে যাবেন কোন সংস্কৃতি বদ, আর ওঁর মস্ত ‘ডু ইট নাউ’। তক্ষুনি ব্যান। একেবারে স্বয়ং সেন্সররূপে সংস্থিত। সাথে কি আর চতুর্দিকে সেফ খেলা আর চকচকে নির্বুদ্ধিতার চাষ? হাইনরিখ হাইনে-র কথা মনে রাখবেন, ‘যেখানে বই পোড়ানো হয়, সেখানে এক দিন না এক দিন মানুষ পোড়ানো হবেই।’ কে বাপু সেধে গায়ে কেরোসিনঘ্রাণ নিতে চায়? তার চেয়ে ডিওডোর্যান্ট মাখুন, ঘাড়ে-বগলে পাউডার দিন, কুকুরে ভ্যাটের পাশে ভূণ নিয়ে কামড়াকামড়ি করলে ভূণ দেখানো ব্যান করে দিন। কারণ শিল্পের আবশ্যিক ধর্ম তো আপনাকে ডিসটার্ব করা নয়, মুখের ওপর বদগন্ধ সত্যিটা ছড়মুড়িয়ে ছুড়ে মারা নয়। শিল্প তো গোলাপি পিকনিকেরই ভাব-সম্প্রসারণ। সুখী গাধার ক্লোজ-আপ। যেখানে সপরিবার-আমাদের মেনু সযত্নে সরবরাহ করা হয়। গরমাগরম পরিবেশন করুন, ঝাল লাগলে অল্প সেন্সর ছড়িয়ে নিতে ভুলবেন না।

২৬ জুন, ২০০৫

কি ছু র গ র গে কি ছু র গ র গে

লরির শাস্ত্রত পশ্চাতলিখনগুলি আমাগো জীবনের নুক ও কর্নারসমূহ কত না সমৃদ্ধ করেছে! বুরি নজরসম্পন্নের মুণ্ড যে অবিমিশ্র কালা: সচিত্র তথ্য, কিংবা '১০০-র মধ্যে ৮০ বেইমান, তবুও মেরা ভারত মহান' শীর্ষক আত্ম-স্যাটায়ায় নিয়ত রসিয়ে রাখছে পথচারী-হৃদি। কিন্তু মিনিবাসের 'মেরো না পেছনে ব্যথা' বা ট্রাকের 'ইজ্জত আজ লিজ্জত পাঁপড়' লব্জের তুখোড় অ্যাপিল ঝাপ্টায় সরিয়ে গ্রাভারি কপচাল এক DN ৪ বাস, যার নিতম্ব পুকারিছে 'দ্যাখো আর আইডিয়া করো'। সত্যিই যা জমানা পততি, ধারণার পলক নাই পড়ে, 'এম এম এস'-এর মহামারি মোবাইলে মোবাইলে ছড়াল আছোলা নগ্নতা, সাঁঝসবেরে শ'বার নেকেড-উলঙ্গ-অনাবরণ-ন্যাংটাপুটো দেখে দেখে সত্তা-সুড়সুড়িতে চড়া পড়ে শুখা, দশ বছর পর কাঁচা রু ফিল্ম সাধলেও মুখে রুচবে না। ওজনদরে ফ্যান্টাসি ফুরিয়ে ইতিমধ্যেই লোকের মন হিলেছে সত্যের পানে, বাস্তব নর-নারীর নিতান্ত ব্যক্তিগত সঙ্গম বা পূর্বক্ৰীড়া দেখার উত্তেজনায় লাল পড়ছে ডানবাঁ। পর্নো-অভিনে(তা/ত্রী) তো জানেই তদীয় পাঁড়-আশ্লেষ পাইকারিপ্রদর্শনার্থে, সুতরাং সে যৌনতা কিছুটি ভণ্ডামি, তার চেয়ে একেলা জগৎ ভুলে তীর সৎ অশালীনতাটুকু ভোগ করছিলেন যে যুবা/যুবি: একান্ত প্রাইভেট সোহাগ-তসবির যদি ছড়িয়ে দেওয়া যায় কষ-বেয়ে-কাম-গড়ানো জনতার চটচটে করতলে, নির্বিকল্প! তবে এ জন্তুসম অপমান বাদ দিলে ভাল দিকও নিয়্যাস, প্রদর্শনকামনার তুঙ্গলাফ, 'আমি এক্সিবিশনিস্ট, চাই আমার নগ্ন শরীর অনেকে দেখুক', 'আমরা ইয়াং দম্পতি, যুগ্ম ফ্যান্টাসি: অনেকের সামনে সঙ্গম' গোছের তৃষ্ণা বালি খাচ্ছিল যাঁদের, পোয়াবারো। কিন্তু বেতালের ঘুঁষির ন্যায় যা দড়াদাম: জ্ঞানে/অজ্ঞানে উন্মোচনের বেধড়ক লীলা ক'বছর বাদে অ্যাদুর সর্বপ্লাবী হতে চলেছে, শরীর-শুচিবায়ু উবে নিঃশেষ হতে বাধ্য। নিরুপায় হয়েই লোকে 'ধুত্তোর' বলে যৌনাঙ্গের আলট্রা-পবিত্রতা ছুড়ে দেবে জঞ্জালটিপিতে, যেমন 'আমার নাকের ডগা দেখে ফেললে রে' আর্তনাদ আজ অশ্রুত ও অ্যাবসার্ড, সে সবখোল জমানায় ললনাগণ 'ও, আমার ফুলসন্টিমন্টি এম এম এস-টা দেখেছিস, বেশ করেছিস, একটু আউট অব ফোকাস আছে, না রে?' মার্কি অভ্যস্ত ডায়লগে পান্টাবে না ভুরু অবধি। হোলসেল সহজলভ্যতার চেয়ে অধিক আড়ং ধোয়াপাখলা আর কীসে? টিন-বাচ্চাও যখন ইচ্ছেমাত্র ননস্টপ নগ্নতার ফেস্টিভ্যাল বসাবে স্বীয় কম্পিউটারে, সেন্সর কোন মুখে দুধুভাতু মূল্যবোধে চোবাবে বসুধা? 'নিষিদ্ধ' লেবেল ছাপা বন্ধ হওয়ার ফলে, শরীর-সম্পর্কিত ট্যাবুটাবা

এমাছিছি উঃ মেরু-র থার্মোপারার ন্যায় চোঁ-চাঁ নেমে আসবে মাইনাসমুখে, কারণ বাথরুম-ফুটায় উঁকি-ধকধক রগরগানি বাঁচতেই পারে না হু-হা গোপনতাহীনতায়।



নিরাবয়ব অডিয়েন্সের সামনে উন্মোচনের আরাম আরও আনল নয়। ওয়েবসাইট ‘কনফেশনস’, স্বীকারোক্তির অনোখা অঞ্চল, যেথা সবাই লেখে নিজ-পাপের বৃত্তান্ত। আগে কনফেশন হত কুঠুরিতে পাদ্রির কাছে। বা প্রিয় বন্ধুর সমীপে, মাঝরাতে বালিশ কোলে চিপে। তাও তার হৃদয়ছোপে ‘খারাপ’ হয়ে যাওয়ার ভয় ছিল। এখন সারা দুনিয়ার সামনে ‘আসলে প্রেমিকার বোনকে ভালবাসি’ বলে দিতে পেরে হাল্কা লাগবে অভাবনীয়, আবার যারা জানল, তাদের কাউকেই চিনি না কক্ষনও চিনব না বলে, অপরাধী লাগবে না এতটুকু। এ ছাড়া ‘ব্লগ’ তো আছেই। হাঃ, উঃ মনস্তারবিশেষ নহে, ওর মানে ওয়েব-এ যে কোনও লোকের যা খুশি লেখা: প্রবন্ধ/কবিতা/দৈনিক ডাইরি/চোরা ফ্যান্টাসি। পদ্য লিখি, ভাল নয়, কিন্তু বড্ড পড়াতে ইচ্ছে করে। আমার প্রথম প্রেমের কথাটা বলতে বড্ড ইচ্ছে করছে, কে শুনবে? আমার বড় ইচ্ছে এই যে অপূর্ব ঢঙে রোজ ডাইরি লিখছি, কাউকে দেখাই। আপামর লাখো ডিজায়ার আনতাবড়ি জোনাকির ন্যায় উড়ছে পুড়ছে মাথা খুঁড়ছে। কে তাদের অনন্ত প্রশ্নে কাছে নেবে? কাকে আমি খুলে বলব রোজকার ভোর-স্বপ্ন, ‘পারভার্ট’ গালাগাল না খাওয়ার নিশ্চিন্দি নিয়ে? ইন্টারনেটের এই অবিশ্বাস্য যৌতুক, কোটি কোটি মুখহীন পাঠকের সমষ্টি, তাদের সামনে নিজেকে নগ্ন করে দেওয়ার অপরাধ আরাম, কুটকুটে মুখোশ আর ককেশ বর্ম নামিয়ে রেখে নির্ভর পায়চারি, আগে এসেছিল জীবনে? এই মুহূর্তে হয়তো স্পেনের কোনও মেয়ে, রাশিয়ার প্রৌঢ়, হাতিবাগানের উড়কু ফাজিল আমাকে দেখছে শুনছে, হয়তো বুঝছে! এই আত্মার শান্তি, একইসঙ্গে বহু দৃষ্টির অবিশ্বাস্য প্রসারিত দর্পণে নিজেকে মেলে দেওয়া ও সে দৃষ্টি হলের মতো না-বেঁধার স্বস্তি: আশীর্বাদ।



ক্লান্ত সন্ধ্যার গায়ে মশালা চিপ্সের আস্তর দেওয়ার জন্য আমরা টুকটাক স্ত্রীকে ধর্ষণ করি, বাচ্চা বিয়োচ্ছে না বলে বউকে মুখ গুঁজড়ে গুইয়ে দিই দেওরের বিছানায়, শ্বশুর ইচ্ছেমত আঃ আঃ চুঃ ডেকে নিয়ে যায় পুত্রবধূকে নিথর গুদামে। সেই ভারতের মহামানবের সাগরবিচে দাঁড়িয়ে মণীশ ঝা তুললেন তাঁর প্রথম ফিচার ‘মাত্রভূমি’, এমন এক সময়ের আখ্যান, যখন ক্রমাগত মেয়েসন্তান মারতে মারতে গ্রাম কে গ্রাম শ্রেফ পুরুষ ছাড়া কিছু নেই। পুরুষ মঞ্চে ঘাগরা পরে নারী সেজে অশালীন নাচে। ব্লু ফিল্মের আম-আসর বসে। বাধ্যতায় চলে র্যান্ডম সমকাম, গোয়ালে ঢুকেও

দরজা দেয় কেউ। কাহিনির কেন্দ্র-পরিবারে বাপ পাঁচ ছেলের বিয়ের জন্যে হন্যে, দশ-পনেরো বছরেও কোথাও খুঁজে পায় না একটিও মেয়ে। শেষে বাতকন্মপরায়ণ পুরুত ফট করে সন্ধান পায় এক স্ত্রীজাতীয় মনুষ্যের, বাপের ব্রেনবাজিতে পাঁচ ভাইয়ের সঙ্গেই বিয়ে ঠিক হয় তার। ক্যালেন্ডার এনে ভোগের দিন বাঁটোয়ারা চলছে যখন, হুপ্তায় দুটি দিন এক্সট্রা। কে নেবে? সহসা পিতা ফোঁৎ ফোঁৎ কেঁদে ফেলেন। এত কষ্টে কোলেপিঠে বড় করলেন পঞ্চপুত্র, তাঁর কথাডা এক বার ভাবলে না এরা? ফলে প্রথম রাত্রে মজা মারার অমোঘ বরাত খোলে তাঁরই। রুটিন চলতে থাকে। প্রত্যেকেই তার প্রাপ্যটি আষ্টেপৃষ্ঠে নিংড়ে নেয়, নাগাড়ে নিম্নাঙ্গসেবা উগরে দিতে দিতে পাশ ফিরে পড়ে থাকে জীবটি।



মাক্রভূমি : পিতৃ(তন্ত্র)ভূমির গালে মহান খাবড়া

যে সূক্ষ্মতায়, অভিনেত্রী টিউলিপের অনঘ গ্রীবা ছাড়া আর এতটুকু না-উন্মুক্তিতে, ন্যূনতম সেক্স-কাজ না দেখিয়ে, দাঁতপেয়া লালচোখো জানোয়ারের দীর্ঘ, দীর্ঘ প্রহার, সত্তা-ধামসানো অপমান বোঝানো হয়, বাহবা। হ্যাঁ, এক সময় মেয়ে পালাতে চায়, দলিত শ্রেণির কিশোর-চাকরটির সাহায্যে। ধরা পড়ার পর তার একটি ননী-পা শেকলে বেঁধে, চিৎ করে ফেলে রাখা হয় গোয়ালে। পাশেই গরুর প্রত্নাবশেষে মূর্ছা ভাঙে তার। ‘খাক, গোবর আর গোমুত খাক’, বলেন শ্বশুর। তাঁর অবশ্য রাতে ধুতি তলপেট অবধি তুলে বাথানে ঢুকতে তর সয় না। ও দিকে দলিত ভৃত্যকে মারার প্রতিশোধে ঝাড়া প্রোথিত করতে নিম্নবর্ণও নিয়মিত গোয়ালে চড়াও হয়ে প্রাণীটিকে ভোগ করে যায়। চলে উপর্যুপর, বারোয়ারি মাংস-ধর্ষণ। আবার। আবার। গ্রীষ্ম যায়, বর্ষা, বসন্তও। গা ভর্তি ঘা, দাঁত হলদে, উঠতে বিষব্যথা, পেট প্রসবে ফুলে ঢোল, তবু শেকলবাঁধা পায়ে কেউ এক লাথি মারলেই প্রায় অচেতন অবস্থাতেও শাড়ি তুলতে শুরু করে বাধ্য অনুগত গাভী। মণীশ ছবির শেষে ষাটের দশকের গা-জোয়ারি আশাবাদ আর কিছু সরলীকরণ দেগে দিলে কী হবে, তাঁর স্বাক্ষর মহারথীর। পুরুতের শরবতে নিজের বর্জ্য তরল মিশিয়ে দিচ্ছে দলিত নফর, এ দেখাতেও তাঁর ক্যামেরা কাঁপে না, আবার যে সীমাহীন হিংস্র দৃশ্যে আমরা শুধু দেখি নাচনেওয়ালি স্বামী ঘাগরা পরে ভোগ করতে এসে জোর করে কালি দিয়ে গোঁফ আঁকছে স্ত্রীর ওষ্ঠের উপর, তার মিতভাষ, চকিত আঘাত সত্যজিতোচিত। অ-বাস্তব প্রেক্ষিতটি মোক্ষম বেছে নিয়ে বাস্তবকে বহু গুণ জোরে ফুটিয়ে দেওয়া, পুরুষতন্ত্রের এ গাল-ও গাল অবিরাম থাপ্পড় মণীশের জাত চেনায়। পরের ছবিটি ভারতে মুসলিমদের কী নজরে দেখা হয়, তা নিয়ে। চাবুকের জন্য তৈরি?

২৪ জুলাই, ২০০৫

মুখ্য হতে দুঃখ কই ?

গাঁকগাঁক গান বাজিয়ে গেরুয়া রঙে স্যাভো গেঞ্জি ছুপিয়ে ডিজাইনার-বাঁক কাঁধে তারকেশ্বর-জার্নি শেষ, হ্যাঁ 'ধুম মচা দে'-র সুরেও শিবসংগীত তৈয়ার, অবশ্য আশা ভৌসলে-র 'একটু বোসো চলে যেও না'-র টিউনে 'সত্যেন্দ্র ছাত্তু খেতে ভুলো না' তো আমাদের রঞ্জিত রাখছেই। শৈব না হোক আমরা হোলসেল 'সইব' বটেক, প্রথম সপ্তাহেই আমির খানের গুঁফো অবতার যাতে দেড়া লগান তুলে নিতে পারেন, তাই আমরা এ-ও জেনে গেলাম তাঁর হালের সঙ্গিনী কিরণ রাওয়ার শৈশব কেটেছে হাংগারফোর্ড স্ট্রিটে, রিয়েলি, ওয়াও, এ পোড়া কলকাতায়। আমির আবার ইতিহাস-মিথ-মিথ্যের কুয়াশাবপনের সাফ অজুহাত শিখে এসেছেন, 'আপনারা তো পড়েছেন সব ইংরিজিতে লেখা ইতিহাস'। বাহবা। ইদানীং এ প্রাচ্যগিরি হরদম জমেছে, কেউ টাল সামলাতে না পেরে সতীদাহকেও মহতী প্রথা বাতলাচ্ছেন (ও তো ইংরেজরা রদ করেছে। তার মানে নির্ঘাৎ উহাতে আমাদের সনাতন ঐতিহ্যের মৌলিক চেতনার প্রকাশ ঘটছিল)। পাশ্চাত্য দৃষ্টিকোণই একমাত্র গ্রাহ্য, নির্যাস নহে। তা বলে ফট করে নয়া স্বাধীনতা-সংগ্রামে প্রাচ্যের এলি-তেলি ময়দানে নেমে পড়ে নিরক্ষর বাইসেপে তেল থাবড়ে হিষ্টি শেখাবে, ভাবলে হেঁচকি ওঠে। ও দিকে বৃদ্ধস্য দ্বিতীয় ইনিংসে তুঙ্গলেহী বচ্চন তো তাঁর সুপারহিটতম ঘনঘটার সিকোয়েল নিয়ে ফিরেছেন, এ বার এক রকম চকচকে জ্যাকেট পরে আরও বেশি বন্ধুত্বপূর্ণ, এক্সট্রা আলাপী, যেমন ধরুন আপনি কোথায় থাকেন শুনে উনি ভারী মন দিয়ে ভাববেন ওই গলিতে ওঁর চেনা কেউ... নাঃ ঠিক মনে পড়ছে না, যাক গে, পরের প্রশ্ন। আর হ্যাঁ, আমরা 'পরিণীতা'য় আইটেম গার্ল রেখাকে দেখে 'অ্যা! শেষে তুমিও মোটালে এ ভরা কোটালে' গেয়ে উঠে যে ট্র্যাজিডি ওগরালাম, হায় অমন অলৌকিক রূপসায়রেও সময়ের চোনা, সে কিছু আজব নহে। কিছু অতিপঙ্ক বিজ্ঞানসাহেবের দাপটে মিশরের ফারাও তুতেনখামেনের বিউটি-খ্যাতি অব ঘোর ঝামেলায়, তাঁর মমি থেকে মুন্ডুটি কম্পিউটার ফলিয়ে পুনর্নির্মাণ করার পর দেখা যাচ্ছে, খুতনিটা নাকি তেমন সুবিধের নয়। ভাবুন, মৃত্যুর সাড়ে তিন হাজার বছর পর আচমকা রূপের সমালোচনা শুরু হলে কারও মাথা ঠিক থাকে? অতএব হে দি দু, ষাট পেরিয়েছে বলে লিপিস্টিক ভুলে দিব্যি বসে থাকলেন, উঁহ। সায়েন্সের ছাঁচড়ামিতে ছশো ষাটেও আপনাকে নিয়ে পেটফাটা হাস্য ঘটতে পারে। তখন 'রূপে তোমায় ঝোলাব না' গাইবার দায় আপুনকা ঘাড়ে! ও, বাঁচা-মরার কথায় মনে এল, ব্রিটিশ ফিউচারোলজিস্ট আয়ান পিয়ার্সন দাবি করলেন, ক'দিন বাদে মানুষের গোটা মস্তিষ্কটাই কম্পিউটারে ডাউনলোড করে নেওয়া যাবে, অর্থাৎ আপনার হাত-পা মরুক গে, ব্রেন বেঁচে থাকবে চির দিন। কল্পনা করুন অশরীরী সেই অস্তিত্ব, সকালে উঠলেন, মানে আপনার

প্রথমে আপনাকে অন করল আর কী, তার পর চুলকোবার জন্য গা নেই, খাওয়ার জন্য হাঁ নেই, খোঁটার জন্য নাক নেই, চুল ছেঁড়বার টাক নেই। অথচ ভেবে চলেছেন হুবহু পাপচিহ্নাগুলি, টেনশন হচ্ছে গের্ডেটা বাড়ি না ঢুকলে, ইচ্ছে যাচ্ছে হেদুয়া বেড়াতে। খিদে পর্যন্ত পাওয়ার জো নেই, মৃত্যুভয় নেই, বাথরুম নেই, ও দিকে উঁই উঁই অফিসের কাজ আসছে। ব্রেন খাটাতে পারছেন যে! লাখো মড়াকান্না, শত ডিপ্রেসন, মেট্রোর খার্ডতম রেলও শান্তি দিতে পারবে না। বাড়তি ওয়ার্নিং: তখন জমানা অন্য, কেলাস সেভেনের নাতনি যদি সামনেই মিষ্টুনি বেলেল্লাপনা করে, বেগড়বাই করবেন না, তুরন্ত শাট ডাউন করে দেবে।



স্টিভ লেভিট, শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতিবিদ, মাথায় দুইবুদ্ধি সর্ব ক্ষণ, 'ফ্রিকোনমিক্স' নামে বই লিখলেন। ইনি এক সময় সমীক্ষা করে দেখিয়েছিলেন, নব্বইয়ের দশকে অ্যাবরশন আইনসিদ্ধ হওয়ায় অপরাধের ঘটনা কমে গিয়েছিল। ওঁর সিদ্ধান্ত: গর্ভপাত আইনসিদ্ধ হতে সমাজে আনাকাঙ্ক্ষা ('unwantedness') কমে গেল, ফলে কমল অপরাধপ্রবণতা। শুনে পণ্ডিতদের সৌন্দর্যন পরিমাণ ভুরু কুঁচকে উঠেছিল, আন্দাজ সহজ। এর পর আবার রিসার্চ করে বললেন, সুমো-কুস্তির সব ম্যাচ গট-আপ; এক জন মার্কিন বাচ্চার মৃত্যুর সম্ভাবনা বন্দুকের গুলি খেয়ে যতটা, সুইমিং পুলে ডুবে তার ১০০ গুণ! এই বইটিতে একটি অধ্যায় আছে, 'ড্রাগের চোরাকারবারিরা কেন এখনও মায়ের সঙ্গে থাকে?' শিকাগোর রাস্তাঘাটে ড্রাগ-চক্রে ঘুরে ঘুরে স্টিভ গবেষণা করেছেন তাদের সংগঠনের শ্রেণিবিন্যাস নিয়ে, দেখেছেন, এ একেবারে আমাদের চেনা কর্পোরেটের মতো, ওপরতলারা ফাটিয়ে দিচ্ছে টাকা উড়িয়ে, আর যারা বোড়ে, জীবন বিপন্ন করে ব্যবসা করছে, তাদের বাড়ি ভাড়া করার ক্ষমতা নেই। 'এখানে চলছে একটা পূর্ণ প্রতিযোগিতা, অথচ কোনও লেবার মার্কেট আইন নেই, বিপদে ক্ষতিপূরণ নেই, এই অদ্ভুত বাজারটাকে স্টাডি করব না?' এত ভয়ানক বুদ্ধিমান হয়ে এ সব উদ্ভট ব্যাপারে মাথা ঘামাচ্ছেন কেন, উত্তরে: 'অর্থনীতির মূল বিষয়: ব্যক্তির ব্যবহার। একটি পরিস্থিতির নির্দিষ্ট শর্তগুলোর মুখোমুখি হয়ে, সবচেয়ে ভাল ফল পাওয়ার জন্য এক জন কী সিদ্ধান্ত নেবে— এটাই অর্থনীতি।' ব্যাখ্যা অনুযায়ী অবশ্য প্রেমে লবডঙ্কা থেকে রোলে কাঁচালঙ্কা অবধি সবই ইকনমিক্সচার। বই বেস্টসেলার, এখন নোবেল কমিটি নড়ে বসলে হয়।



পল ম্যাকার্টনি বললেন, বিটল্‌স-এর গান তৈরির মূল প্রণোদনা ছিল টাকা করা। তাঁরা বলতেন, 'চল, এ বার একটা সুইমিং পুল লিখি!' কিংবা অটালিকা। যাঁরা শিল্প করলেই নাগাড়ে দৈব তাপবিদ্যুৎ বা নীলাভ ছাঁকার কথা বলে থাকেন,

কিংবা ‘কবিতা একেবারে অক্সিজেন রে ভাই, না লিখে বাঁচি না’ টাইপ, তাঁদের প্রতি ‘পারি, তাই করি’ গোত্রের এই খাবড়াটি তীব্র ওয়েলকাম। মনে পড়ে, স্টিফেন স্পেন্ডার এক বার এক গদগদ ‘কবিতা কাকে বলে?’-র উত্তরে বলেছিলেন, ‘এই রে, গত হপ্তায় একটা চমৎকার উত্তর ভেবে রেখেছিলাম। বেমানুম ভুলে গেছি!’

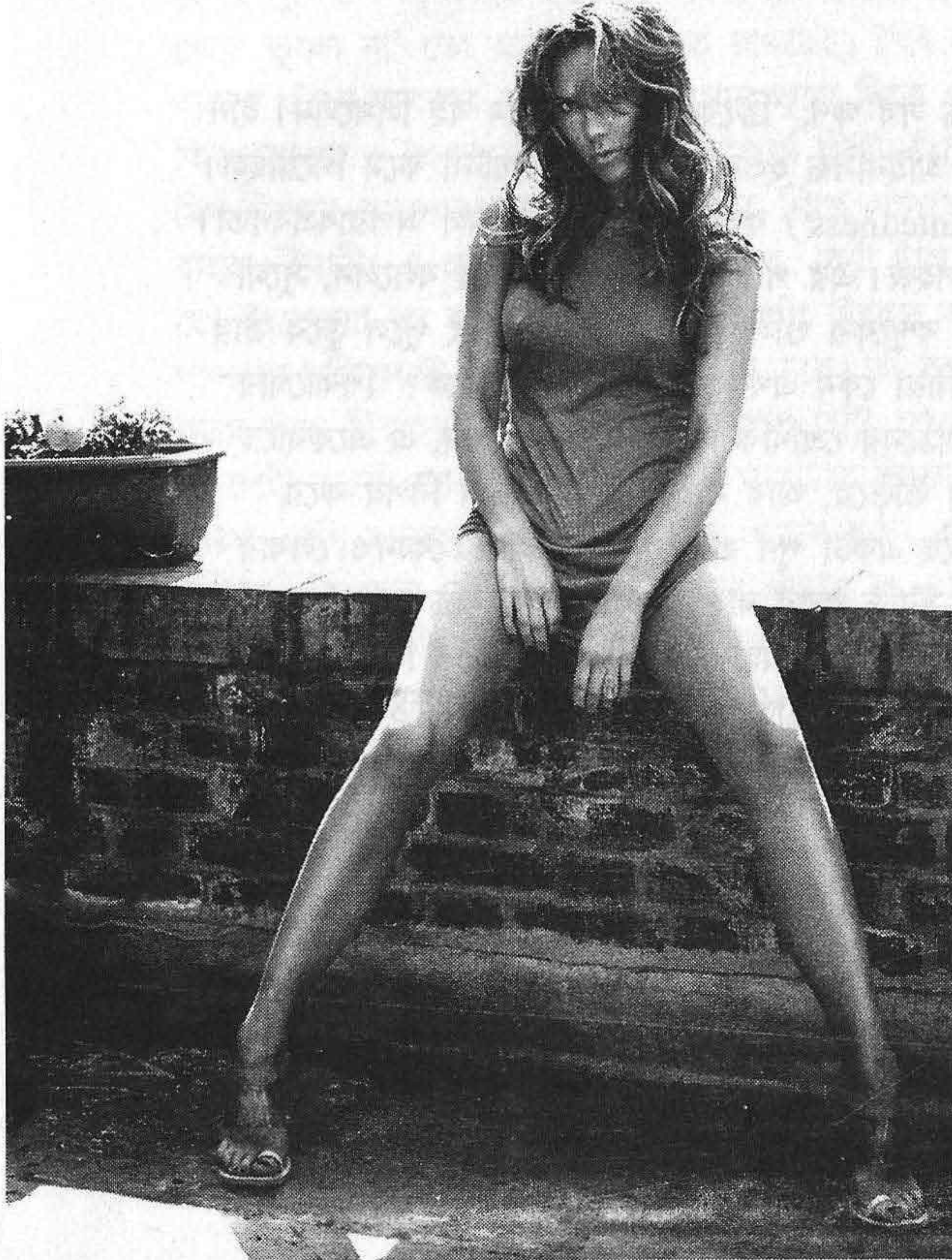


ভিক্টোরিয়া বেকহ্যাম (পূর্বাশ্রমে পশ স্পাইস) এক স্পেনীয় পত্রিকাকে সাক্ষাৎকারে জানালেন, তিনি সারা জীবনে কক্ষনও একটাও বই পড়েননি! (অথচ মহিলা ক’বছর আগে ৫২৮ পাতার ঢাউস আত্মজীবনী লিখেছেন, সে বেস্টসেলারও

হয়েছে)। বাপ রে! কী সুমহান নির্লজ্জতা। গভীরতাকে কী তীব্র কানমলা! এক সেলিব্রিটি তাঁর ইমেজ এতটুকু ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ভয় না নিয়েই এ কথা বলতে পারেন একমাত্র এমন বিশ্বে, যেখানে অধিকাংশ জীবই পূর্ণ নিব্বই ও গর্বিত গবেট। যেখানে, বই বলতে লোকে বোঝে ম্যাগাজিন, ক’দিন বাদে ম্যাগাজিন বলতে বুঝবে পিস্তল। আমাদের চতুর্দিকেও হুবহু এই কাটিং যুবাযুবি ভ্রাম্যমাণ, মুখ দেখলেই বোঝা যায় সম্পন্ন গাধা, গাড়িতে ক্রমাগত ধক্কাস-ধক্কাস তাদের সংগীতচেতনা, সেলফোনে এস এম এস অবধি সৃষ্টিশীল রচনার দৌড়। রাজদীপ সরদেশাই বলেছেন পেজ থ্রি এসে পেজ ওয়ান-কে গিলে খাচ্ছে দ্রুত, তেমনই চটকদার আস্তরণবাদ পৃথিবী নামের এই অজ গাঁ-টিকে একেবারে গা রি-রি করা গঞ্জে রূপ দিচ্ছে। আক্ষরিক অর্থে বইয়ের এন্তেকালও এ জন্য কিঞ্চিৎ দায়ী। বই হাতে নিয়ে, বুকে রেখে, শুঁকে, ছিঁড়ে, ভাঁজ ফেলে আমরা তার সঙ্গে যে তীব্র গতরলগ্ন সঙ্গ করেছি, তাকে কি স্ক্রিন থেকে চেটে পাওয়া যায় বাপধন! অথচ হা, টেক্সাস বিশ্ববিদ্যালয়ের আভারগ্যাজুয়েট লাইব্রেরির ৯০,০০০ বই অন্যত্র বিলিয়ে দেওয়া হল। ২৪ ঘন্টার ডিজিটাল লাইব্রেরি অর্থাৎ কম্পিউটার খুলে দেওয়া হবে। ভাল লাগছে না রে তোপসে।

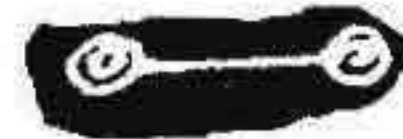
২১ অগস্ট, ২০০৫

পশ স্পাইস : মশলাদার মূখ্যমি

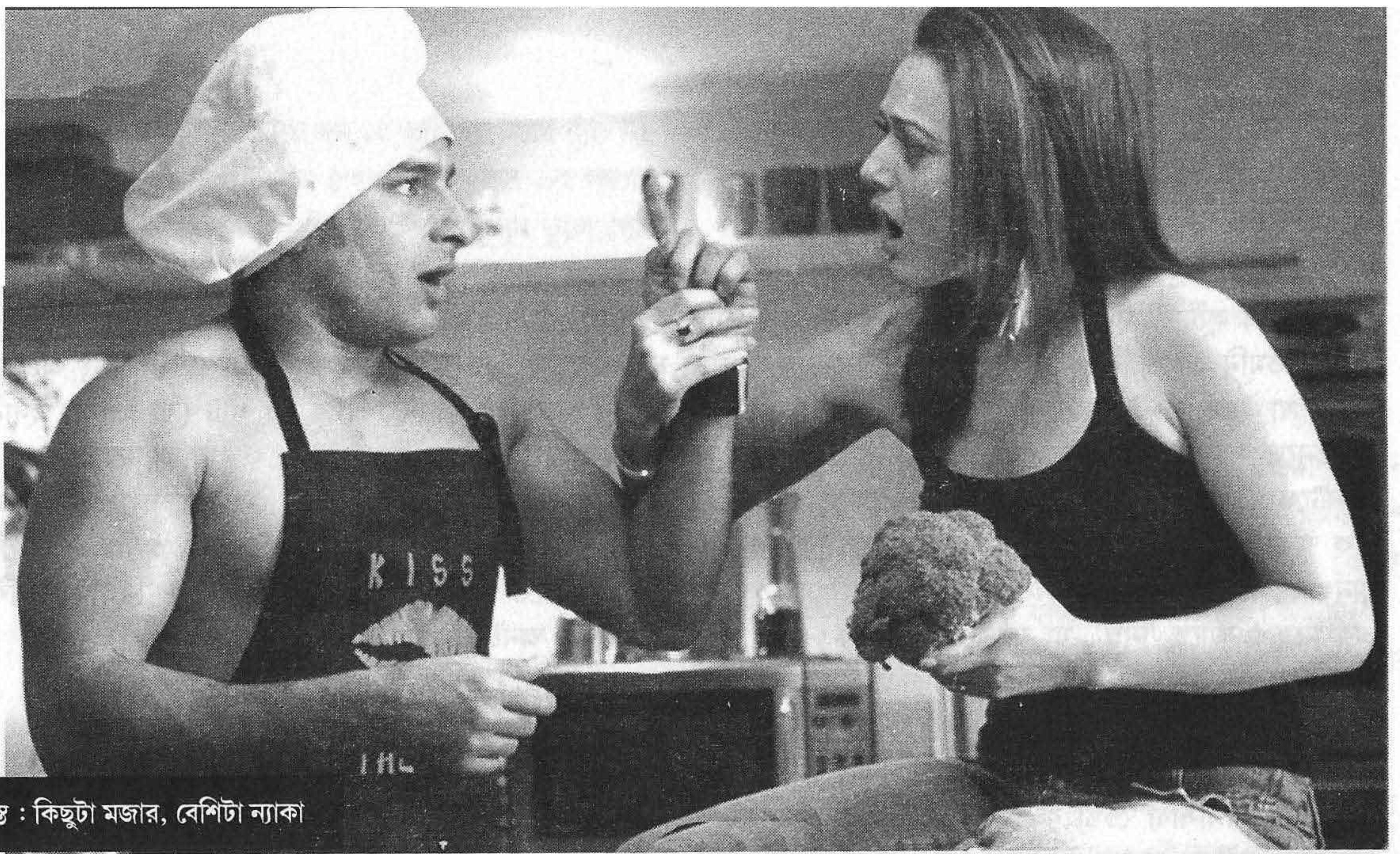


ই ও হে সা ধ্য খো লা

‘বেওয়ারিস লুচীর ময়দা বা তইরি কাদা পেলে যেমন নিষ্কর্মা ছেলেমাট্রেই একটা না একটা পুতুল তইরি করে খালা করে, তেমনি বেওয়ারিস বাঙ্গালী ভাষাতে অনেকে যা মনে যায় কচ্ছেন...’— হতোমীয় এই আফশোস ইদানীং অপ্রতুল, কারণ যা ইচ্ছে তা-ই করার বেপরোয়া কলজে হতেই শনৈঃ শনৈঃ গজাবে সঞ্জীবনী, অথচ সে গাঁট (বা গাট্‌স) ইদানীং বঙ্গতনুতে সম্ভবে না। ময়দা মোচড়ানোর ন্যায় অচানক নতুন শব্দপ্রতিমা চালিয়ে দিতে হবে বেতোয়াক্কা, তবে না ফ্লিনটফের রিভার্স সুইং-এর মতো ছোবলাবে ভাষাখান। তাবড় বংসাহিত্যিক যা পারতে মাথা কোটেন, করে দেখালেন এক অত্যাশ্চর্য কপিরাইটার, এক টাউনশিপের বিজ্ঞাপনে ‘নিম্নবিত্ত’র বদলে লেখা হল ‘সাধ্যবিত্ত’! কী অসামান্য শব্দটি অনুধাবন করুন। সবাই জানেন কানাকে, খোঁড়াকে, গরিবকে ঐ ঐ বলতে নেই। তাই শাক দিয়ে ঢেকে ‘নিম্নবিত্ত’। কিন্তু এর মধ্যেও আছে ‘নিম্ন’, যা স্পষ্টতই ঋণাত্মক। কাউকে যখন আর্থিক অনটনের জন্য ‘নিম্নবিত্তদের জন্য’ লেখা সারণিতে ফ্ল্যাটের দাম দেখতে হয়, উদাত্ত হীনম্মন্যতা চেপে রাখা সোজা? কুশলতাটা দেখুন, যিনি বিজ্ঞাপন-প্ল্যান জানেন, বুঝছেন যে এর আগেই ‘মধ্যবিত্ত’ কথাটা থাকবে। তক্ষুনি মিলিয়ে লিখলেন ‘সাধ্যবিত্ত’। একলা একলা ‘সাধ্যবিত্ত’ মানে বোঝা যেত না হয়তো, কিন্তু এ বার পরিষ্কার হয়ে গেল। এবং দ্যোতনাটি কী মিষ্টি! ‘যাঁর বেশি নেই, কিন্তু যিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করছেন!’ তাঁর বিত্ত কম এই অপমানটা করা হল না, আবার তাঁর আরও বিত্ত সংগ্রহের প্রাণপাত চেষ্টাকে সম্মান জানানো হল। এ প্রতিভাকে লাখ স্যালুট। এ বার যদি এই ধাঁচে কিঞ্চিৎ ব্যাকরণ গুলিয়ে বোকাকে বলি ‘সাধ্যমেধা’, ক্যাবলাকে ‘সাধ্যস্মার্ট’, ব্যান্ড-গায়ককে ‘সাধ্যসুরো’, কী অপূর্ব একটি বন্ধুত্বপূর্ণ তত্রাপি অপ্রিয়সত্যভাষী সিরিজ, যাকে বলে পলিটিকালি কারেক্ট শব্দনিচয় জন্মাবে! ‘মোটা’কে ‘হরাইজন্টালি চ্যালেঞ্জড’, অন্ধকে ‘ভিসুয়ালি চ্যালেঞ্জড’ বলে ওঁয়ারা গর্বে ফাটছেন। আমরা আরও দুর্ধর্য: ‘কত ভালবাসো ডার্লিং?’ ‘সাধ্যপ্রেম’! উরিঃ।



বাংলা আজ যা ভাবে, ভারত ভাবে সে-ই বেস্পতিবার, অতএব কোন পাশ্চাত্য ফিল্ম থেকে স্থায়ী ছবিটি খাবলানো হবে, সে নির্বাচনে বং-মগজ সুপার-সারফ। তাই সুব্রত সেন টেলিফিল্ম করতে গিয়ে মার্কিন না, বিলিতি না, ভূবিখ্যাত ফরাসি ছবি ‘এমিলি’কে ক্লোনায়িত করলেন। বলেকয়েই, ছবির নাম ‘এই মিলি’। সে জিনিস কীর’ম হল, থাক বরং। ফাস্ট বয়ের খাতায় ডেসপারেট উঁকি মেরেও টুকলিরামকে তো ব্যাক পেয়ে বিড়ি ফুঁকতে হয়। মূল ছবির নায়িকা অদ্রে



সালাম নমস্ते : কিছুটা মজার, বেশিটা ন্যাকা

তোতু পরির ন্যায় পবিত্র। আর অপরাজিতা ঘোষ দাশ-কে চরিত্রের অসামান্য সারল্য জ্ঞাপন করতে যে মানসিক প্রতিবন্ধী মার্কা আচরণ করতে হচ্ছিল, আধো আধো শুদ্ধশুচি ভাবগতিক উথলে, কাকপাখির মতো ইতিউতি তাকিয়ে, দুঃখের। এর চেয়ে কিন্তু হলিউডি ছবি ‘নাইন মাস্‌স’-এর থিমটুকু নিয়ে বেশ তরিবৎ করেই গঠিত ‘সালাম নমস্ते’। যদিও প্রথমার্ধের ধাঁ-স্মার্টনেস শেষে সেই চেনা গলি ও গলতা বেয়ে মাখোমাখো গদগদে ভারতীয় সিনি। ছবিতে ‘লিভ-টুগেদার কি জয়’ নিয়ে যে ‘প্রোগ্রেসিভ’ রইরই, অর্থহীন। ধক থাকলে, আমাগো দেশে লিভ-টুগেদারের সমস্যা নিয়ে ছবি করতে হত। তা না, পুরো ব্যাপারটা নিয়ে ফেলা হল অস্ট্রেলিয়ায়। আরে, মেলবোর্নে সহফুর্তিতে বখেড়া কই? রাসেল বলেছিলেন, পাপ ভৌগোলিক। বাগুইহাটিতে লিভ-ইন করো না, বুঝব। গুজগুজ, খিলখিল, ঘিরে ধরে জবাবদিহি, ‘এ সব কী হচ্ছে দাদা? বিয়ে না কল্লে যে ওনাকে বউদি বলে ডাকতে পারচি না আমরা!’ তবে, দুটো কাণ্ড এ ছবিতে অত্যাশ্চর্য, ফিলিম-ইতিহাসে বাপের জন্মে ন দেখছঁ। এক, প্রেগন্যান্ট নায়িকার নিজ পেল্লায় পেট আনকোরা মুদ্রায়

আকঁড়ে ও হাঁকড়ে ধুমাধাড় ধেইনেত্য। আর দুই: না, লাস্ট সিনে গুলি খেয়েও মৃত্যু স্থগিত রেখে হেঁচকি তুলে লেকচার নয়, এ ছবিতে নায়িকা, নায়কের অনুরোধে প্রসব স্থগিত রাখে! সইফ প্রোপোজ করবেন বলে প্রীতি হাসপাতালে ছটফট করতে করতেও ঝটিতি শান্ত, দু'মাইল লম্বা নিবেদন শোনে, চোখে জল টলোটল, তাল্পর আংটি রিসিভ, চুমোচুমি, ফের লেবার পেন-এ ন্যস্ত। ডাক্তার নার্সরাও চুপ, ন্যারেটিভের প্রয়োজনে বাচ্চাটি 'পজ' মোড়ে আছে, সর্ববিদিত।



মাই ওয়াইফ'স মার্ডার-এ বরং সত্য অনেক খরখর, এক নিরীহ ভালমানুষ স্বামী আর না পেরে নীচ, খ্যাচরখ্যাচরাণী বউকে সামান্য মারামারির সময় ঠেলতেই স্লিপ খেয়ে মহিলার মাথা আসবাবের কোণায়, ডেথ। আপাত-গল্প এ বার নায়ক কী ভাবে লুকোচ্ছে পালাচ্ছে, কিন্তু এমন অসামান্য আঁচড়ে তদন্তকারী পুলিশের তীব্র অসুখী দাম্পত্য, নায়কের অ্যাসিস্ট্যান্ট ও তার বয়ফ্রেন্ডের ঈর্ষাস্ফুরিত লিভ-ইন দেখানো হয়, চার পাশের লাখো সম্পর্কের মধ্যেই যে একটি 'হত্যা'-র সম্ভাবনা আমরা-পেনামরা সহ ছায়া ফেলে অবিরত ওৎ: স্পষ্ট। এবে স্মর্তব্য সুইডেন-এর নারীবাদী (এবং শুধু নারী-সদস্যবিশিষ্ট) রাজনৈতিক দল 'ফেমিনিস্ট ইনিশিয়েটিভ'-এর এ সপ্তাহের ঘোষণা: ক্ষমতায় এলে, বিয়ে ব্যান! কারণ 'বিয়ের মূল প্রণোদনা প্রেম নয়, স্বত্বাধিকার। অতএব আমাদের দাবি বিয়ের বদলে একটা সহাবস্থান-আইন, যা লিঙ্গবৈষম্যকে প্রশ্রয় দেয় না।' তবে এর চেয়েও বহু গুণ দড়াম: তাঁরা চাইছেন, 'এই সম্পর্ক দুজনের অধিক মানুষকে একসঙ্গে থাকার অনুমোদন দেবে'! অকল্পনীয়! এক-স্টেডিয়াম তালির যোগ্য। বাধ্যতামূলক মোনোগ্যামির মধ্যে নিহিত যে অন্যায় দাবি, যে ছাপ্পা দেগে দেওয়া 'প্রপার্টি প্রপার্টি' গন্ধ, তার বিরুদ্ধে এই প্রথম কোনও পার্টি রুখে দাঁড়াল। বহুবিবাহ রদ হয়েছে শ্রেফ সম্পত্তি বন্টনের সুবিধার্থে। এ মানবাধিকার হরণ বই কিছু নয়। আমি যদি দু'জন মেয়েকে হৃদয় নিংড়ে ভালবাসি, এবং তারা আমায়, এবং এই পুরো ব্যাপারটায় পারস্পরিক লুকোছাপা ও আপত্তি না থাকে, তবে সবাই মিলে একসঙ্গে থাকার আনন্দ কেড়ে নেওয়ার অধিকার রাষ্ট্রকে কে দিল? না, এর মানে পুরুষের বিশেষাধিকার বা হারেম রাখার লাইসেন্স নয় (সেখানে প্রভু-দাস সম্পর্কের চাবুক-বাচক সম্পর্ক), এর মানে তিন/চার/পাঁচ/nজন সম্মত প্রাপ্তবয়স্কের একসঙ্গে জীবন যাপনের (হ্যাঁ, এবং যৌন সম্পর্ক পালনের) অধিকার। মহাভারত সামান্য ভুলে, ধরুন, দ্রৌপদীর ইচ্ছে, তিনি পাঁচ জনের সঙ্গে থাকবেন। পাঁচ জনেরও ইচ্ছে তা-ই। পুরোটা অবহিত হয়ে যদি সকলে মিলে এই সিদ্ধান্ত নেন, তা হলে কে তুমি কে-এ-এ তুমি আইন করে সে আনন্দযজ্ঞ ভেঙে দিচ্ছে? হ্যাঁ, ঝগড়া হলে কাক উড়বে চিল পড়বে, ক'দিন বাদে কে কাকে বেশি প্রেমেছিল তা নিয়ে মহাপ্রস্থানে মুচ্ছে, হয়তো ক'দিন পর কারও গলায় অদৃশ্য বকলশ কারও অনামিকায় নির্দিষ্ট সোহাগ-অঙ্গুরী, সম্পত্তি-কলহেও বিড়লা-ফ্যামিলি তুশু, কিন্তু জটিলতার ভয়ে তুমি তো মানুষের অবর্ণনীয় সুখের তোরণ বুজিয়ে দিতে পারো না! বুঝতে হবে, জেহাদটা 'বাধ্যতা'র বিরুদ্ধে। ঔচিত্য হতে

উৎসারিত মানব-মানবী সম্পর্কের চেয়ে অমানবিক কী? তাই জটিলতা আসলে কম: দু'জন খুব ভালবাসলে, যৌথ ব্যবস্থাপনা ছেড়ে বেরিয়ে এসে ঘর বাঁধবে। (বা পাঁচ জনের সংসার ছেড়ে বেরিয়ে আসবে তিন জন)। দু'জনের বেশি থাকতেই হবে, কেউ দিব্যি গালছে না। বলছে, ইচ্ছে হলে দু'জনের বেশিও থাকা যাবে। আর আমোদ! এ ক্ষেত্রে কৃষ্ণ-উদাহরণ ভুল, পাণ্ডবরা সিরিয়াল মোনোগ্যামি-ই অভ্যাস করতেন, যুদ্ধিষ্ঠিরের রুটিন চলাকালীন অর্জুন ঢুকে পড়লে হা। কিন্তু এখানে যে সোহাগ-অর্জি ও লাখ শয্যাসম্ভাবনা নিয়ত পারমুটেশন, লোকে প্রগাঢ় হ্লাদে দিনভর আনমনে লাজুক হাসবে। (শিশুদের নিয়ে ভাববেন না, তারা গোঁড়ামি বগলে নিয়ে জন্মায় না, গোড়া থেকেই এই মডেল দেখলে এবং বড় হয়ে গুচ্ছ বন্ধুর বাড়িতেও ঘটতে দেখলে, এটাকেই স্বাভাবিক ভাবে নেবে)। হ্যাঁ, এর আগে এ রকম বেশ কিছু চেষ্টা হয়েছে, কমিউন ঘটেছে, পর্নোগ্রাফি-লেখিকা ইম্যানুয়েল আর্সান বহুদিন তত্ত্ব জপছেন, ধোপে টেকেনি। সে তো বিপ্লবও টেকেনি। তাই বলে চেষ্টা হবে না? দাদা, এমত ইউটোপিয়া সবেগে বর্জিলে মানুষের অধরা মাধুরী স্টোর করবেন কোথায়? নয়া থিমের ঘুঁটের প্যাভেলে?

১৮ সেপ্টেম্বর, ২০০৫

খু চ খা চ গ প শ প

না ন্না, দুগ্ধার দিব্যি, আপনার এই পোস্ট-পুজো ফুরফুরে আরামে ভাংচি দিতে কোনও গিটপাকানো গদ্য নয়, প্রচলিত মতের ঠ্যাঙাড়ে বিরোধিতা নয়, চার হাত-পা তুলে যৌনতার সাপোর্ট নয়, স্রেফ সাদা ও সিধে খুচরো গপশপ। পুজোর স্টক ক্লিয়ারেন্সের মতোই, পুরানা কিছু খবর, কিন্তু উরিমা, ধারে-ভারে বিলক্ষণ কাটিতং: জাপানে প্রকাণ্ড বিখ্যাত হয়ে গেল কঙ্কাল-খেলনা ‘বোনি’, কাগজ দিয়ে তৈরি এই মানুষপ্রমাণ কঙ্কালটিকে অংশ জুড়ে জুড়ে বানাতে হয়, ডাকাত-রানি সীমা পারিহারকে নিয়ে ছবি হয়ে গেল ‘উভেড’, এ দিকে লেস্টার ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে ছবি গটমটিয়ে গেলেও সীমাকে পাসপোর্ট দিতে ন্যাজে-গোবরে করল ভারত সরকার, লন্ডনে চালু হল সি-থ্রু রুকস্যাক, কারণ দাড়ি মানেই যেমন নিশ্চিত টেরিস্ট, কে না জানে রুকস্যাক মানেই বোমাভর্তি থলে, বামিয়ানের যে গুহাগুলিতে বুদ্ধমূর্তি ছিল, সেখানে বুদ্ধের রঙিন লেজার আলোকমূর্তি ‘বিম’-এর সাহায্যে দেখাবার পরিকল্পনা করলেন জাপানি শিল্পী হিরো ইয়ামাগাতা, এতে ‘আলোকবুদ্ধ’ নামে এক নতুন বিগ্রহ-ধারণা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে, সমীক্ষায় প্রমাণিত হল বেঠোফেনের ধীর লয়ের সিম্ফনিগুলো শ্রোতার শারীরিক পরিবর্তন ঘটায়, রক্তসঞ্চালনের গতি কমিয়ে দেহপট শান্ত করে, যাতে স্ট্রোক বা হার্ট অ্যাটাকের সম্ভাবনা কমে যায়, অ্যাঙ্গিনে প্রচারিত: শিল্প ফর হার্ট’স সেক, ভ্যালেন্টিনো নামে এক ফ্যাশন ডিজাইনার সরাসরি বললেন, জুলিয়া রবার্টস বা ক্যামেরন ডিয়াজ-এর মতো আধুনিক হলিউড-নায়িকারা যা পোশাক পরে ঘুরে বেড়ান, মনে হয় চালচুলোহীন ভবঘুরে, উস্কোখুস্কো প্লাস্টিকের-ব্যাগ কুড়ানি ভিখারিণী, যাক বাবা আমরা তো ভেবেছিলাম হাকুশ নোংরা ন্যাকড়াজড়ানি হওয়াই পশ্চিমি স্মার্টনেস, বিশ্বের বৃহত্তম স্টুডিও কমপ্লেক্স হিসেবে গিনেস বুক-এ ঢুকে গেল রামোজি ফিল্ম সিটি, নিউজিল্যান্ডে তিরিশ বছর ধরে ১০৩৭টি বাচ্চার উপর সমীক্ষা চালিয়ে দেখা গেল, যে যত বেশি টিভি দ্যাখে, তার বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে পাওয়া বা ডিগ্রি পাওয়ার সম্ভাবনা তত কম, হয় এর জন্য আবার সমীক্ষার দরকার কী চাড্ডি তিতিবিরক্ত বাপ-মা ধরে নিয়ে গেলেই হত, ব্র্যাড পিট-এর বিচ্ছিন্না বউ জেনিফার অ্যানিস্টন টি-শার্টে মহাত্মা গান্ধীর ইয়া লম্বা লম্বা কোটেশন লিখে ঘুরে বেড়ানোর অভ্যাস গড়লেন, এ বার যদি একটা গোটা চ্যাপটার পছন্দ হয় তবে টি-শার্ট গোড়ালি অবধি লম্বা হবে না গান্ধীর লেখাকে এস এম এস-সংক্ষেপ রূপ দেওয়া হবে কে জানে, তায়েব মেহতা-র আঁকা মহিষাসুরের ছবি ১.৬ মিলিয়ন ডলারে বিক্রি হল, ক’দিন আগেই তাঁরই আঁকা মা কালীর ছবি এ রকমই কোটি-খানেক রুপিয়াতে বিক্রিয়েছে, অর্থাৎ

বিদেশি চিত্রসিনেমার কাছে দেবী-অসুর এক ডলারে জল খাচ্ছে, অবশ্যই স্পেশাল অভিনন্দন তায়েবমশাই। ব্রিটিশ টিভি চ্যানেল 'নিক জুনিয়র' যে 'আধুনিক নার্সারি রাইম' লেখার প্রতিযোগিতা করল, তাতে প্রথম হল টনি ব্লেয়ারের ইরাক যুদ্ধে যোগ দেওয়াকে ব্যঙ্গ করা একটি মনোহর ছড়া, টনি এখানে এক অসাধু পিৎজাওলা, যে বাচ্চাদের আকৃষ্ট করার জন্য পিৎজার ওপরে হলদে কাঠের গুঁড়ো ছড়িয়ে তাকে চিজ বলে চালানোর চেষ্টা করে আর লাল রং কিনে এনে বলে এই যে টোম্যাটো-প্রলেপ, আর দ্বিতীয় হল একটি ভাইরাস-আক্রান্ত কম্পিউটারের মৃত্যুর ট্রাজিক আখ্যান, ওষুধ দিয়ে বিছনায় মুড়ি দিয়ে শুইয়েও যাকে বাঁচানো গেল না, জাপানের বৃহত্তম সিগারেট প্রস্তুতকারী কোম্পানি ব্যবস্থা করল টোকিওতে 'সিন সিটি' ছবির এমন প্রিমিয়ারের, যেখানে সিগারেট না খেলে ঢোকা বারণ, শুধুমাত্র ধূমপায়ীরাই দর্শক হিসেবে ঢুকতে পারবেন, চতুর্দিকে স্মোকিংবিরোধী ক্যাম্পেনের প্রতিবাদে এ অভিনব ব্যবস্থা, জন লেনন-এর প্রথম বউ সিহিয়া লিখলেন 'জন', যেখানে দাম্পত্য ফিরিস্তি থেকে জানা গেল লেনন ছিলেন ভয়াবহ উগ্রচণ্ড, হিংসুক, দখলবাজ, দৈনিক প্রমাণ চাইতেন বউয়ের কাছে, যে তাঁকে কেন্দ্র করেই সিহিয়া আবর্তিতা, এক দিন নিজ বেস্ট ফ্রেন্ডের সঙ্গে পত্নীকে নাচতে দেখে কোনও কথা নেই, এগিয়ে এসে এক সপাট চড়। অতএব শান্তিকামী জন গীতিকার হিসেবে যা, ভীতিকর হিসেবে উন্টা-এ পুন্টা-এ!



কেরলের একটি জনপ্রিয় টেলিভিশন অনুষ্ঠান 'সাক্ষী', যা প্রতি রবিবার সন্ধ্যায় কেরলের রাজনীতি নিয়ে তীক্ষ্ণ স্যাটায়াস বিঁধিয়ে দেয়, এক এপিসোডে দেখাল একটি বাড়ির সামনে ছেড়ে রাখা ছেঁড়াখোঁড়া বিচ্ছিরি চটিজোড়া, বাড়িটিতে কংগ্রেস অধিবেশন চলছে। দর্শকদের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন ঘটে: বলুন তো চটি কার? সরাসরি না বললেও তারা যথেষ্ট সূত্র দেয়, তা বোঝার। অবিলম্বে কেরলের মুখ্যমন্ত্রী একটি নতুন চমৎকার চটিজোড়া কেনেন এবং পরের এপিসোডেই সাক্ষী-তে তার ক্রোজ-আপ দেখিয়ে বলা হয়, তা হলে এ প্রোগ্রাম কেরল রাজনীতির কিছু তো বদলে দিতে পারল!



'মাই ডেজ ইন প্রিজন'-এ ইফতিকার গিলানি লিখলেন, জেলে কী ভাবে তাঁকে বহু পুলিশ মিলে পেটাত, তার পর তাঁরই রক্তমাখা জামা দিয়ে বাথরুম মোছানো হত। সেই জামাটাই পরে থাকতে হত তিন দিন। লিখেছেন এ-ও: কয়েদিরা নিজেদের মধ্যে নিয়মিত ক্লাসের ব্যবস্থা করেছে, শেখানো হয় ব্যাংকে কী ভাবে জালিয়াতি করতে হয়, ধর্ষণের আইনকে

কী ভাবে পাশ কাটাতে হয়, কী করে পকেট মারতে হয়, গাড়ি চুরি করতে হয়। মিথ্যেদা-র কোচিং চান? জেলে যান।



এক জন তো ১৮ বছর ধরে কেস লড়িয়া প্রমাণ করিলেন, তিনি মরেন নাই। ভদ্রলোকের নাম লালবিহারী, পদবি নিয়েছেন 'মৃতক'। তাঁর কাকা রেভিনিউ-অফিসারকে ঘুষ দিয়ে ১৯৭৮ সালে খাজনার নথিতে তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করিয়ে দেন। আর তাঁর এক বিধা জমি খুড়তুতো-ভাইদের দিয়ে দেওয়া হয়। এ কাণ্ড নাকি প্রচুর ঘটে, লালবিহারীর মতে শুধু উত্তরপ্রদেশেই এমন আরও অন্তত চল্লিশ হাজার জীবিত-কাম-মৃত আছেন। তিনি এঁদের নিয়ে 'মৃতক সংঘ' প্রতিষ্ঠা করেছেন, সকলে মিলে লখনউ গিয়ে তামাশা-অন্ত্যেষ্টি করেছেন নজর টানতে, নির্বাচনে দাঁড়িয়েছেন, এমনকী একটি খুড়তুতো ভাইকে কিডন্যাপ পর্যন্ত করেছেন, যাতে তাঁর কাকা পুলিশের কাছে তাঁর নামে নালিশ করতে বাধ্য হন (এবং প্রমাণিত হয় যে তিনি বেঁচে আছেন, কারণ মৃতকে ছেলেধরা সন্দেহ করা যায় না)। এই আশ্চর্য জেহাদে তিনি আমেরিকার IGnobel প্রাইজ পেয়েছেন, এ বার মামলা জিতে ফের অফিসিয়ালি বেঁচে উঠলেন, তাঁর কাহিনি নিয়ে সিনেমা করছেন সতীশ কৌশিক, লালবিহারীর ভূমিকায় অভিনয় করবেন অনিল কপূর। একে তো জীবনের এতগুলো বছর অভাবনীয় হেনস্থার জন্য তিনি উত্তরপ্রদেশ সরকারের বিরুদ্ধে ২৫ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ চেয়ে ফের মামলা দায়ের করেছেন, তার ওপর সিনেমা-পাবলিসিটি। উ. প. নির্ঘাৎ ভাবছেন, মরিলে না মরে এ কেমন বৈরী, তার ওপর আবার সিনেমা তৈরি?



আচ্ছা, এই যে 'লাক্স' যুগ যুগ নারী-মডেল ব্যবহার করে এসে এই ৭৫তম বর্ষ উপলক্ষে টকটকে শাহরুখ-এর সফেন চান দেখাচ্ছেন, কোনও পুংবাদী সংস্থা রইরই রুখে দাঁড়াচ্ছেন না কেন? এ সব কী হচ্ছে অ্যাঁ, টপলেস পুরুষ দেখিয়ে পণ্য বিক্রিরি? ছিঃ! 'ফিমেল গেজ'!

১৬ অক্টোবর, ২০০৫

বাঙালি বাথরুম যায় না

প্রবল খেউড় চলছে, পণ্ডিতিও। জনতা খেপে কাঁই, ‘অন্তরমহল’-এ নারীর ঋতু দেখানো হল কেন? হক কথা। সিনেমায় ঠিক কী কী দেখানো যাবে আর কী কী দেখানো যাবে না, এ বিষয়ে তো আমবাঙালির সংবিধানই শেষ কথা বলবে। জীবনের গাদা গাদা সত্যির মধ্যে শুধু সুগন্ধি সত্যিগুলোকে বেছে নিয়েই শিল্প তৈরি করতে হবে: ফতোয়াটি ছিমছাম ও গবেটযোগ্য। বেচারী ঋতুপর্ণ, বাঙালি মধ্যবিত্তর গুড বুক-এ থাকার প্রলম্বিত প্রোজেক্টে তিনি সফল, কিন্তু সে গ্যাসলাইটে মুখ বাড়াতে গিয়ে লাগাতার সেফ খেলার এমন জমি তৈরি করেছেন, স্লাইট ছক ভাঙলেই মুগুর রেডি। না, শুধু ছক ভাঙলে নয়, তাতে যৌনতা ঢোকালে। কারণ, শিল্পী হিসেবে ঋতুপর্ণর জানা উচিত, বাংলা শিল্পে আর যা-ই চলুক, পেঙ্গুইন থেকে পাতকুয়ো, যৌনতা নিষিদ্ধ। মানে একটু-আধটু সিদ্ধ, এই যেমন ঋতুবাবুই রেটে চুমু দেখান। খোলা পিঠফিঠ অবধি চলতে পারে। ‘চোখের বালি’ নিয়ে অনেকেই খিচখিচ করেছিলেন, বইয়ে যা-ই লেখা থাক, রবীন্দ্রনাথের চরিত্ররা তো আসলে গলা অবধি, তা হলে আবার এত ফস্টিনস্টি দেখানো কেন, কিন্তু দৃশ্যগুলোর উগ্রতা বেশি নয় বলে শোর তুলতে পারেননি (সেখানে ঋতুও দেখানো হয়েছিল, বৃষ্টির চোটে অতটা খেয়াল হয়নি বোধহয়)। দহন-এও, দাম্পত্য ধর্ষণ দেখিয়ে সোশ্যাল ওয়ার্ক করেছেন বলে ছাড় দেওয়া হল। কিন্তু, খেয়াল তো রাখতে হবে, একুনে তিনি সাক্ষাৎ সত্যজিতের মানসপুত্র, তাঁর ছবি এলেই হোল ফ্যামিলি বেধবা পিসি প্লাস এন্ডিগেন্ডি তোরঙ্গ খুলে পাট ভেঙে শুভকাজে যাচ্ছেন: চাম্পি ডায়লগ হবে, মেয়েরা হেভি অত্যাচারিত হবে, গুটিকয় রবীন্দ্রসংগীত প্যাঁকপ্যাঁকাবে খালি গলায়, বাঙালি আর্ট ফিলিম দেখে বেরিয়ে আসবে। একটা বেশ শিষ্ট, শোভন, রুচিমান কলচর হল। এর পর চানা-বাটোরা কিংবা বেনফিশের ফ্রাই। বাড়ি ফিরেই ‘নাচ বালিয়ে’।

তা সে নম্রসুন্দর টার্গেট অডিয়েন্সের মুখে এমন বিচ্ছিরি ধড়াম তিনি ছোড়েন কোন আক্কেলে? যেখানে ফরমান: প্রচণ্ড প্রাসঙ্গিকতা ছাড়া সেক্স (এ আবার সেক্সও নয় শুধু, একেবারে ম্যাগোম্যা অপবিত্র পদার্থ) কখনওই শিল্পে আসা উচিত নয়। আর ওটা কথার কথা, আসলে সে বিদঘুটে ‘প্রাসঙ্গিকতা’ কোনও দিনই গজাতে পারে না, গজানো উচিত নয়। মানে উচিত, যদি সেটা ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের বিদেশি সিনেমা হয়। তখন আমলা-দাদার চটি চেটে ডেলিগেট-কার্ড আদায়, টাঁদিফাটা রোদে কনুই গাঁতিয়ে লাইন, তৃতীয় শ্রেণির ফরাসি ছবিতে ঋতুমতী নারী দেখালে বেরিয়ে এসে তা নিয়ে মুগ্ধ আউআউ। কিন্তু এটা বাংলা। ওরা যা দেখাতে পারে, আমরা পারি না। মদীয় সংস্কৃতি আলাদা। আমরা সবাই সেন্সর সেনগুপ্ত। মেমসাহেবকে উলঙ্গ দেখতে লাল পড়ে বলে কি শ্যামলবরণী ওগো কন্যা-কে অনুরূপ দশায় দেখতে

পারি? তাই আমাদের মাটিতে ফলতে ফুলতে গেলে বস মাত্রাজ্ঞান থাকতে হবে। দেশটা ম্যারিকা হয়ে যায়নি।

ছবি কীর'ম হয়েছে, সে কথা এ কলামে বলব না। আজকের এপিসোডে মূল প্রশ্ন, এই সিনেমা-নিদের ধরনটিকে ঘেঁটি চেপে ধরা হবে কবে? এখানে যৌনতা ও তার আনুষঙ্গিক দেখামাত্র বাঁধা আপত্তি, 'এতটার কি দরকার ছিল?' আবে, শিল্প জিনিসটারই তো দরকার ছিল না। এতগুলো লোক যে এক লাইনও কবিতা না পড়ে তেত্তিরিশ পুরুষ ধরে হাসছে-খেলছে-বক দেখাচ্ছে, কোনও ক্ষতিবৃদ্ধি হয়েছে? শিল্প না থাকলে কেউ গাড়িচাপা পড়ত? কেউ পাঁউরুটি উগরে অনশনে বসত? শিল্প যে দরকারি নয়, এ-ই তার মহিমা। এই অহৈতুকী আনন্দেই তার স্বরূপ বিকশিত। না হলেই চলে, তবু প্রাণপণ হচ্ছে, বুকের রক্ত দিয়ে হচ্ছে— এইখানেই তার ম্যাজিক। অতএব এক জন স্রষ্টা তা-হ দিয়ে তাঁর নিজস্ব জগৎ, কবিতা-গল্প-সিনেমা সাজাবেন, যা তাঁর জরুরি মনে হবে, সমাজ-সংসারের অ্যাটেস্টেড তালিকার তোয়াক্কা না করেই। আপনার কখনও মনে হয়েছিল, অপু-দুর্গার গল্পে জলফড়িং-এর কোরিয়োগ্রাফি জরুরি? প্রাসঙ্গিক? ওটা কেটে বাদ দিলে আখ্যানে কোথাও অসুবিধে হবে? উঁহ, বরং সুবিধে হতে পারে। কিন্তু সিনেমাটার তাতে প্রভূত ক্ষতি হয়ে যাবে। তবে এটা তো একটা কাব্যিক মসৃণ ব্যাপার, পরিচালক ইচ্ছে করলে সম্পূর্ণ অন্য জাতের জিনিসেও তাঁর সজ্জা সম্পন্ন করবেন, যদি তাঁর কাছে কৰ্কশতা, রুক্ষতা, এবড়োখেবড়োপনা জরুরি মনে হয়। 'তা বলে ওই সবও দেখানো যাবে? বাঃ, তবে আর বাকি থাকে কেন? পায়খানাও দেখানো হোক!' আজে হ্যাঁ, তা-ও দেখানো যাবে। বহু ঘিনঘিনে জিনিস আমাদের জীবনে ঘটে। আমরা শরীরে-মনে বহন করি নিয়ত। তা আমাদের সুখ-দুঃখের মতনই পেলায় সত্যি। আমাদের বহু মুহূর্তের নিয়ন্ত্রক ও নির্ধারকও। কাঁদলে চোখ দিয়ে জল পড়ে, তা দেখানো যায়। তা হলে নারীর ঋতু হয়, তা-ও দেখানো যাবে। ('...কোষ্ঠ পরিষ্কার হবার আনন্দটা সাহিত্যে স্থান পাবে না কেন?...বায়ুনিঃসরণ করা নিয়ে হাসির উদ্বেক হয়। তবে সেটা অপাংক্ত্যে কেন— হাস্যরসের ভাল সাহিত্যেও যৌন বিষয় সংক্রান্ত বহু বিষয় বিভিন্ন বিদেশী সাহিত্যে ভাত-ডাল। সেই সাহিত্যগুলোকে হিংসা করি। তবে কেন সেগুলোকে হাস্যরসের উপাদান হিসাবে দেখলে বটতলার বই মনে করি? Conventionগুলো সব arbitrary!'— সতীনাথ ভাদুড়ির ডায়েরি থেকে)।

যা কিছু সত্যি, তা দেখানো যাবে। এমনকী যা কিছু মিথ্যে, কল্পিত, তা-ও। শিল্পের সেটাই আদর্শ পরিবেশ। পরিচালক যা ইচ্ছে তা-ই দিয়ে তাঁর প্রতিমা গড়বেন। দর্শকের পছন্দ না হলে দেখবেন না, তেড়ে গাল দেবেন। কিন্তু, সে গালাগাল যেন হয় 'গোটা সিনেমাটা অমুক অমুক কারণে খারাপ', এই মর্মে। 'মেন্স দেখিয়েছে? অ্যা! সিনেমাটা আলবাত খারাপ', এ সমালোচনা শিক্ষিতের শোভা পায় না। একটা নির্দিষ্ট শিল্পকে বিচার করতে হবে তার নিজস্ব প্রেক্ষিতেই, আগে থেকে তৈরি করে নিয়ে যাওয়া একটা গালভরা বোধ থেকে নয়। একটা সর্বব্যাপী আখ্যান অদাহ্য নান্দনিকতা বলে কিছু নেই। এমন কোনও ঢালাও হুকুম দেওয়া যায় না: সিনেমা যা-ই হোক, পেছাপ দেখানো যাবে না। বা, সিনেমা যা-ই হোক, কথাটথা নেই সাত মিনিট ধরে একটা ছেলে চুপ করে বসে আছে এই বোর করা যাবে

না। বা, সিনেমা যা-ই হোক চোখে ঝাঁকুনি লাগে এমন ক্যামেরাকাজ বজানীয়। না। পৃথিবীতে সবাই এক রকম ভাবে শিল্প করবেন না, এবং করেন না বলেই শিল্প জিনিসটি এমন জীবন্ত ও ধড়ফড়ে। সিনেমা কী এ বিষয়ে কোনও আবছা কথা বলার আগে এটা জোর গলায় বলা হোক, সিনেমা অনেক রকম।

যে মন নিয়ে তপন সিংহ দেখব, অবিকল সেইটা নিয়েই বুনুয়েল দেখতে গেলে, ধাক্কা খাব। তাই প্রতিটি শিল্প-অভিজ্ঞতার প্রাক-মুহূর্তে নিজেকে খুলে দিতে জানতে হবে। তার পর, নিজেকে জিজ্ঞেস করতে হবে, মেন্স দেখানোর সময় আমার কেন খারাপ লেগেছে, আমার মতে সিনেমাটার বক্তব্য বা স্টাইলের সঙ্গে শুটা যাচ্ছে না বলে, না কি, ও জিনিস আদৌ দেখানো যায়, এটা আমার সংস্কারে লাগছে বলে? যদি প্রথমটা হয়, যুক্তিসহ খিস্তি করে ভূত ভাগিয়ে দিন পরিচালকের। যদি দ্বিতীয়টা হয়, দুঃখিত। আপনি যথার্থ রসগ্রাহী হিসেবে নিজেকে তৈরি করতে পারেননি।

আসলে কী জানেন দাদা-দিদিরা, থাকেন তো একটা অপদার্থ-অধ্যুষিত জমিতে, যেখানে কেউই নতুন কিছু করার কথা ভাবেন না। তাই এ সব আপত্তি ধোপে টেকে। প্রত্যেকেই গামবাট ও গোঁড়া, কোরাস জুটে যায়, এ কী বেলেগ্লাপনা, কী অশ্লিল। আর তীব্র অশিক্ষা। কারওরই আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র সম্পর্কে ন্যূনতম ধারণা নেই। দেখার অভ্যাস তো শুধু ন্যাতানো বাংলা ছবি, ওপরগেঁড়ে হিন্দি ছবি, নির্বোধ মার্কিন ছবি। যে জিনিস পঞ্চাশ বছর আগে ইউরোপে লোকে করেটরে হেজে গেছেন, সে জিনিস এখন এখানে করলে সব মাং মাং করে ওঠে। না, দুঃসাহস দেখালেই ছবি ভাল হয়ে যায় না, কিন্তু তা মিনমিনে হওয়ার ঐতিহ্য মেনে চলার চেয়ে ঢের ভাল। দয়া করে লক্ষ করুন, বলছি না, এক বারও বলিনি, যে ‘অন্তরমহল’ ভাল ছবি। বলেছি, ‘পিরিয়ড দেখানো হয়েছে বলেই একটা ছবি বাজে হয়ে যেতে পারে না।’

১৩ নভেম্বর, ২০০৫

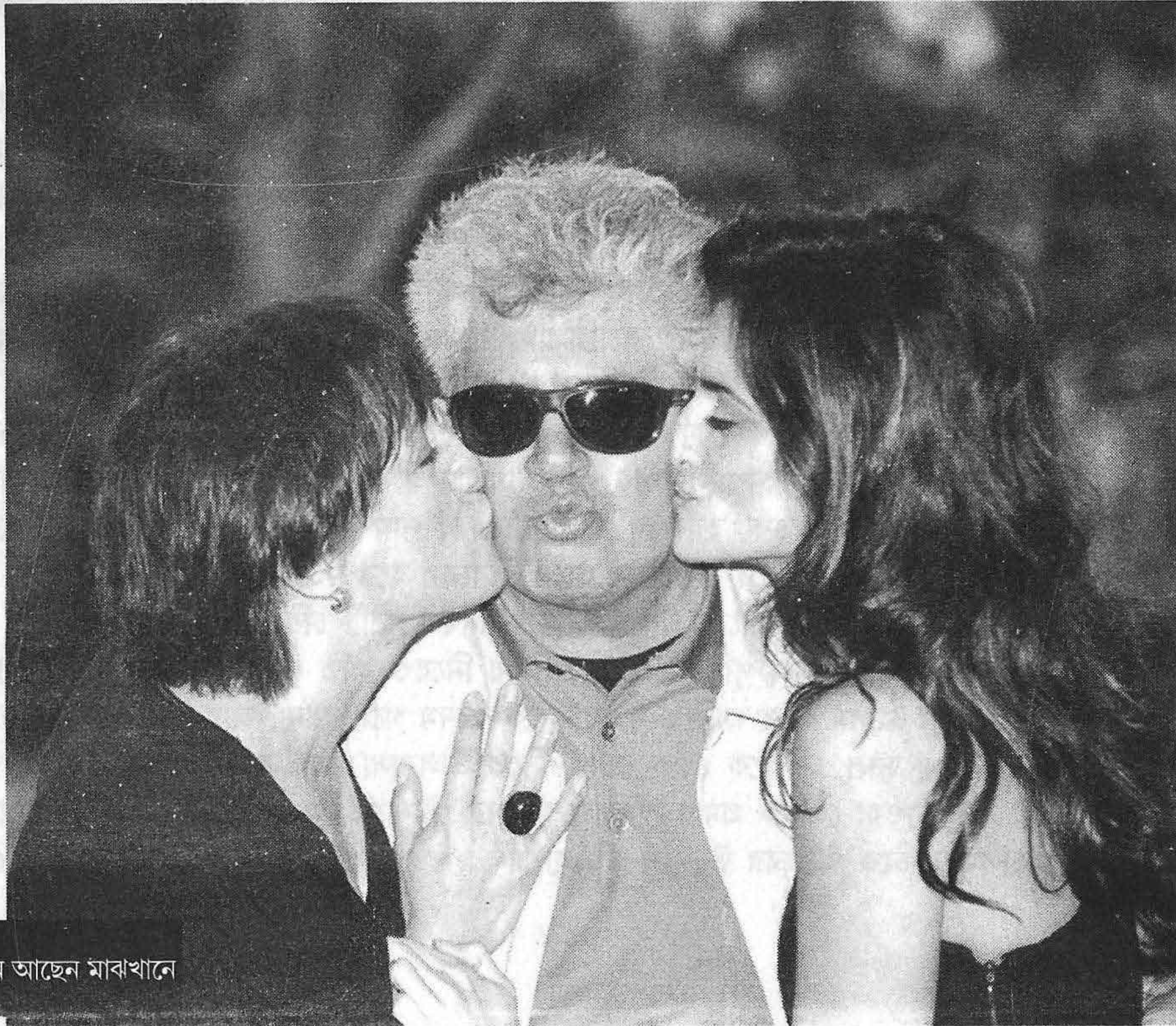
দ ই হু জু রে র গ প্ পো

ফিলিম ফেস্টিভ্যাল শেষ। একটিও ডেলিগেট কার্ডের নেই অবলেশ। পের্দো আলমোদোভার-এর অখদ্যে গরগরে ছবি নেহারি চোখ উন্টে মুগ্ধতা দেখানো ফের আসছে বছর। স্পেনীয় এই পরিচালকের রেট্রো দেখে কী তীব্র উল্লাস আঁতেলগণের। স্বাভাবিক। কোনও মস্তিষ্ক-ব্যায়ামের দরকার নেই, ছবিগুলি অসম্ভব গাঁকগাঁক চড়া সুরে বাঁধা, চিত্রনাট্য জুড়ে কিছু উদ্ভট অতিনাটকীয় মোচড়, কিয়ৎ পরিমাণ স্নেহ গিমিক, কিছু ক্ষণ পর পর টানা হেতুহীন চমক দিয়ে যাওয়ার প্রবল সস্তা প্রবণতা, সঙ্গে গাঁতিয়ে মিউজিক। সবচেয়ে ইম্পর্ট্যান্ট, এত কাণ্ডাকাণ্ড ক্যান? না, স্নেহ একটি চমকদার গল্প বলার জন্য। যে, কীর'ম দিলুম, পিলে তো চমকাল? ছবির একটি ইঞ্চিও ফ্রেমের বাইরে প্রসারিত হয় না। ইদানীং অবশ্য পৃথিবী জুড়েই চটকদার মিডিয়োকোরদের নিয়ে রইরই। আলমোদোভার বিশ্বে টেরিফিক জনপ্রিয়, প্রাইজ তো ঘরে কুলোচ্ছে না। আশ্চর্য, তাঁর ছবিগুলির যে লক্ষণাবলি দেখে সর্ব্বলের পুলক উঠে উথলি, জন্মজন্মান্তর ধরে হিন্দি সিনেমায় সে ছড়মতাল সবেগে বহমান। আমরা তা দেখে তলপেট চেপে হেসে অস্থির। ছ্যাছ্যা, ও আবার সিনেমা? তেড়ে মেলোড্রামা, চিত্রনাট্যে উৎকট অসঙ্গতি ও অ্যাবসার্ড ঘনঘটা, স্থূল চমক দেওয়ার প্রাণপণ চেষ্টা, আর তার-সপ্তকে চিলচিৎকার করে লোকের চর্বি ভেদ করে অ্যাপিল সৈঁদানোর প্রোজেক্ট। সুভাষ ঘাই বা মনমোহন দেশাই অভিমান করে বলতে পারেন, 'হ্যাঁগা, পের্দোর মধ্যে কী পেলো যা আমার মধ্যে নেই?' যখন ইচ্ছে করুক গাছের টপে তোলন, আখ্যানকে হরদম জীবনের চেয়ে বিশালাকৃতি দেওন, এ সব তো আমরা ঝিৎকুচিকু গানানাচা ছড়িয়ে কবে থেকে মিস্স ও গ্রাইন্ড? হালের সঞ্জয় লীলা বনশালি যখন ঝাঁ-নিপুণতায় স্বাভাবিকতাকে কলা দেখিয়ে গমগমে 'লার্জার দ্যান লাইফ' ছবি করেন, আমাদের পণ্ডিতরা 'হ্যাক থু' ওগরাতে পথ পান না। তাঁরাই আলমোদোভার দেখে 'অ্যাবসার্ডটিকে, মেলোড্রামাকে কী ইউজ করছে দেকেচো!' বলে শিবনেত্র হয়ে স্টিল। হ্যাঁ, কেউ এগুলোকে তাঁর নিজস্ব স্টাইলের উপাদান হিসেবে ব্যবহার করতেই পারেন, কিন্তু তা হলে নিছক 'চাটি চরিত্রের জীবনের হাঁউমাঁউ বর্ণন' ছাড়িয়ে ছবিকে একটু এগোতে হবে যে বস। পৃথিবীর মহত্তম বিষয় নিয়েও অতি রদ্বি উপস্থাপনায় হাবিজাবি শিল্প করে লাভ তো নেই। হ্যাঁ, পের্দোবাবুর এলেম হচ্ছে প্রান্তিক মানুষজনকে হরদম গল্পে আনা, আর পলিটিকালি ইনকারেক্ট হতে ভয় না পাওয়া। তা-ও নয়, বলা ভাল, দর্শককে ৪৪০ ভোল্ট দিতে ভালবাসা। এ তেড়ে ধর্ষণ করছে, ও র্যান্ডম খুন, বৈজ্ঞানিক নিরীক্ষায় ছোট্ট হয়ে যাওয়া প্রেমিক প্রমাণ-সাইজ প্রেমিকার যৌনঙ্গে হ্যাপিলি এভার আফটার বাসা বাঁধছে। কিন্তু এই সাহস আর প্রচলিত রুচিকে খাবড়ার উদ্দেশে স্বল্প হাতালির পর জিগাই, ভাল কথা, সে মসলা নেড়েঘেঁটে

তিনি বানাচ্ছেনটা কী? সিধে বাত: একটি করে জমজমে গপ্পো, থিমের পুজো, ভাঁড়ের প্যাডেল। তাই বই কিছু নয়। হিন্দি কমার্শিয়াল ছবিতে গা-জোয়ারি কিছু মার্জিনাল মনুষ্য (সমকামী/হিজড়ে/প্রতিবন্ধী/মেয়ে-ক্রিকেটার) ছিটিয়ে, আর কলার তুলে ‘ফের একটি মাইলস্টোন, এই লে ধর’ মুদ্রায় ফেস্টিভ্যালে ঢুকিয়ে দিলেই, বহু পেন্দ্রো কোণে কোণে মে।



আর গোদারের অসম্ভব একঘেয়ে ও রংচটা ছবি ‘আওয়ার মিউজিক’? উরেবাবা, দেখে আঁতেলরা ‘ধুরো কোবিতা, না?’ বলে মুচ্ছে যা় আর কী। জাঁ লুক মহাশয়েরও চুয়াত্তরে ভীমরতি হবে কে জানত। ছবিটি আর কিছু না, একটি



আদৃত আলমোদোভার : যে জন আছেন মাঝখানে

কোটেশন একজিভিশন। গোদার সাত-আটটা জম্পেশ বাক্য রচনা করেছেন। সেগুলো বেশ ভালই। কিন্তু তাই বলে একটা গোটা সিনে-প্রবন্ধ ফেঁদে ফেলার দিব্যি কে দিয়েছিল? নিজে অভিনয় করেছেন, একটি ক্লাসও নিয়েছেন, যেখানে শট ও কাউন্টার-শটে নায়ক ও নায়িকা একই ভঙ্গিতে উগ্র ঝুঁকে কথা বলছে— এই স্টিল দেখিয়ে ব্ল্যাংকেট-রায় দিয়েছেন, পরিচালক (মার্কিন, হাওয়ার্ড হক্স) নারী ও পুরুষের তফাত বোঝেন না। আর গোদার তফাত ভুলে গেছেন সত্যিকারের জ্ঞান এবং ওপরচালাক শব্দ-জাগলিং-এর : ‘মৃত্যুকে দুভাবে দেখা যায়: সম্ভবের অসম্ভব হয়ে যাওয়া, আর অসম্ভবের সম্ভব হয়ে যাওয়া।’ ‘একটি আইডিয়া রক্ষার জন্য একটি মানুষকে হত্যা করা মানে একটি আইডিয়াকে রক্ষা করা নয়। একটি মানুষকে হত্যা করা।’ আমি চাই ‘not a just conversation, just a conversation.’ ‘তুমি যদি বুঝতে পারো আমি কী বলছি, তার মানে তুমি মনোযোগ দিচ্ছ না!’ কিছু বাক্য শ্রেফ অর্থহীন। ‘তখনই পূর্ণ স্বাধীনতা আসবে, যখন বাঁচা আর মরার মধ্যে তফাত থাকবে না।’ কিছু ক্লিশে, যাত্রাটাইপ। ‘হিংসা এক চিরকালীন ক্ষত রেখে যায়, এক জন মানুষ তার সহ-মানুষকে মারছে, দেখলে এক গভীর আতঙ্কের জন্ম হয়।’ আর কিছু অবশ্যই দুর্দান্ত। ‘মানবদরদিরা বিপ্লব শুরু করে না কেন?’ ‘কারণ তারা লাইব্রেরি শুরু করে!’ গোদার চিরকালই অসামান্য সংলাপ লেখেন, তার কয়েকটি তখুনি ইতিহাসে খচিত হয়ে যায়। কিন্তু তার মধ্যে কক্ষনও হাততালি কুড়ানোর কাঙালপনা থাকে না। অথচ যখন তিনি এই গোছের কথা বলেন, জুডায়লগটা ঠিকঠাক মনে নেই কিন্তু এই স্পিরিটেই) কমিউনিজ্‌মের অস্তিত্ব ছিল শুধু ৯০ মিনিট যখন হান্সেরি ৬-৩ গোলে ইংল্যান্ডকে হারিয়েছিল, মায়া হয়। গোদার এক ভগবান। তিনি বুড়ো বয়সে প্রফেট হওয়ার লোভে পাতি ওয়ান-লাইনার চমকানো বাণীবিতরণী সভা খুলে বসবেন! (কান-এর প্রেস কনফারেন্সে বলেছেন, ‘সিনেমা তোলা হয় ‘নেগেটিভ’-এ। তার থেকে তুমি তৈরি করো ‘পজিটিভ’।... ডিজিটাল-এ নেগেটিভ নেই, শুধুই পজিটিভ। অতএব তোমার হাতে রইল শুধু ভালটুকু, মন্দটুকু পেলো না।’ প্রথম শ্রবণে কী আশ্চর্য! এবং দ্বিতীয় চিন্তনে কী ছেঁদো!) এই ছবির গোড়ায় ‘নরক’ পর্বে দশ মিনিট ধরে যুদ্ধের অসংখ্য ক্লিপিং দেখানো হয়, ফাইল শট

গোদার : শেষে গোদা-রও আরাধ্য?

এবং হলিউড-ছবির যুদ্ধদৃশ্য মিশিয়ে। ব্যাকগ্রাউন্ডে শুধু পিয়ানো। ক্লান্তিকর! অন্য কেউ হলে লোকে বোর হয়ে দুয়ো দিয়ে বেরিয়ে যেত। গোদার বলে লাখ নিবন্ধ লেখা হচ্ছে। আর ছবির শেষে ‘স্বর্গ’ হল জালের বেড়া ঘেরা একটা জায়গা, যেখানে বন্দুকধারী সৈন্যরা পাহারা দিচ্ছে। নায়িকা এক সৈন্যের সঙ্গে আপেল ভাগ করে খায়। এটুকুই যা গোদারীয়।



টিভিময় সব ফিকশনকে দুমড়ে সরিয়ে প্রতিযোগিতার রমরম (খোঁকাখোঁকি পালে পালে আইস, নাচিয়ে-গাইয়ে-কমেডিয়ান, হে দয়াল জনতা বিচার করো, তুরন্ত এস এম এস ভেজো যদি না এখনও আঙুলে গেঁটেবাত হৈয়ে থাকে)। আর সোপ-অপেরাকে কী কুশলী আত্মীকরণ! কথায় কথায় কান্না। সরোজ খান/ হিমেশ রেশমিয়া পাঁচ সিকে বখশিস দিলে সব কেঁদেককিয়ে একসা, স্টেজকে সপাসপ চুমু খাচ্ছে। রেজাল্টের পর হেরোর জন্য সিমপ্যাথিতে যা রোলারলি, মনে হচ্ছে সব্বাই নিজে হারলে খুশি হত। গ্লিসারিনটা কখন লাগিয়ে নিচ্ছে, সেটাই রহস্য। প্রতিযোগী হৃদ গরিব বা জমাদার বা ছুতোর হলে? সাপোর্টের জন্য হুদোহুদি। আহা, স্ট্রাগল করে এয়েচে। মেয়ে হলে অবশ্য স্বাস্থ্যবতী হওয়া ভাল। ও দিকে চিন দেশে হুনান টিভি ফাটিয়ে দিল নতুন মেয়ে পপ-স্টার খোঁজার জন্য ‘দ্য মংগোলিয়ান কাউ সাওয়ার ইয়োগার্ট সুপারগার্ল’ কম্পিটিশন করে। ৪০ কোটি লোক দেখেছেন! রহস্য? তাত্ত্বিকরা বলছেন: গণতন্ত্র। আমার ভোটের সতি সত্যি এমন খ্যামতা, তার দৌলতে মরণ-বাঁচন ডিসিশন! বজ্র-আঁটুনিসমৃদ্ধ চিনে সাধারণ মানুষ বাপের জন্মে ভোট দেননি, তাই অ্যায়সান উতরোল। কিন্তু তা হলে বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্রে? মনে হয়, ধাস্টামো যতই জয়জয়, ভারতীয় জনগণও আসলে ওই তিমিরেই: ‘আমি চিন-ই গো, চিনি তোমারে’!

১১ ডিসেম্বর, ২০০৫

স ন্দী প ন পা ঠ শা লা

কাইলি মিনোগ তাঁর ব্রেস্ট ক্যানসারের সময়ে টানা ডাইরি লিখেছিলেন, এ বার তা প্রকাশিত হবে। অ্যাসটেরিক্স-ওবেলিক্স ভূষিত পরের ফিল্মে (যেটা করেই রিটায়ার করবেন বিশ্বখ্যাত ফরাসি অভিনেতা জেরার্ড দেপারদিউ) অভিনয় করছেন ঐশ্বর্য রাই। রাশিয়ায় পেল্লায় হইহই মচিয়ে শুরু হল দশ এপিসোডের টিভি সিরিজ 'দ্য মাস্টার অ্যান্ড মার্গারিটা', মিখাইল বুলগাকভ-এর এক সময় ২৬ বছর ধরে নিষিদ্ধ থাকা উপন্যাস, যেখানে বিদেশি প্রফেসরের ছদ্মবেশে স্বয়ং শয়তান এসে স্তালিনের মস্কোয় ধুকুমার বাধিয়ে দেবে, প্যাঁচে ফেলবে দুর্নীতিবাজ আমলাদের, আর মার্গারিটা-কে ডাইনি করে দেবে যাতে সে তার প্রেমিক মাস্টারকে পেতে পারে। মাস্টার এক লেখক, সোভিয়েত সেন্সর-ব্যবস্থা যাকে পিষে মারছে। বইটির বেশ কিছু সুররিয়াল দৃশ্য ছবিতেও: অতিকায় মোটা বেড়াল (শয়তানের অনুচর) ট্রামে চড়ে ভদকা খেতে খেতে চলেছে, মস্কোর মহিলারা শ্রেফ অন্তর্বাস পরে ছোট্টাছুটি করছেন, আর মার্গারিটা সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে বাঁটায় চড়ে উড়ে চলেছে শয়তানের দেওয়া পার্টিতে। ও দিকে টার্কির লেখক ওরহান পামুক গত অক্টোবরে জার্মান খবরকাগজকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বলেছেন 'আমাদের সেনাবাহিনী মাঝে মাঝে গণতন্ত্রকে বিপর্যস্ত করে', ব্যস, তাঁর বিরুদ্ধে 'টার্কিশনেস'কে ক্ষুণ্ণ করার মামলা রুজু। সাহস দেখাবেন না, কখন 'বাঙালিয়ানা'কে তুশু করার অভিযোগে সিধে কাঠগড়া। যা যুগ পড়ল, বরং রাশিয়া কেটে পড়লে সেফ।



ভি এস নয়পল-এর '৭১-এ বুকার পাওয়া বইয়ের প্রথম অধ্যায় টাইপ করে পাঠানো হল কুড়িটা প্রকাশনার কাছে, যেন নয়া অনামী লেখক চাল চাইছে, আর সর্বত্র ধাঁই-প্রত্যাখাত। তাই নিয়ে হাহারব 'কী অসৈরণ কী অনাছিষ্টি'! অর্থাৎ প্রকাশক গাধা, সোনার লেখক ডাস্টবিনে গড়াগড়ি। কিন্তু এ আর্তনাদে নিহিত কিছু বিপজ্জনক ধারণা: 'পুরস্কার পাওয়া বই মানেই ভাল', এবং 'সাহিত্যের ভালত্বের সংজ্ঞাটি অব্যয়'। প্রথম ধারণাটি বেশ অশ্লীল, দ্বিতীয়টি সাংঘাতিক। এক বার কুর্নিশ লভে গেলেই কম্পালসরি কালোত্তীর্ণ, এ জরদাব গদগদে ভাব তীর শিল্পশত্রুর। ফ্যাশন পাইপাই বদলাচ্ছে, আজ ডিভিডি কিনলে কাল সে মডেল ডোডোপাখি হয়ে যাচ্ছে পলক বদলাতে, আর ১৯৭১-এ পুরস্কার পাওয়া নভেল ২০০৫-এ ভাল লাগতেই হবে, এ দিব্যি দেওয়া একটু গোঁড়া ব্যাখ্যান হয়ে গেল না? হ্যাঁ, কিছু আশ্চর্য লেখা অবশ্যই



ওবেলিক্স-এর ভূমিকায় দেপারদিউ : এই কি গো শেষ দান?

ক'শতাব্দী জুড়ে প্রাসঙ্গিক থাকে, কিছু লেখা ততটাই নিশ্চিত ভাবে, থাকে না। সে যত বড় নোবেল-লেখকই লিখুন না কেন। ঠিকঠাক সাহিত্যশ্রোত মুহূর্মুহ বাঁক বদলায়, নয়া গয়না পরে, আগের পুজোর বেদীতে ঠকাস করে চুল্লুর বোতল রাখে। ক্রমাগত বাতিলের গার্বোজে ছোড়ে পুণ্যপুথি। আজ যদি কেউ 'পুরাতন ভূত্য' বা 'পঞ্চনদীর তীরে...' লিখে পাঠায়, কোনও ভদ্রলোক কবিতা-পত্রিকা তা ছাপবে?



বাংলা গদ্যশিল্পের সবচেয়ে বলমলে উষ্মীষটি নামিয়ে রেখে চলে গেলেন সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়। অবশ্য 'নামিয়ে রেখে' বললে ঠিক বলা হয় না। বরং বেশ খানিকটা ভুল হয়ে যায়। বহু দিন পরে থাকা আংটিকে যেমন আর আঙুল থেকে আলাদা করা যায় না, তেমনই, সন্দীপন ও তাঁর রাজকীয়তা। তাঁর সত্তারই প্রসারিত অংশ। আফটার অল, পাবলিক স্বৈচ্ছায় কুয়োয় গুঁজড়ে

থাকবে সমুদ্র প্রত্যাখ্যান করবে এ সকল হুজুত পেরিয়ে গুটেনবার্গের কল্যাণে সন্দীপনের চাবুক-টান লেখাগুলি তো জ্বলজ্বল করবে অনন্তকাল। আমবাঙালির কাছে তিনি সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের প্রিন্টিং মিসটেক। জামআঁতেলের কাছে, 'অঃ, ও তো সেক্স লেখে।' মাঝে মাঝে মনে হয় চিবুক ধরে 'নিজে চার্লাইন ওর পায়ের কাছে লিকে দ্যাকাও না মা' ফুকারি উঠি, কিন্তু সে বাজে লাইন অব তক্কো। আর গগুনেকুদের টুটি চিপে যে বলব, সেক্স নিয়ে শিল্প হতে পারে না সে নিদান কার বাপ দিল, আজ থাক। তাদের হেসে শুধু বলার, মহাভুল। বাংলা গদ্যের তুঙ্গ-সিংহাসনের সিটে আর যে দু'জনকে 'একটু চেপে বসুন তো দাদা' বলে সলীল বিরাজ করছেন সন্দীপন, সেই কমলকুমার ও জীবনানন্দ অতুলন, তাঁদের ম্যাজিক যেন লাল-নীল বহতা কাব্যকে টুপির ভেতর পুরে সহসা গদ্যের তুলতুলে খরগোশ বের করে আনা, কিন্তু সন্দীপনের কিরীটে খচিত এক অবিশ্বাস্য 'সোনার পাথরহিরে', তিনি আজানুলম্বিত স্মার্ট, আদিগন্ত আর্বান, আ-আলজিভ মুচকায়িত, এবং একইসঙ্গে ললিত লিরিকাল, জোনাকির সবুজের মতো তপতপে নরম, প্রথম স্তনস্পর্শের মতো অসহ্য কোমল। তার ওপর তিনি কী ছলছবিলা! মুহূর্তে পাঠককে নড়া ধরে টেনে নেয় তাঁর সম্মোহন, বাঘ যেমন মড়িকে, মনোযোগে স্তব্ধ চিত্রিত সাপ যেমন আকাঙ্ক্ষার নীল নরম প্রাণীকে। উঁকি মেরেছ কি ও ছুঁড়ি তুই মরিয়াছিস। সাধারণত গ্রেটরা একটু দুঃপ্রবেশ্য হন। হওয়া

বেশ উচিতও। কিন্তু এই এক জন নিজেকে গভীর অভিনিবেশে সুপার-স্বতন্ত্র করে নিলেও, মুখে ক্যাজুয়ালি ছোলা ছুড়ে দেওয়ার ভঙ্গিতে এমন টকটকে রঙ্গিলা, চোখ ফেরানো যায় না। ভাষার বলগুলিকে নিয়ে তাঁর রুদ্ধশ্বাস ‘এই গেল গেল, কিন্তু না’ জাগলিং, অমোঘ বাক্য-শব্দ-উপমাকে ক্রীতদাসের মতো অঙ্গুলিহেলনে ডেকে আনা ও বাসন মাজানো, চকিত দুর্ভাগ্যের মতো অভাবনীয় পরবর্তী পংক্তিটি মুদ্রাদোষের মতো সহজে লিখে ফেলা, উফ রে। রাজপুত্রের মতো শানিত সন্দীপন, পাপের মতো আনন্দময়। সত্যের মতো ঠিক। আর কে যৌনতাকে নিজ মহাজন বলে এমন প্রকাশ্য খাজনা দেবে? এমন কলার-তোলা লেখা বাংলায় সম্ভব, অ্যাঁ!— এ বিস্ময়ে যার প্রাণ জাগেনি, তার বাঙালিজন্ম কতক অসার্থক বইকী! ‘যা একঘেয়ে নয় তা সিরিয়াস নয়’, ‘যা সুস্বাদু তা-ই জীবাণু-থিকথিক’: প্রচলিত ন্যাকামিরামিক কী আমূল ধ্বংসই না করেন সন্দীপন। কোনও নশ্বর মানুষের প্রথম বই কি হতে পারে ‘ক্রীতদাস ক্রীতদাসী’? যে গল্প-সংকলনটির জন্য তাবৎ পুরস্কার তক্ষুনি জড়ো করে দিয়ে আসা উচিত বাড়ি বয়ে? তার প্রথম গল্পের প্রথম লাইনে ‘ভোরবেলা বাথরুমে পেছাপ করতে গিয়ে বিজন দেখল পেছাপের বদলে আজ রক্ত বেরুচ্ছে; সে রক্ত-প্রস্রাব করছে।’ তার পর? না, কাঁউকাঁউ আত্ননাদ নয়, ‘বাধা না দিয়ে বিজন পেছাপ করল। আরো পেছাপ পায় কিনা দেখে জল দিয়ে ভাল করে ধুয়ে নিয়ে সে ঘরে এল। শীত পাচ্ছিল, তাই কাঁথা মুড়ি দিয়ে, দেওয়ালে দুটো বালিশ রেখে তাতে ঠেস দিয়ে বসল।’ তার পর? প্যারাগ্রাফের শেষ লাইন? ‘তখনো তার কপালে রক্ত লেগে ছিল।’ ব্যস, যা বলার, বলা হয়ে গেল। এর পরে বিজন বৃষ্টির মধ্যে মনে করে দেখবে, ‘অন্য সব কিছু শুষ্ক হলে তবে বৃষ্টিপাত হয়।’ ‘এখন আমার কোনো অসুখ নেই’ উপন্যাসের ভূমিকা হিসেবে সন্দীপনের চার লাইনের বজ্র-স্ম্যাশ: ‘আমাকে যদি কেউ এই উপন্যাস সম্পর্কে কিছু বলতে বলেন তাহলে আমি এর ফর্ম লক্ষ করতে বলব। গদ্যসাহিত্যকে যা ডোবায় তা হল ন্যারেটিভ স্টাইল। এখানে তা নষ্ট করেছি। এবং কত আন্তরিক-ভাবে ঐ ধ্বংস করা হয়েছে তা লক্ষ করতে বলব।’ উনি যে জাতের লেখক, তাতে দুটো উপন্যাস আর তিনটে পাতলা ছোটগল্পের বই লিখে, ব্যস, বাকি জীবনটা শিস দিতে দিতে বদলে-দেওয়া পৃথিবীটা লক্ষ করে মুচকি হাসার কথা। বহুপ্রজ হওয়ার গোদা দায় এই জিনিয়াস ঘাড়ে নেবেন কেন? এমন লেখক পৃথিবীতে আছেন, যিনি সাকুল্যে উপন্যাস লিখেছেন একটি, আর গোটা দেশের সাহিত্য-দিগন্তকে ঝড়াকসে আটশো মাইল এগিয়ে দিয়ে গেছেন। দুর্ভাগ্য, সন্দীপন ক্রমে হলেন পুনরাবৃত্তিপ্রবণ ও এমনকী বছরবিয়োনি। আসলে এ অগা জাতের কোয়ান্টিটির প্রতি, থান থান প্রসবের প্রতি এমন সমূহ পেন্নাম, যে সন্দীপনও ভয় পেলেন সরু ও রোগা হতে, ভাবলেন, শেল্ফ ভরিয়ে দিলে গাড়ল এক দিন আনমনে পাড়বে মহাগ্রন্থ। তবে সে সব থাক। রাজৈশ্বর্য তাতে ক্ষুণ্ণ নয় এতটুকু। বাংলার নাগরিক-তম গদ্যকারের প্রতি এই কলামের পক্ষ থেকে সহস্র তোপধ্বনি, লাখ স্যালুট।

হে জি ম নি - মা সি ম নি

আজ, যখন ছোট বাচ্চাও জল চাইলে টেঁচিয়ে বলছে এক গেলাসি দো গেলাসি তিন গেলাসি চার, আর বইমেলার সামনে ট্রাফিক নিরাপত্তা পালনে প্রাণপণ সংস্কৃতি গুঁজে ঘোষণা চলছে ‘ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা কুল কুল, করবেন না কোনও ভুল, মেনে চলুন ট্রাফিক রুল’, আর বইমেলায় গিয়ে সবার এখন থেকেই ভাবী-নস্টালজিয়ায় মন চপচপ ময়দানে তো এই শেষ বার দ্যাখো আমাদের সোনামোনাটা বাইপাসের পর বাঁচে কি না-বাঁচে, আর শহরে বেশ কিছু দিন ‘পথের পাঁচালীর পঞ্চাশ বছর পূর্তি’কে সম্মান জানানোর বিজ্ঞাপনে বিশাল করে ‘অপরাজিত’র স্টিল দিয়ে হোর্ডিং সাজানো হল, ক’দিন পর ফের নয়া কাণ্ডাকাণ্ডে স-য় স-য় মিলিয়ে সেলাম সত্যজিৎ বলে তাঁর তিনটি ছবি কী সব সাংঘাতিক ডিজিটাল হ্যানোত্যানো করে দেখানো শুরু, আর প্রত্যেকেই ‘এই এগুলো দেখতেই হবে’ বললেন কিন্তু কিছুতেই সময় হয়ে উঠল না, আর যারা দেখতে গেছিল তারা এসে বলল ও হরি এ তো গোটা ছবি স্বেফ ফ্যাটফ্যাটে সফেদ চুনকাম হয়ে গেছে জায়গায় জায়গায় এমনকী ফর্সা বাজির চোটে সব অ্যায়সা জ্যোতির্ময় শটটা দেখাই যাচ্ছে না, কী দরকার ছিল বাপু আমাদের চেনা শ্যামলাস্নিগ্ধ প্রিয়জনগুলোকে ঠেসেঠুসে বিউটি পার্কার নিয়ে গিয়ে রাঙ্কুসি সাজানোর, আর লখনউ-এর ভাতখণ্ডে সংগীত বিশ্ববিদ্যালয়ে ‘সুর সঞ্জীবন’ ওয়ার্কশপে রাগরাগিণী শুনিয়ে সারানো হচ্ছে ডায়াবিটিস মাইগ্রেন হাঁপানি মায় প্রসববেদনা, আর চিনা ম্যাপ-সংগ্রাহক লিউ গ্যাং বললেন তিনি এমন মানচিত্রের সন্ধান পেয়েছেন যা নিশ্চিত প্রমাণ করে কলম্বাসের ৭০ বছর আগে চিনা নৌ-অভিযাত্রী ঝেং আমেরিকা আবিষ্কার করে ঠ্যাঙের ওপর ঠ্যাং তুলে বসেছিলেন, আর চিনের পক্ষ থেকে তাইওয়ানকে দুটি পান্ডা-ভাল্লুক উপহার দেওয়া হবে বলে তাদের প্রাণপণ তাইওয়ানি ভাষা (মিন্‌নান) শেখানো হচ্ছে এবং তাদের দুটি লালকপালক রোজ সকাল থেকে গলা ছেড়ে ওই ভাষায় গান শোনাচ্ছে কারণ ‘সংগীত এমন ভাষা যা সবাই বোঝে’, আর এত দিনে বাংলা কবিতার স্বর্ণদিন এল অ্যাঁ, কারণ টোস্টারের মধ্যে থেকে তড়াক পাঁউরুটির মতো একটা প্রকাশনা থেকে একসঙ্গে লাফিয়ে বেরোল একশো কবির একশোটা কবিতার বই, আর পার্ক স্ট্রিটের মোড়ে অবধি বিশাল আলোজ্বলা হোর্ডিং-এ জন আব্রাহাম-বিপাশা বসুর প্রায় ঝলমলাচ্ছে কবি স্টার-স্টারির মুখ, এ বারে সত্যিই কোনও চালাক চকিতে কাব্য-কোচিং ক্যাম্প খুললে বিকট লাভ এবং মা-বাবারা ‘সারা দিন পড়ে পড়ে ঘুমোস কেন খানচল্লিশ কোব্‌তে লিখতে পারিস না’ ধমকরত, আর বইমেলায় টিভি চ্যানেলরা মাইক বাগিয়ে তেড়ে আসছে ‘আচ্ছা এই যে লোকে বুক ফেয়ারে এসে খিচুড়ি খাচ্ছে এ বিষয়ে বলুন’ এবং তাদের কেউ ভেংচি কেটে বলছে না ‘এই যে বইমেলায় টিভি কোম্পানি এসে কনুই গুঁতিয়ে সঁধিয়ে গেছে সে বিষয়ে বলি বরং’— তখন, মোক্ষম

সিফনিতে চুড়ান্ত মোমেন্টে ধড়াস সম্ পড়ার মতন, বিক্ষুব্ধ বীচিমালায় হড়াস তিমি-ঘাইয়ের মতন, নিশ্চিত ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে আ-টিশুম এরোপ্লেন ঢুকিয়ে দেওয়ার মতন, 'হারবার্ট'কে ঝড়াকসে হিট করিয়ে দিলেন নন্দন-কর্তৃপক্ষ।



হারবার্ট বইমেলায় ফুরিয়ে ফাঁক, পাগলের মতো ছাপা হচ্ছে ফের, সঙ্গে নবাবুণ ভট্টাচার্যের অন্য সব বইও পাইপাই, নিশ্চয় লেখকটি হেসে খুন কারণ হারবার্ট ১৯৯৩ সালে বেরনোর পর চর্চাবান মহলে উন্মত্ত হইহই পড়ে গেলেও সাধারণ মানুষ ঘুণাঙ্করেও পাত্তা দেননি, এবং পাত্তা দেন না দেবেন না কোনও দিন এমন এক অভিনব সিরিয়াস ও জটিল বইকে, বরং 'শাল্‌হা আঁত্তেল' বলে হোয়াক থুঃ গুটখা-ফেলন নিয়ম, কিন্তু হুঁ হুঁ বস বিতর্ক সুপ্রিম-মহিম, আজি ১৩ বছর পরে হুহা হুজুগ, যাক নবাবুণবাবুও বিখ্যাত হলেন তবে। ভরসা: ছবি করে এক বার নন্দনবাবুদের হাতে পায়ে ধরে আটকিয়ে নিতে পারলে অমিয়ভূষণ মজুমদার সুবিমল মিশ্র উদয়ন ঘোষের বইও বিক্রিবাটা করা যাবে বিস্তর, সম্ভাব্য স্ট্র্যাটেজি হিসেবে মন্দ কী? মজা: বগলে নবাবুণ নিয়ে বাড়ি তো গেলেন, এ বার 'ফ্যাতাড়...' বা 'কাঙাল মালসাট'-এর তেড়ে থিস্তিখামারি কিঞ্চিৎ মনে ধরলেও হারবার্ট-এর জটিল ও বহুস্তর আখ্যান গিলতে গোলা পাঠকের ক্যাসান মগজ গুড়ম হয়ে লাগ উস্তখুস্তম লাগ, ভাবলে মুচকি ও কিছু ক্ষণ পর অট্ট চাপা দায় হয়ে যাচ্ছে। তার ওপর ছবিটির পরিচালক সুমন মুখোপাধ্যায়ের নাটক দেখলেই বোঝা যায় ভদ্রলোক দুর্দান্ত শিক্ষিত ও সাংঘাতিক প্রতিভাবান, যদি এমনকী বেশি কায়দা না করে শ্রেফ গ্রন্থটিকে অনুবাদই করেন চিত্রভাষায়, তা হলেও ফিল্ম হবে বিস্তর ব্রেনব্যায়ামসাপেক্ষ। ছবি এমন কথা বলে বোঝে না সকলে। গোলগাপ্পা গল্পো নেই, প্রেম উঁহু, সুমহান 'যুক্তিবাদ'কে দেখা হচ্ছে রাষ্ট্রের ক্ষমতার সঙ্গে সমার্থক (সুতরাং ভিলেন) হিসেবে, এবং জোচ্চোর অপদার্থ হারবার্ট পাচ্ছে ঐশ্বর্য-সমর্থন। মোদ্দা ভাষায়, এ সিনেমা এমনিতে চলার কথা কাঁটায় কাঁটায় এক হপ্তা। তাও বড়জোর চারটে রো ভর্তি। কিন্তু হা, সেন্সরবাজি বাগিয়ে এমন একস্ট্রা মনোযোগ আকর্ষণ, একুনে মেসেজ পৌঁছানোর সম্ভাবনা উন্মিত সে ছ'গুণ। আর, সবচেয়ে বড়, 'মেসেজ' আবার কী? এ সব বস্তাপচা টার্ম বিশ বছর হল উঠে গেছে। শিল্পের মেসেজ বুঝে কিছু লোক জীবনে তা প্রয়োগ করবেন, তাই নিয়ে আলোড়ন ঘটবে, বিদ্রোহ— এমন আজগুবি-কাটিং ধারণা চলত ষাটের দশকে। তখন এ উদ্ভট দিবাতর্কে ইন্টেলেকচুয়ালদের কত না প্রহর রঞ্জিত থেকেছে। শিল্পকে প্রাণপণ ওভার-এস্টিমেট করার সে বদহজম এ অগাল্যাঙে এখনও চলেছে, বইমেলা একটু ঘুরলেই তার টেকুরের তোড় বোঝা যায়। কিন্তু ছবি-শিল্পের তাবড় আভাঁ-গার্দ রাঘব-বোয়াল আজ সাক্ষাৎকারে স্বীকার যান, সরি, তখন ভেবেছিলুম, কিন্তু ফিল্ম করে সমাজ বদলানো যায় না। এটু মন দিয়ে ভাবুন, বদলানো যায় না কাব্য করেও, পুতুলনাচ দেখিয়েও। আরে, এ সব বায়বীয় ভুড়ভুড়ি লিটল ম্যাগের থাকবে, পাড়ার থিয়েটার গ্রুপের থাকবে, ক্ষমতা-সেন্টারের থাকবে কেন? তাকে তো হেজিমনি

বুঝতে হবে মাসিমণির মতোই আপন করে? আধুনিক ক্ষমতায় গদিদীপ্ত থাকতে গেলে শুধু গর্বগোঁয়ার হলে হয় না, বিলক্ষণ পরিণতি ও বুদ্ধিমত্তা দরকার। একটা আঁতেল সিনেমাকে কেউ ভয় পায়? ছোঃ! বেয়াড়া স্বরের টুটি চেপা তো দূরস্থান, বরঞ্চ ‘ওম্মা কী ছোন্দর গালাগালি দিচ্ছে’ বলে তাকে কোলপাঁজা করে কিঞ্চিৎ নাড়ু খিলাতে হয়: চাড্ডি পুরস্কার, গালে হামি। অমনি জনগণ ঘেঁটে ঘণ্ট। এ এখন শাসনের কপিবুকে ঢুকে ক্লিশে। আর, শিল্পের সত্যি দাঁত-নখ থাকলে চরাচরে ধারাবাহিক ফেরেবাজি চলত? বুশকে কাপড় খুলে দিয়ে কান ফেস্টিভ্যালে সেরা ছবির প্রাইজ পেয়ে



রং দে বসন্তী : লম্বা দৌড়ের যোড়া

আমেরিকার ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি টাকা-করা তথ্যচিত্র হয়ে ‘ফারেনহাইট ৯/১১’ বুশের ফের নির্বাচিত হওয়া আটকাতে পেরেছে?



আর মেসেজ যদি এতই শক্তিশালী হয়, ‘রং দে বসন্তী’ তো একেবারে অষ্ট-ব্যান করে দেওয়া উচিত। পরাধীন ভারতে অত্যাচারী ব্রিটিশের সঙ্গে এখনকার ভারতের দুর্নীতিবাজ মন্ত্রীকে একেবারে আক্ষরিক ‘ছবছ’ বলা হচ্ছে, জেনারেল ডায়ারের মুখ ও প্রতিরক্ষামন্ত্রীর মুখ খাপে খাপে মিলিয়ে নাগাড়ে ডিজল্ড: নিরীহ মানুষকে মারতে দুয়েরই উল্লসিত উচ্চারণ ‘ফায়ার’! সাধারণ মানুষের মিছিলে আমাগো গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের পুলিশের নির্মম লাঠিচার্জকে ব্রিটিশ রাজে শান্ত সমাবেশে পুলিশের আকাঁড়া জল্লাদবাজির মতোই ধর্ষকামী বলে উপস্থিত করা হচ্ছে। কী অসামান্য ছবি, কী তীব্র বিষয়-নির্বাচন! ‘এই টি-শার্ট জিন্স+ভাংরা রক জমানায় দেশপ্রেম নামক আবেগ আদৌ প্রাসঙ্গিক?’— এই নিয়ে এমন স্মার্ট ছবি করা যায়? যা গোড়া থেকেই মান্টিগ্লেক্সের পল্লবগ্রাহী ঝিৎকু-জেনারেশনের লব্জ ব্যবহার করেই তাকে স্ট্রেট বোঝাবে, কী বলতে চায়? ‘অ বাবা, এ সেই দেশের জন্য আত্মদানের ন্যাকা মিশন’ মর্মে তার সম্ভাব্য ব্যঙ্গ, খ্যাখ্যা, প্যাক-কেই প্রধান চরিত্রগুলিকে দিয়ে আগে বলিয়ে নিয়ে, তার তন্নিষ্ঠ উত্তর দিতে চাইবে? এবং আইনঙ্গ-জেনারেশন জেগে না উঠুক, মোবাইল চেপ্তে বন্ধ করে রুদ্ধস্থাসে ছবিটা দেখবে দপদপে হৃদয় নিয়ে? অতুলনীয় মেকিং আর প্রত্যেকের তুখোড় অভিনয় তো ছেড়ে দিলাম, আমির খান-কে অবধি বিরাট প্রাধান্য না দিয়ে ‘একটা গোটা বন্ধুর গ্রুপ’কে নায়ক হিসেবে ট্রিট করাটাও, কিন্তু বারে বারে সিরিয়াস মুহূর্ত ভেঙে দিয়ে জেট-গতি ও সপ্রতিভতায় ঝকঝক অকল্পনীয় আর্বান স্ক্রিপ্ট? স্পেস নেই, সংক্ষেপে: ছবিটা দেখুন দেখুন দেখুন দেখুন দেখুন দেখুন।

৫ ফেব্রুয়ারি, ২০০৬

ব হু রু পে স ন্মু খে তো মা র
ছা ডি কো থা খুঁ জি ছ স্যা টা ন
রি ং টো নে ডা কে সে তো মা কে
দি নে রা তে মু লে রা খে কা ন

বসন্ত আসছে, বৃশ আসছেন, বিবর আসছে, ব্রোকব্যাক মাউন্টেন ধেয়ে আসছে অস্কারের দিকে, ব দিয়ে আর কী কী আসছে না জানলেও, বিবর্তন ঝাঁপিয়েছে বেবাক বুমবুমিয়ে, সেই শিলাজিৎ কবে 'তুলু তুলু চোখ শালা' রচেছিলেন আর আমরা গাইতে লজ্জার গুটুলি গিলতাম কিন্তু আজ 'রং দে বসন্তী'র 'অ্যায় সালা' ডাউনলোডাচ্ছি ও গুনগুনাচ্ছি পটাংসে, কী এস্মার্ট র্যালা, সুবিধেও, কাউকে অ্যায় সালা ডেকে বিপদে পড়লে হিট গান গাইছিলুম বলে অভূহাত হাতানো দিব্যি, সত্যি দিনকাল অদলাচ্ছে ও বদলাচ্ছে সুপার-গিরগিটি যেন বা, বাংলা গানে পড়ছে চিড়বিড়ে 'গরম মশালা' যা রগরগে নেতাসমৃদ্ধ ভিসিডি আর হিন্দি গানে সুরকার স্বয়ং টাইট গেঞ্জি পরে নেমে পড়ছেন অহরহ মিউজিক ভিডিয়োময়, নয়ি-নবেলি 'ঘরানা' গজায়মান দোসর শ্লোগানধ্বনিসহ, যেমন আদেশ শ্রীবাস্তবের 'জয় হো' ঘরানায় গুরু/শিষ্যরাশি যেই না ঘোষিবেন 'জয় হো' সঙ্গে সঙ্গে ক্যাডারসুলভ তুরন্ত রিফ্লেক্সে সমবেত চিকুর 'মঙ্গল-ময় হো', হিমেশ রেশমিয়ার 'জয় মাতা দি— ল্যাটস রক' শুনলেই গদগদ জপতে হবে 'রক দ্য ওয়াল্ড', আর হ্যাঁ গান-কম্পিটিশনে রমরম ঝিকিয়ে উঠছে কুৎসিত প্রাদেশিকতার কাদা-ছোড়াছুড়ি, অমুক রাজ্যে শুধু ঘরের ছেলের সাপোর্টে লাখসহস্র এস এম এস ফ্যায়লানোর কাজে জনজীবন দড়াম স্টপ, ভোট দিন ভোট দিন আমাগো পোলাকে সর্বদেশীয় আইকন করুন, তার জন্য অফিস ছাড়ুন কলেজ বন্ধ রাখুন দোকানে শাটার নামান প্রেমে তালা, এবং সত্যিই অকল্পনীয় এই শিল্পের বিচারকে গণতন্ত্রের আঙিনায় এনে কাপড় খুলে দেওয়ার প্রকল্প, গায়ক বাছবেন গায়িকা বাছবেন নায়ক বাছবেন নায়িকা বাছবেন মিস ইন্ডিয়া বাছবেন আনপড় গাড়ল জনতা, কারণ বিচারক হতে গেলে আর চর্চার দরকার নেই স্রেফ কিছু খরচা, একটি মোবাইল ও একটি আর্থারাইটিসহীন বুড়ো আঙুল যার নিরন্তর টিপুনিতে আপনি সকাল থেকে বিকেল পাঠিয়ে যাবেন নাগাড় এস এম এস, এবং এ ভাবেই আপনি সজনে উঁটার দাম ও উদোম খিস্তিখেউড় ভিন্ন কিছু না জেনেই হয়ে উঠতে পারবেন গায়কের মি লর্ড নায়কের মায়-বাপ লেখকের হুজৌর আঁকিয়ার সরকার, কারণ আপনিই যে গণো, প্রবল প্রথর ও প্রকাণ্ড গণো, সবজান্তা কা তব কান্তা গণো, ক্রেতা কনজিউমার মার্কেটধারী

পালনহারী গণো, গনোরিয়া ব্যতীত সর্বত্রই আপনার মহিমা সুকীৰ্তিত আর মোবাইল কোম্পানি ও চুটকিচ্যানেলের প্রফিটের সঙ্গে ওতপ্রোত, এর পর হে ভগা দ্রুত সিদ্ধান্ত জানান অমর্ত্য সেন না সুখময় চক্রবর্তী কে বড় অর্থনীতিবিদ এবং নোবেল কমিটির ফোনে পিঁকপিঁক ধ্বনিতে তা আবির্ভূত হোক সন্ধে ছ'টার মধ্যে, কিংবা ইন্টারনেটে ভোট হানুন মার্কেজ না কুন্দেরা কে বেশি আধুনিক, এবং বুকায় থেকে ম্যাগসাইসাই স্বর্ণভল্লুক থেকে ভারতবর্ষ সর্বত্রই আপনি সংখ্যাবাজির তোড়ে গুঁতিয়ে ভাগিয়ে দিন জ্ঞান ও বিদ্যার জঘন্য ঘোঁট আর গাঁতিয়ে প্রতিষ্ঠা করুন গর্বগাধামির সপ্তস্তু, এ ভাবেই বচন হয়ে উঠুন শতাব্দীর সেরা অভিনেতা এবং রবার্ট ডি নিরো ঘাস খান মাস্তোইয়ানি বিচুলি দেপারদিউ জাবনা, এ ভাবেই নিউটন ও আপেলের চারুগপ্পোটুকু মুখস্থ করেই আপনি স্টিফেন হকিং-এর তত্ত্ব-মগজটি ছেকে ফেলুন ফুটোস্কোপ দিয়ে, সারা জীবন ইন্দ্রজাল কমিক্সের বেশি কিছুটি না পড়ে চাঁচিয়ে বলুন জেমস জয়েস একটি অশ্বাভিষ কারণ তাঁর বাক্যগঠন আপনার মাথায় ঢোকে না, এবং 'পথের পাঁচালী' ঘোড়ার নাদ 'বেদের মেয়ে জোসনা' জিন্দাবাদ, এই অ্যাডিনে চরাচরে নেমে আসুক আসলি জন্মোগন্মোমন্মো আর যে আঁতেলরা ভেবেছিলেন আজীবন সাধনা করে তবে বুঝদার হতে হয় তাঁদের নিতম্বে মারুন জোড়ালান্থ বা ট্রিপ্লট, আর তৈরি করুন আপনার একান্ত স্টার মনীষী গোদাপুরুষ কারণ পিপ্পল গেট দ্য মহাতারকা দে ডিজার্ড এবং গোটা পৃথিবীকে চলতে বাধ্য করুন ছক মেনে প্রথায় গড়িয়ে গডলিকায় গ্যাদগেদিয়ে বাজারের হাড়িকাঠে গলা গলিয়ে, কারণ গং ভাঙলে আপনি চোখেনাকে বুইতে পারেন না মহত্বের মুখ দেখলে আপনার নিরক্ষর রোমরাজি কিরকিরিয়ে ওঠে, আর কাল যদি অস্কার পায় 'ব্রোকব্যাক মাউন্টেন' যা দুই পুরুষ-কাউবয়ের প্রেম নিয়ে রচিত, যদি সেরা অভিনেতা হন ফিলিপ সেমুর হফম্যান যিনি অ্যাক্টো করেছেন সমকামী লেখক ট্রুম্যান কাপোট-এর চরিত্রে, সেরা অভিনেত্রী হন ফেলিসিটি হাফম্যান যিনি সেজেছেন রূপান্তরকামী (ওর মানে হল যে পুরুষ মহিলা হতে চান অথবা যে মহিলা হতে চান পুরুষ) তবে ভেঙে দিন গুঁড়িয়ে দিন কালো আর্ট কারণ এ সব কী অসভ্যতা জঘন্য পারভার্টদের কাঁটাল না পাকিয়ে খামখা আদিখ্যেতাকাব্যি, এবং আপুনকো বারোয়ারি কলচর ছড়িয়ে পড়ুক দিকে দিগন্তরে কারণ 'ওই মহামানব আসে পাঁচটার পর ট্রামে-বাসে' আর এ মোচ্ছবের ম্যারাপ তৈরিতে শয়তানের দূত, ফাউস্টের আত্ম-কেনার ডিলার মেফিস্টোর ভূমিকায় খেলে চলুক সবার গান্ধু-হাতের তালুর অবিচ্ছেদ্য ফোঁড়া: মোবাইল।



মোবাইলহীন মনুষ্য যে কিড়ে-মকোড়ে তা শুধু সপ্রতিভতার কোণ থেকে নয়, ঘনিষ্ঠতার অ্যাঙ্গল থেকেও নয় (আয়ারল্যান্ডে এখন মৃতের সঙ্গে তার মোবাইলকেও কবর দেওয়া ফ্যাশন, কারণ তীব্র বিবাহও যদি বা 'টিল ডেথ ডু

আস পাট' মর্মে মৃত্যু দেখে ব্রেক কষে, মোবাইল-আপ্লেশ তৎপরেও বহমান), নয়া ফাভা: মোবাইল শিক্ষামূলক! হাঁ বটে। ফোন-সার্ভিস 'ডট মোবাইল' ইংল্যান্ডের ছাত্রদের মুখ চাহি শুরু করল বিভিন্ন প্রুপদী সাহিত্যগ্রন্থকে এস এম এস টেক্সট-এ ঝড়াক নামিয়ে আনার প্রোজেক্ট। শেক্সপিয়রের গোটা রচনাবলি বাগানো হবে এপ্রিলের পূর্বেই। স্কিম-থিম: তিন-চার লাইনের মধ্যে সাহিত্যের ক্লাসিকগুলোর সামারি ফোনে ফোনে সেডুয়া। শৈশবে জানতেম ভাওয়েল বিনা ভাষা কানা, আজ সে পাঁচ ভাই চম্পাকে সপাট ধোনিতে সীমানার ও-পারে পাঠায়ে বিশ্বখ্যাত দোকানের সাইনবোর্ডেই স্রেফ 'rbk', ট্রাফিক নির্দেশ ক'দিন বাদেই 'trn lft', এবং প্রেম 'swthrt, plz rply!' অতএব থান গগ্নো-নাটকের মেদ বাছতে ও চাঁছতে ক'দণ্ড? হুস্বতার মহাজমানা, ব্রিটেনে হইহই ফেলেছে '১০০ মিনিটের বাইবেল', ৫০ পাতায় সরল গদ্যে শর্টায়িত, এবং অস্ট্রেলিয়ার 'বাইবেল সোসাইটি' অধিক কাঠি বেড়ে ঝলসেছে 'এস এম এস বাইবেল', টেক্সট মেসেজিং-এর ঝিংকুচাকুতে নয়া জেনেসিস ১: ১—'In da Bginnin God cre8d da heavens & da earth.' এ ব্লাবধর্মে দীক্ষিত হয়ে কেন না বঙ্গভাণ্ডারের বিবিধ অতন অবোধ জেনেক্সট-ঘাড়ে রোপণ করি রোচক ও টুকুন মোবাইলাঙ্গিকে— গোরা: 'ভাবতেন হিঁদুয়ানি ছাড়া সবই ব্যান্ড, এ দিকে নিজেই আয়ারল্যান্ড!' কপালকুণ্ডলা: 'কাপালিকের মেয়ে কোরো না ম্যারেজ, সমুদ্রের তলায় অস্তিম গ্যারেজ!' সাথে কি প্রখ্যাত ভয়লেখক স্টিফেন কিং-এর সাম্প্রতিক বিভীষিকা-নভেল 'CELL', যাতে মোক্ষম মুহূর্তে মোবাইলের মধ্য দিয়ে 'The Pulse' বয়ে এসে বিশ্বের প্রায় সকলকে মুহূর্তে বানিয়ে দেয়

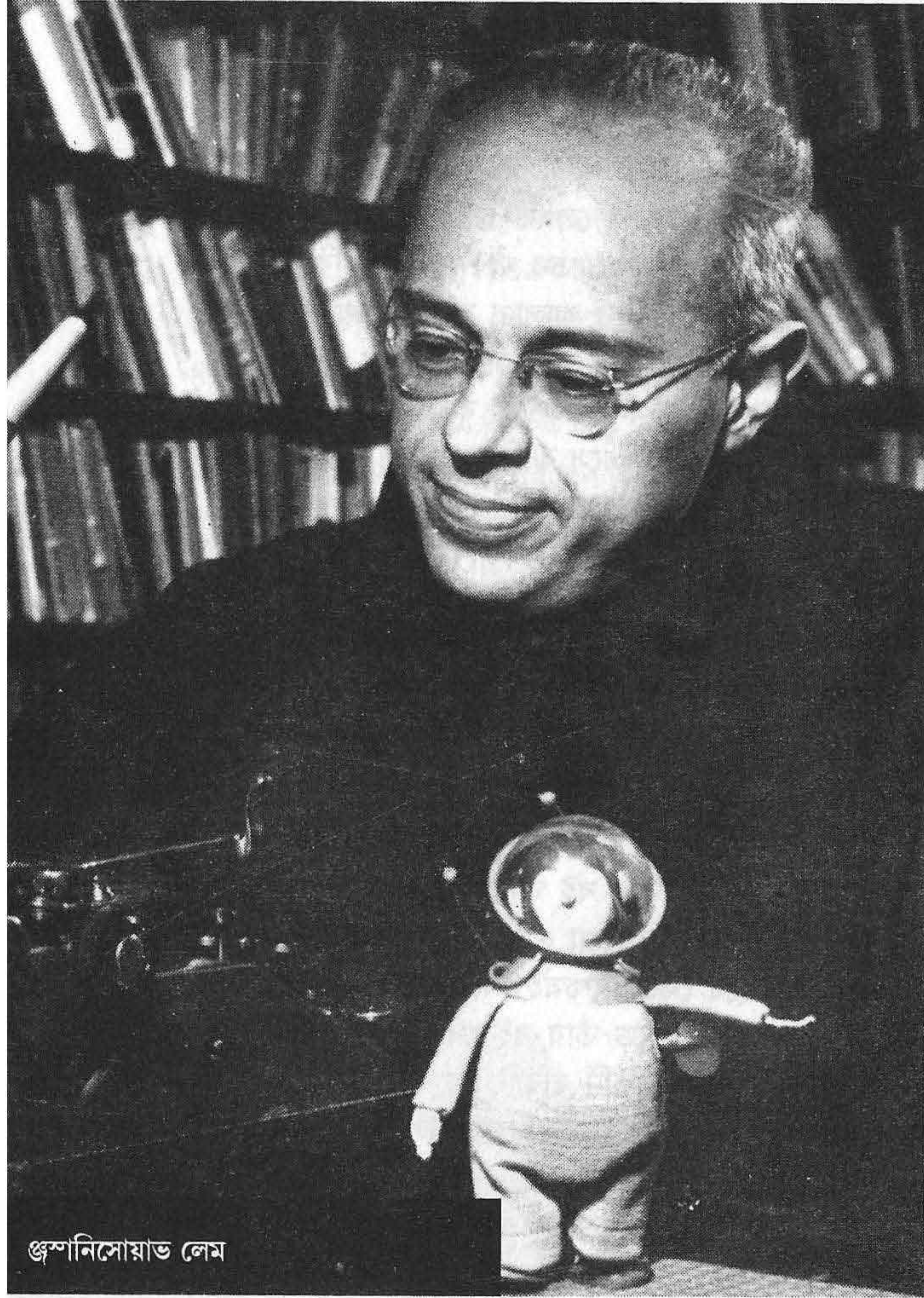
zombie (অনুভূতিহীন থপথপে জড়ভরত মনস্টার), এবং পাশের বাড়ির বাচ্চাটি তার মা'কে খাচ্ছে রিপোর্ট করতে যেই আপনি মোবাইল তুলে নেন, ব্যস, আপনাকেও। শুধু সেলহীন কিছু মানুষ বেঁচে পালাতে থাকে কিন্তু সর্বত্র পিলপিল করছে খুনি 'Phoner'-রা, আর দেওয়ালেদেওয়ালে আঁকাবাঁকা লেখা 'Kashwak=No-Fo', অর্থাৎ কশওয়াক অঞ্চলে ফোন রিসেপশন নেই তাই ওখানে পালাও একমাত্র ওখানেই পেতে পারো জীবন, কিন্তু কত দূর আর কত দূর সে কশওয়াক, ক'শো ওয়াক তুলে ধাস্টামি উগরে দিলে পৌঁছব সে ছোটবেলাগঞ্জে হে মামাস্টিফেন, যেথা ফুরাবে এ বাজারের রাঙা-অহিফেন, চোখ তুলে কথা ক'বে নিশ্চয়ন বনলতা সেন!

সেলফোন এখন দেহকোষ



যে জন ছকের বাহিরে

গত সোমবার, ৮৪ বছর বয়সে, মারা গেলেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ কল্পবিজ্ঞান কাহিনি-লেখক স্তানিসোয়াভ লেম। অবশ্য এ লাইনটা পড়লে লেম খুব রাগ করতেন, কারণ তিনি এই লেবেলটাকে খুব ভালবাসতেন না। কেন যে কিছু যন্ত্রপাতি আর বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের কথা লিখলেই একটা উপন্যাসকে ‘সায়েন্স-ফিকশন’ ছাপা মেরে আলাদা করে দেওয়া হবে, আর সবাই ‘ওঃ, ও তো গাঁজাখুরি! আসলি সাহিত্য লিখলে বলিস’ বলে গ্রাস্তারি হয়ে নিজ কাফকায় সঁধিয়ে যাবেন, আশ্চর্য। বিভূতিভূষণের লেখায় প্রকৃতিবর্ণনার আধিক্য থাকলে ‘আরণ্যক’কে ‘বোটানি-ফিকশন’ বলা হয় কি? এমনিতেই আমরা চলতি ধারণায় সাই-ফাই বলতে যা বুঝি, কিছু ল্যাঙ্ল্যালা ভিনগ্রহের প্রাণী এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল আর নীলচে-সবজে রশ্মি দিয়ে হোলসেল মার্ভার, আর আমরা হল থেকে বেরোতে বেরোতে বললাম ‘উরিশ্লা, কী স্পেশাল এফেক্ট!’— এই দেখনদার গাধামির থেকে অযুত যোজন দূরে পূর্ব-ইউরোপীয় ও রাশিয়ান কল্পবিজ্ঞান। সেখানে নিয়ত মানুষকে চিরে চিরে তার মৌলিক উপাদান ও নির্যাস খোঁজা, তার ধারণা-নীতি-সভ্যতাকে তৌল করার চাষ। এবং এর রাজা হলেন লেম। পোল্যান্ডের এই জিনিয়াস এমন আপাত-শিশুপাঠ্য মজাগল্প অবধি লিখেছেন, যা একটু মন দিয়ে পড়লেই ধাঁ করে সেমিনার শুরু। একটা যন্ত্র ‘n’ দিয়ে তৈরি যাবতীয় জিনিস বানাতে পারত। অনায়াসে সে বানাবে ‘nail’, ‘newspaper’, ‘nut’, এমনকী ‘night’, কিন্তু তাকে যদি ‘nothing’ বানাতে দেওয়া হয়?! এক বৈজ্ঞানিক অনেক পুতুল বানাল যারা নড়তে-চড়তে পারে, ভাবতেও পারে। ছোট্ট কাচের বাস্তবের মধ্যে তারা দেখতে দেখতে দেশ, সংস্কৃতি, আইন, সবই গড়ে তুলল। এ বার যখন তারা যুদ্ধ করবে, তা থামাবার দায় বৈজ্ঞানিকটির আছে না নেই? লেম-কে বিশ্ব দার্শনিক হিসেবেও জানে, রসসাহিত্যিক হিসেবেও। ৪১টি ভাষায় তাঁর বই অনূদিত হয়েছে, প্রায় তিন কোটি বই বিক্রিও ঘটেছে, কিন্তু না, তা বলে সিরিয়াসলি নেওয়া? ছি। ‘ফিলাডেলফিয়া এনকোয়ারার’ অসামান্য বলেছে: ‘লেমকে যদি শতাব্দীর শেষেও নোবেল পুরস্কার না দেওয়া হয়, বুঝতে হবে কেউ নিশ্চয়ই বিচারকমণ্ডলীর কাছে গিয়ে লাগিয়েছে, তিনি কল্পবিজ্ঞান কাহিনি লেখেন!’ সারা বিশ্বে লেমের নাম ছড়িয়ে পড়ে তাঁর বই থেকে আন্দ্রেই তারকভস্কি ‘সোলারিস’ ছবিটি করার পর। এ কথা পড়লেও লেম খুব রাগ করতেন, কারণ তিনি ছবিটি দেখে খেপে লাল। তারকভস্কিকে বলেছিলেন: ভাই, সোলারিস নয়, তুমি বানিয়েছ ‘মহাশূন্যে ক্রাইম অ্যান্ড পানিশমেন্ট’! সোলারিস একটি গ্রহ, যার প্রায় পুরোটাই এক মহাসমুদ্র। সে সমুদ্রের ‘চেতনা’ আছে! সে মানুষের মনের ভেতর ঢুকে তাদের স্মৃতি, আকাঙ্ক্ষা, ভয়কে খুঁড়ে বের করে, এবং তার ‘বাস্তব’ রূপ বানিয়ে ছুড়ে দেয় মহাকাশযানের মধ্যে। নায়ক কেলভিন



জ্ঞানিসোয়াভ লেম

সেখানে পৌঁছানোর কিছু পরেই দেখতে পায় তার মৃত্যু স্ত্রীকে। সে আত্মহত্যা করেছিল, এখন স্বাভাবিক ভাবেই কেলভিনের সঙ্গে কথা বলে। এ বার প্রশ্ন, এ কি সত্যিই সেই মানুষটা? তার চালচলন, রূপ, অভ্যাস, সমস্ত, সমস্তই হুবহু যেমনটি ছিল, তেমনই। মানুষ কি তবে শুধু এক ‘ডেটাস্কেপ’, কিছু নির্দিষ্ট স্মৃতি-স্বপ্ন-অনুভূতির একটা সমষ্টি, খুব জটিল ইনফর্মেশন-ওলা একটা সিডি, যাকে ক্ষমতা থাকলে কপি করে ফেলা যায়? আরও বড়: এই অদ্ভুত মনপুতুলগুলি পাঠিয়ে সমুদ্র কী বলতে চাইছে? খেলছে? নিরীক্ষার গিনিপিগ হিসেবে মানুষকে ব্যবহার করছে? এমনিতে কল্পবিজ্ঞানের গল্পে থাকে আজগুবি জীব, তার আপাত-আজব আচরণের উদ্দেশ্য বা ধরনখাঁচ কিছু ক্ষণ বাদে মানুষ ধরে ফ্যালাে। কিন্তু, যদি মহাবিশ্বে এমন কিছু থাকে, যা কোনও নির্দিষ্ট আদলকেই অস্বীকার করে, বারে বারে বদলে যাওয়া তরঙ্গমালা ছাড়া আর কিছুই না হয়? আমাদের কোনও ভাষা/ভাবনার ছকেই যদি আমরা তার সঙ্গে যোগাযোগ না করতে পারি? এবং সেও যদি ‘যোগাযোগ’ করে এমন প্রক্রিয়ায় যা আমাদের সব হিসেব-বহিঁভূত? তখন? আমার তাকে বোঝার মধ্যে যে অনবরত আন্দাজ ও অনিশ্চয়তার অসংখ্য ফোকর, তাও কি তার ইচ্ছেপ্রণোদিত? (দেরিদাবাজরা লক্ষ করুন)। লেম উপন্যাসে এই সমস্যা ও প্রশ্নগুলি ক্রমাগত ছুড়ে যান, ভাবতে ভাবতে চান, এই অনন্ত ও আশ্চর্য মহাবিশ্বের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক কী? কোটি কোটি বিন্দুর মধ্যে পৃথিবী একটা ছোট্ট ডট। তার একটা প্রাণী মানুষ। সে

কী ভাবে তার ডাবডাব মন নিয়ে বুঝতে চেষ্টা যাবে এই অকল্পনীয় বিশালতাকে? আর তারকভক্ষি এ সবকে নিছক ব্যবহার করেন নায়কের 'পৃথিবীর জন্য মন-কেমন' ধরতে। প্রেমকে স্বর্গীয় গুরুত্ব দিতে। তাঁর ছবিটা পৃথিবীতে মানুষের যাপন নিয়ে, ভিন্নগ্রহটা অজুহাত। এই 'বিরটত্বকে ছেঁটে ফেলা'তেই লেমের আপত্তি। 'ছবি দেখে মনে হয় হতভাগা নায়ক বেচারি নায়িকাকে আত্মহত্যা প্ররোচিত করেছিল, এখন প্রবল অনুতাপে দগ্ধাচ্ছে।... আর জঘন্য হল, নায়কের বাপ-মা, এমনকী মাসিকেও দেখানো। মা-টা তো সবচেয়ে খারাপ, কারণ সে 'মাতা বসুন্ধরা'!... সবচেয়ে অসহ্য এই 'ইমোশনের ঝোল', যাতে তারকভক্ষি আমার চরিত্রগুলিকে চুবিয়ে দিয়েছেন।' লেম-এর অসামান্য ভাষার খেলা, বহমান কৌতুক আর তীব্র দার্শনিক প্রশ্ন তৈরি তাঁকে অনবদ্য লেখক করেছে। তাঁর নায়করা সবজাত্তা মাচো নয়। তাদের আত্মবিশ্বাস নেই, প্রায়ই ধাঁধায় পড়ে, আঙুল ট্রিগারে কাঁপতে থাকে। নভোযাত্রী পিরক্স-এর অসহ একঘেয়ে লাগে ঘন্টার পর ঘন্টা খাঁখাঁ স্পেসে রকেট চালাতে, রুখু ন্যাড়া ভিনগ্রহের আউটপোস্টে দাঁড়িয়ে তার হাই ওঠে, কখনও মোলাকাত হয় শত্রু-রোবটের সঙ্গে, যাদের আর মানুষের অধীনে কাজ করতে ভাল্লাগছে না। বিদ্রোহী রোবটের কথা অনেকেই লিখেছেন, কিন্তু লেম যুক্তির পর যুক্তি সাজিয়ে দেখান, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স-এর চূড়ান্ত রূপ দিয়ে আমরা যদি রোবট বানাই, সে হবেই স্বাধীন চৈতন্য-সম্পন্ন, সুতরাং তাকে ক্রীতদাস রাখার ন্যূনতম অধিকার আমাদের নেই। তার চেয়ে বড়: সে প্রশ্ন করতে শিখবেই তার অস্তিত্বের কারণকে, তার 'মিশন'কে, এবং সে আর 'রোবট' থাকবে না, তার মধ্যে চুঁইয়ে যাবে শুধু অ-বাধ্যতা নয়, দ্বিধা, আত্মসন্দেহ, এমনকী আত্মহননেচ্ছা। বার বার লেমের লেখায় অমীমাংসেয় সমস্যা, উত্তরের অতীত জিজ্ঞাসা আমাদের ধী ও নীতিবোধকে তাড়া করে। তাঁর প্রজ্ঞার প্রতি যথাসাধ্য কুর্নিশ।

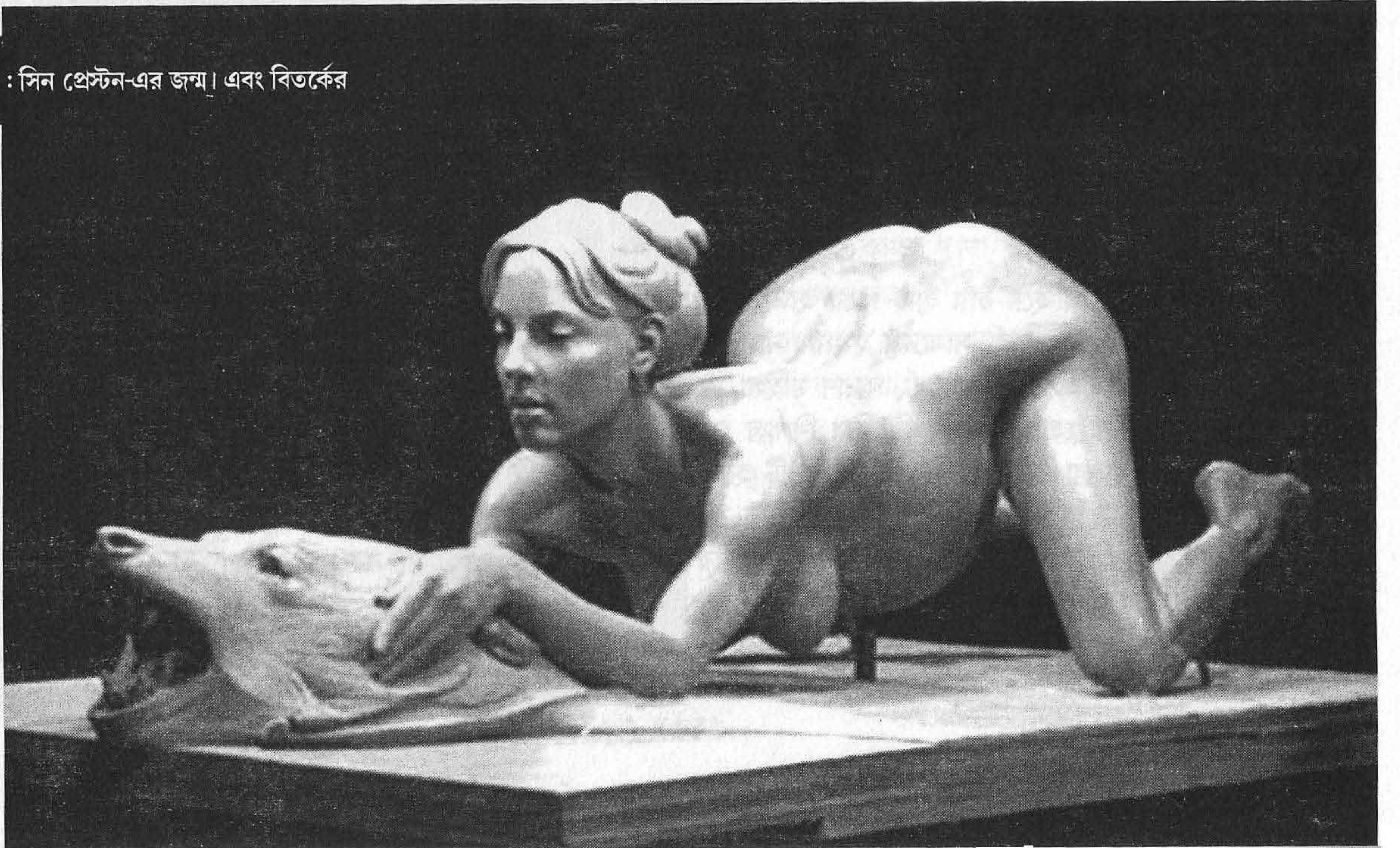


ব্রিটনি স্পিয়ার্স সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে চার হাত-পায়ে হামাগুড়ি দিয়ে তাঁর সন্তান প্রসব করছেন— প্রমাণ সাইজের ভাস্কর্যটি প্রদর্শিত হতে চলেছে নিউ ইয়র্কে, সামনের হপ্তায়। নাম: 'মনুমেন্ট টু প্রো-লাইফ: দ্য বার্থ অব সিন প্রেস্টন।' ভাস্করটি বলেছেন এটা ব্রিটনির প্রতি তাঁর শ্রদ্ধার্ঘ্য, কারণ মহিলা কেরিয়ারের চেয়ে পরিবারকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন এই যুগেও। আর্ট গ্যালারি-র প্রেস রিলিজে ব্রিটনির বিশাল বেটপ পেট, ফুলে ওঠা স্তন ও স্ফীত নিতম্বের কথা ফলাও করে লেখা হয়েছে। বাহবা। তা হলে কেউ সেলিব্রিটি হলে তাঁকে ন্যূনতম সম্মানটুকুও করার দরকার নেই? বিশ্বের বহু মনীষীই, বলতে নেই, সন্তানের জন্ম দিয়েছেন। এ আর যদি তাঁদের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধায় তাঁদের প্রজনন-প্রক্রিয়ারত ন্যাংটো স্ট্যাচু তৈরি করে মোড়ে মোড়ে স্থাপন করি? আর 'প্রো-লাইফ' কথাটাও বাঁ করে ব্যবহার করা যায় না। এটি আবর্ষন-বিরোধী এক আন্দোলন, যা বলে: ভ্রূণকে হত্যা করা মানে মানুষকেই হত্যা করা। এর সমর্থনে ইন্টারনেটে আবর্ষনের লাইভ (বীভৎস) ভিডিও দেখানো অবধি হয়। আর এর বিপক্ষে 'প্রো-চয়েস' আন্দোলন বলে: নারীর নিজ

শরীরের প্রতি সম্পূর্ণ অধিকার আছে, সে তার শরীরের অংশকে ইচ্ছে করলে বাদ দিতে পারে। একশো কোটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ও বিতর্ক এ বিষয় ঘিরে যুগ যুগ আবর্তিত। ভ্রূণকে ‘ব্যক্তি’র অধিকার দেওয়া যায় কি? যদি বলি যার চেতন্য হয়নি সে ব্যক্তি নয়, তবে সদ্যোজাতকে খুন করা যাবে না কেন? আবার, ভ্রূণ শুধুই শরীরের ‘অংশ’ নয়, এ কথা বলছে কে? রাষ্ট্র? কোন রাষ্ট্র? যে, এ সন্তানটি জন্মালে তার বেঁচে থাকার ন্যূনতম প্রয়োজনগুলো মেটাতে পারে না? আরও: এই ভ্রূণদরদি ‘পরিবার’বাজির মধ্যে আসলে পুং-কৌশলের বিচ্ছিরি গন্ধ নেই তো? জটিলতর: কন্যাভ্রূণপাতের বিপক্ষে বলার সময় ‘প্রো-চয়েস’রাই ‘প্রো-লাইফ’-এর মতো যুক্তি দেন। যেন তখন ভ্রূণ নয়, একটি জীবিত কন্যাকেই মারা হচ্ছে।— নিজ অশ্লীল কাণ্ড ঢাকতে এমত প্রবল ‘লোডেড’ কথা আলগোছে ছোড়ার জন্য শিল্পীকে একশো ছি।

২ এপ্রিল, ২০০৬

ব্রিটনি-র মূর্তি : সিন প্রেস্টন-এর জন্ম। এবং বিতর্কের



ডে মো ক্রে সি টি ভি র ডি ম

ওয়েদার টুইস্ট দিচ্ছে রহস্য-রোমাঞ্চ সিরিজের প্রায়। দুপুরে কুকুরখাপা রোদ, তাবৎ মোমপুতুলের রূপ জুলপি বেয়ে গলগলন্তি, ফের ফি সন্কেয় এ পকেটে ঠাণ্ডে কা তড়কা ও পকেটে ডাণ্ডে কা ঝড়কা নিয়ে হাঁউমাঁউ হাজির কালবৈশাখী, ব্যাকগ্রাউন্ডে চারুলতার ঝনঝনাৎ প্লাস হরে মুরারে। জোশের চোটে বড় হাঁ ভরে রবীন্দ্রনাথ আবৃত্তি করতে গেলেই দাঁতময় কিচিকিচি ধুলো। এরই মধ্যে অই দ্যাকো বারায়েছে ভৌ রবে ভোটের মিছিল। কী ভাগ্য দেওয়াল লিখন বন্ধ। একুনে মেহনতি মানুষ লভিল মিনিমাগনা দুরন্ত টি-শার্ট, ছাতা, টুপি, শাড়ি, ফনফনে পাঞ্জাবি, মায় এপ্রন। সিধে বাত? দেওয়ালে নয় খেয়ালে নয় বাঁশবাগানের শেয়ালে নয়, খোদ নিজ শ্রীঅঙ্গে চড়ায়েছে প্রতিনিধিকে! হেগেল থাকলে ইয়াহু, রাষ্ট্রকে যেটের বাছার ন্যায় কোলেকাঁখে বয়ে চলেছে জনগণ: আদর্শতম সমাজতম হইছেতম! আর এ ক্যাম্পেন কদ্দিন বহমান! ভোট মিটে যাওয়ার বর্ষ বর্ষ পরে, প্রার্থী ও আর্তি যখন পান্টেউন্টে হাপুস, ঘরে ঘরে তব ভি রণিত আশ্চর্য বাক্যবন্ধ: 'ও কী বাবা, আমার বুদ্ধদেবটা তুমি পরলে কেন? কিংবা: মা, পইপই করে বলেছি না, মমতাটা কেচে রেখো! বাকি রইল বডি-পেন্ট। গালে নেতা-নেত্রীর চাঁদমুখের দগদগে উল্কি, পার্টি ম্যাগ-প্রচ্ছদে ডেমি মুর-পূজা ভট্ট পেরিয়ে গরিব গর্ভিণী কৃষক-রমণীর সুস্বীত পেটে তুলির নিপুণ ছাপ, তলায়: 'উই প্রমিস, উই ডেলিভার!'

ও দিকে কেবল-কলহে উঠি গেলা স্টার। একতার সহিত বিচ্ছেদ! ভারতেতিহাসে শ্রেষ্ঠ নারী-নারী কামারাদারি স্যাবোটাজ! তবে কি গৃহবধূগণ, চারুহাসিনী বোরডমাদলসগমনা, শেষমেশ ম্যাজিকসন্ধ্যাগুলি বিতাবেন পোড়ামুখো স্বামীসনে প্রলাপে-বিলাপে? সেকাল-মার্কী দড়কচা গ্রন্থ-আশ্রয়? কিন্তু ঈশ্বর দয়ার্দ্র, এক কূলে বুলডোজার নামান তো অন্য কূলে নিউ টাউন তোলেন, সিরিয়াল-হুজুগ সরায়ে এল ভোটের দেদার ফুন্টি! গুচ্ছ গাড়ল স্তিমিতবাক অ্যাংকর দিকে দিকে ছড়ায়ে অ্যাঁ-ব্যাঁ রঞ্জিত রাশি রাশি অ্যানাল-ইসিস (গোদারের পুরনো 'পান'), ও দিকে প্রাণপণ নম্বর বাগিয়ে রেজাল্ট আউট নেতাদের, পাঁচ দফা প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে কে তুতলে কুল্লৈ মাইনাস পাঁচ, এমনকী গেম-শো: কুশপুতলিকা বানানো ও স্লোগান গর্জন রাউন্ড! অটোয় উঠলে মেট্রোয় নামলে যেমতি বাধ্যতামূলক গাঁতিয়ে গান, সংগীত না ভালবাসলে কলকাতায় যাতায়াত ব্যান, বিশ্বকাপের আগে যেমন গজাল মেরে খুলিতে রোনাল্ডিনহোর দাঁত, ব্রাজিলের পেনাল্টিছক না বুঝলে ভারতে থাকার অধিকার ধাঁ, তেমনই এ মোচ্ছবসিজনে চাও আর না চাও, সে তুমি বগলে পেঁয়াজ দিয়ে জুর আনো আর বাথরুমে সঁধাও, গুণ্ডিয়ে অঙ্ক কষো বা শীৎকেরে অঙ্কশয়ন, আট কুঠুরি নয় দরোজা তুবড়েদাবড়ে রইরই প্রবেশিবে মেগা-মুদ্রার ডেমোক্রেসির ডিম। এ বার তব মুষলপ্রসব: একটি ব্যালট

কম্পালসরি। যেমন রবীন্দ্রজয়ন্তী আগত ওই, এবে কানে তুলো পিঠে হেলমেট দিয়ে নৈর্ঝর্ত চিলেকোঠায় ঘুসলেও পিছু পিছু ধেয়ে নড়া পাকড়াবেই ‘এ’ ‘ও’ সমন্বিত সানুনাসিক গুচ্ছানর, যেন এক ঐশ্বরিক ছিঁচরোদন চরাচর প্লাবিয়া তোমাকেও চোবাবেই চোবাবে, তেমনই এই নাগাড়ে বাজিছে দেশ গঠনের দীপ্ত ঢোল-ডগর, তোমার নীলনাড়িতে আঁকশি পৌঁচিয়ে গন্ধশ্বাস নিংড়ে দাড়ি উপড়ে সচেতনতা গেলাবে, বল শালা জয় গণতন্ত্র, ওঠবোস কর আর মুখস্থ আওড়া, কোন বিধায়ক নর্দমানিকাশে তেরো, কোন মন্ত্রী গণগেলন গাদিয়ে সাড়ে চৌত্রিশ, কোন নেতা ব্রিগেডে বারপোস্ট পুঁতে দুই পূর্ণ একের ছয়। ওরে মা, ও গভীরাত্মা হিতৈষীরাশি, শুন, ভোট দেওয়ার অধিকারের মধ্যেই নিহিত ভোট না-দেওয়ার অধিকার, কাউকে বাছার অধিকার মানেই কাউকেই না-বাছতে রাজি হওয়ার অধিকারও, গণতন্ত্রে নিরুৎসুক হওয়া, এ পদ্ধতিকে পচাপদ্মবৎ পরিহার আমার গণতান্ত্রিক অধিকার। ফি মাসে টি আর পি উত্তোলনার্থে যেনতেন নয়া পাবন হাঁটকে নিরীহের মহাপ্রাণী ঝালাপালা, ই কী প্রকার ব্যাভার মিডিয়ামাসি?

তা বলে কি প্রেম দেব না? আলবাত। টম ক্রুজ যে বাচ্চাকে খাওয়ানোর পর পিঠু খাবড়ে খাবড়ে টেকুর তোলাচ্ছেন, তা নিয়ে সতেরো মাইল লেখা হতিছে না? প্যারিসে প্রিমিয়ার ছেড়ে পৌঁ-পাঁ ছুটে যাচ্ছেন, শিল্প তো থাকবে, কিন্তু নবজাতিকার হিসুসিক্ত ন্যাতাকানি এখুনি না বদলালে? ‘এক মূত্র দুবার সাফ করা যায় না’: প্রাচীন গ্রিক প্রবাদ। তার পর ধরো সচিনের শিশুগণ তাঁর কাঁচা ঘুম ভাঙিয়ে তুলে নে গেল সারপ্রাইজ-ঘরসজ্জা দেখাতে, কী তীব্র ইস্কুপ! না, ঝটকা-সেঞ্চুরি নয়, রেকর্ড-ভাঙন নয়, নয়া কাপ্তেন হওয়া নয়, লোকটির শ্রেফ তেত্রিশ-বছরের জন্মদিন। তাতেই নাওয়া-খাওয়া ভুলে দিনভর ন্যাজ তুলে নিউজ ফ্ল্যাশ। আর যে সংযত মহাস্টার বাপের জন্মে ক্যামেরাকে মাড়াতে দেননি প্রাইভেট চৌকাঠ, আজ রান-খরাস্তে কী তাঁর কেতাখ ঝলকানিসমীপে স্পেশাল কেক-কাটন, লেসের তালে তুড়ক-হাঁটন!

অবশ্য বদল তো জমানা-ময়, এটু উঁচু হোর্ডিঙে নয়নজোড়া ঝিকো, বাপ রে, ক’দিন আগে ‘কভোম’ ছিল অ্যাচ্ছিচ্ছি রাম-ইল্লুতে শব্দ, আজ সরকার থেকে ২০০৬-এর মধ্যখানের গোলা দুটিকে অবধি কভোম হিসেবে ঐকে দেওয়া হচ্ছে! অর্থাৎ বছরের কেন্দ্রস্থলে দুটি অমুক! শিশুকালে টিভিতে জন্মনিরোধকের অ্যাডকালীন গুরুজনের হাঁহাঁ দেখে মুচকি চাপা দায় হত, বাবা গলাখাঁকারি দিচ্ছেন মা চৌচিয়ে ভাল্লুকের গল্প বলছেন ঠাকমা সটান ফেন্ট, এখন কিনা নিতান্ত স্বাভাবিক বাক্যে: ‘যখন তখন ইচ্ছে জাগতে পারে...’ কিংবা ‘মজা করুন, কিন্তু...’। প্রথমটা আরাম ঘটে, যাক, তা হলে ইচ্ছে বা মজার মধ্যে যে স্বতঃস্ফূর্তি, সতেজ ঝরঝরে উল্লাস, গাঢ় আহ্লাদের দ্যোতনা, সেক্সের থিম হিসেবে তা কর্তৃপক্ষ-মগজে অবশেষে বহমান? দ্বিতীয় খটেই ট্রাজেডি পষ্ট, হা, এ তো সুখের স্বীকৃতি নয়, অসুখের হুড়ো। আপৎকালে বাপ বাপ বলে অস্পৃশ্য শব্দ উচ্চারণ। হাত ঘুরু ঘুরু নাড় মেলা অসম্ভব, হাত মুচড় মুচড় এখানে নিজ হকের টফি গামবাট সিনিয়রের কোঁচড় হতে আদায় করতে হয়। নইলে যাও না বেসিক ইনস্টিংক্ট-২ দেখতে। শ্যারোন স্টোন যেই না চাঁদমুখ

ব্যতীত আর কিছুটি খুলন্তি খুলন্তি, কচাৎ। ভারতীয় সেন্সর বোর্ডের আপিসঘরে রোদজল কদাপি বদলায় না। হ্যাঁ, লাগোয়া উঠোনেও। যুবাযুবি হাত ধরাধরি রাস্তা হাঁটলেই জনগণের কী কাঁচা আঁশটে জিঘাংসা! হুস্বজামা স্বাস্থ্যবতী দেখে বাসেট্রামে পিচুটির ন্যায় দৃষ্টি দিয়ে চাখব কনুই গুঁতিয়ে সহবন্ধু ডাকব প্রেমালাপ গিলতে কান কুকুরখাড়া রাখব, তাল্পর বাড়ি ফিরে ছাছ্যা ওয়াক ধিক, আন তো আমার হকিস্টিক! সে ভগুগৌসাইমেলায় নেমে চোঙা ফুঁকে মুখের এন্টে তুলে 'ইয়ে ব্যবহার করুন' (পরোক্ষে স্বীকার যেতে হল, ম্যাগোম্যা, লোকে প্রায়ই ইয়ের সঙ্গে ইয়ে করে থাকে), কার না কানের গোড়া লাল হয়? এ দুনিয়ায় নাকি জঘন্যতম কীটের অস্তিত্বেরও মহান উদ্দেশ্য বর্তমান। এখন এড্‌স যদি আমাগো যৌনতা-সম্পর্কিত নিষিদ্ধে শুচিবাইয়ের পাছায় কাঁ্যা তিনটি লাথও কষাতে পারে, মন্দ কী?

ঘনঘটা আরও টাইম্‌স দে আর আ-চেঞ্জিত: বব ডিলান হচ্ছেন রেডিয়ো-জকি, প্রথম দিন কথা বলবেন পাতি আবহাওয়া নিয়ে। বোধ হয় 'ব্লোয়িন ইন দ্য উইন্ড'-এর ছদ্মবেশী ভূমিকা! ও দিকে ক্রোয়েশিয়ায় সাড়ম্বরে খোলা হল ব্যর্থ প্রেমের মিউজিয়াম, জমা পড়েছে গাদা চিঠি, দাগা-পূর্ব এনগেজমেন্ট-অঙ্গুরীয়, মাসাজের তেল, স্কুটার, মায় 'তাকে' ভুলতে ফাঁকা হওয়া মদের শিশিরানি! বঙ্গভূমে এ কাণ্ড রচলে মুহূর্তে স্পেস উপচে সুভেনির স্তুপিয়ে ভারতীয় জাদুঘরের নিশ্চিত দশ ডবল, প্রতিটি নেকু যেখানে প্রথম লেক্সির জাবর জাপটে ডেলি ঘুমোতে যান কোব্‌তে রচেন গান ফোঁপান, স্বল্প পিনিকেই সমষ্টিস্মৃতিবেলুন ফেঁসে গ্যালন গ্যালন অশ্রুপুঞ্জ ধাবিত নির্যাস: যথাযথ হাইড্রো-ইলেকট্রিক প্রোজেক্টে ব্যবহার পারলে, ব্যস, বসুধায় লোডশেডিং চির-চম্পট। নর্মদা ড্যামের ডিবেট অবলুপ্ত। সাজেশনটা দিলে বিদ্যুৎমন্ত্রী ল্যান্ডস্লাইড ভোট আটকায় কে?

৩০ এপ্রিল, ২০০৬

কা ন আ জি দু' কা ন কা টা

যাক, তাও তো বাংলা ছন্দবিপ্লব শাঁ শাঁ এগোচ্ছে। ট্রাকের পেছনে দীর্ঘশ্বাসমূলক 'সুখ স্বপনে শান্তি শ্মশানে' নাগাড়ে দেখে হৃদয় হেজে গেছিল, বেচারি 'শ্মশানে'-র একটিই অন্ত্যমিল চরাচরে সম্ভব জেনে আমরা বিষণ্ণ, হঠাৎ 'মারব এখানে, লাশ পড়বে শ্মশানে' তুমুল ডায়লগ সে খরা কাটিয়ে যা কন্ম করল, ফাটাকেটোচিত। সাহিত্যিকদের সত্যি কাহিনি নিয়ে বেরোল 'দ্য নিউ অক্সফোর্ড বুক অব লিটারারি অ্যানেকডোটস': ডিলান টমাস-এর স্ত্রী মাতাল হয়ে আইসক্রিমে কনুই ডুবিয়ে এলিয়টকে বলছেন চেটে নিতে, আর ক্ষীণদৃষ্টি ই এম ফরস্টার বিয়েবাড়িতে একটা বিশাল কেক-কে রানি মেরি বলে ভুল করে নাগাড়ে 'বাও' করছেন! কনটেস্টের ঠেলায় তো শিল্প ওষ্ঠাগত, মার্কিন শো 'মাই বোয়ার লেডি'-তে আবির্ভূত হবেন পর্নোগ্রাফিক ছবির নায়িকারা, যাচাই হবে: তাঁরা কান্নাহাসির দোলদোলানো অ্যাক্টো পারেন? শেষবেশ এস এম এস কপালে সন্দেশ প্রাপ্ত চার জন লন্ডন রওনা 'সিরিয়াস' নাটক করতে। লন্ডনেরই নাট্যপাড়া ওয়েস্ট এন্ড-এ জমবে অ্যাড্জু লয়েড ওয়েবার-এর মিউজিকাল 'সাউন্ড অব মিউজিক'। কিন্তু মারিয়া-র ভূমিকায় কে? অ্যাক্টরে ঠিক ধরেছেন, ও সব ন্যালাখ্যাপা জমানা আর নেই, যে স্বৈরাচারী পরিচালক লিজে লায়িকা ঠিক করে লিল। লাগাও কনটেস্ট। 'হাউ ডু ইউ সল্ভ আ প্রবলেম লাইক মারিয়া' অনুষ্ঠানে প্রতিযোগীরা হুবহু জুলি অ্যাড্জুজ হয়েটয়ে দেখাবেন, হ্যাঁ, বিলক্ষণ গাইতে হবে মিষ্ট যেন গুড়, দর্শকরা পিঁকপিঁকিয়ে নির্ধারিবেন বিজয়িনী। এ দিকে ওড়িশায় চলতি 'বুধিয়া রে বুধিয়া' গান তো শিশু দৌড়বীরকে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তুলনা করে দিয়েছে! কী? না, দু'জনেই এক জায়গায় জন্মে অন্য জায়গায় অন্যের কাছে মানুষ, প্লাস উভয়েরই শিশু বয়সে অলৌকিক স্ট্যামিনা! বাস্তবিক, কৃষ্ণ পূতনা বধ করেছেন কালীয়-র ফণায় টুইস্ট নেচেছেন, এ বাচ্চা টানা ৬৫ কিমি দৌড়েছে। তফাত কই? মিউজিক ভিডিয়োয় বুধিয়া পিচপথে রানিং, পাহাড়ের ওপরেও, আবার জুডো-ও প্র্যাকটিস যাচ্ছে! টুরিজম বাগাতে 'ভিজিট লন্ডন' সংস্থা শুরু করল জ্যাস্ট বিজ্ঞাপন। ধরুন রবীন্দ্রসদনে নাটক দেখতে গেছেন, পর্দা উঠি-উঠি, হঠাৎ এক মহিলা সেলফোনে কাঁইকাঁই বলতে লাগলেন, লন্ডন গিয়ে তাঁর কী হৃদমুদ না ভাল্লেগেছে! তক্ষুনি অন্য একটি সিট থেকে এক ভদ্রলোক উঠে বললেন, উফ! এ তো ঋতুপর্ণ-র ছবির চেয়েও বেশি ডায়লগ বলছেন, চুপ করুন না মশায়! ঐর দিকে সবাই তাকিয়ে দ্যাখে, তওবা! এ তো স্বয়ং ঋতুপর্ণই! ধীরে ঋতুবাবু স্টেজে উঠে, ঝাড়া তিন মিনিট মারকাটারি লন্ডন-শংসা। ঠিক এই আদলেই এখন বিভিন্ন দেশের বড়কা বড়কা শহরে ক কিংবা খ হল-এ লুকনো সেলিব্রিটি সহসা লন্ডনম্যানিয়া ওসকাচ্ছেন। সোল-এ হয়ে গেল গর্ভিণীদের জন্য স্বতন্ত্র পোশাকের ফ্যাশন শো, কী করে

একত্রে অত জন সুখীত পোয়াতি মডেল জোগাড় হল, রহস্য। কান-এ প্রদর্শিত জন ক্যামেরন মিচেল-এর ছবি 'শর্টবাস' রইরই, দৃশ্যে দৃশ্যে প্রভূত যৌন সঙ্গম, এবং সমুদয় সত্যিকারের! মানে, ক্যামেরা মিথ্যে বলছে না, নটনটি কিছুটা ভান করছেন না, আক্ষরিক কাণ্ডাকাণ্ড। জয়ো জয়ো সত্যেরো। না, আগে হয়নি তা নয়, কিন্তু আর্ট ফিল্মে, এবং এতবিধ: সমকামী, বিষমকামী, এবং, বিষম ধরে রাখুন, দলবদ্ধ অর্জি! অর্জি: আমায় পরের ফিল্মে লিবেন, জনবাবু? ইরানের গ্রাফিক নভেল লেখিকা মারজানে সাতরাপি-র আত্মজৈবনিক 'পার্সিপোলিস' এমনিতেই বিশ্বখ্যাত, এ বার তা অ্যানিমেশন ছবি হচ্ছে। না, আমাদের ধারণামাফিক কমিক্স নয়, গ্রাফিক নভেল বরং 'ছবিতে গল্প', তার মজাদার হওয়ার দায় নেই, বস্তুত উক্ত বই তীব্র রাজনৈতিক, এবং এ ঘরানা পাশ্চাত্যে অধুনা ছুঁছে। বইটিতে এক ইরানি ন'বছরের মেয়ে এক দিন স্কুলে গিয়ে শুনল আজ থেকে বোরখা পরতে হবে। তার পর শাহ-এর পীড়ন ফেড আউট করে খোমেইনির দমন, আগের শাসক যাকে গরম ইস্তিরি ছাঁকা দিত, পরের শাসক তাকে বাথটবে গর্দান চুবিয়ে মারে, এই যা। এই দেখতে দেখতে জেদি একগুঁয়ে আঙুল তোলা মেয়ের বড় হওয়া, লুকিয়ে পাশ্চাত্য সংগীত, সিগারেট, কাকাকে জেলে দেখতে যাওয়া মৃত্যুদণ্ডের আগের দিন ও তিনি দিলেন অনেক দিন আগের মতোই আরও একটি ছোট্ট পাঁউরুটির তৈরি হাঁস, বললেন, 'এটা আগের হাঁসটার কাকা'। তাবৎ ফ্রেম পরম মায়া ও কড়াঘাণ হিউমারের মিশ্রণে ধকধক। চরিত্ররা বাস্তবিক ত্রিমাত্রিক, এমনকী ছোট মেয়েটি টর্চার-টর্চার খেলতে তুঙ্গ আহ্লাদ মানে। তার শহিদ কাকাও সারা দিন প্রাক্তন রুশ স্ত্রীকে গাল দিতেন। অ্যালবামের ছবিতে স্ত্রীর মাথা ঘিজিঘিজি করে কেটে দিয়েছিলেন। মাসি বোম পড়ার সাইরেন শুনে কোলের ছেলে অন্যকে গছিয়ে বেসমেন্টে পালান। ফিল্মের চিত্রনাট্য লিখছেন সাতরাপি নিজে, পরিচালনাও করছেন, যুগ্ম ভাবে। ইরানে তিনি থাকতে পারেননি, ফ্রান্সে থাকেন, পড়াশোনাও ভিয়েনায়, কিন্তু যে ইরানকে ছাড়ে ছাড়ুক, তিনি মা মেনেছেন। এই মহিলা শৈশবে একটি মাত্র কমিক্স-গ্রন্থ পড়েছিলেন এবং তার বিষয় ছিল দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ! তখন তিনি রেগুলার ভগবানের সঙ্গে নৈশ বাতচিত করতেন ও অবাক: ঈশ্বরকে ডিটো মার্কেলের মতো দেখতে, শুধু কার্ল-এর চুল একটু বেশি কার্লি!



পার্সিপোলিস-এর অংশ

ও দিকে কান ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল তো দু'কান কাটা হয়ে ফ্যাশন র‍্যাম্পের মাসতুতো ভাই, কে তারকা (বিশেষত, তাড়কা) কোন কৌপীনে কত মুক্ত কত অনুক্ত, তা নিয়েই দামামা, হলিউড-নায়িকা তিষ্ঠ তিষ্ঠ রবে সর্প-নেকলেস মণ্ডিতা ঐশ্বর্যর ফোটো তুলে নিচ্ছেন, প্রিটি জিন্টা কনটেস্ট দিচ্ছেন টোল বাগিয়ে। এই কান ক'বছর আগেও ছিল সিনেমার শ্রেষ্ঠ লীলাক্ষেত্র, ছবির নোবেল প্রাইজ-ময়দান বলা চলে, প্রচণ্ড সিরিয়াস স্পর্ধিত ও সম্মাননীয়, হলিউডকে সে সশব্দ ঝাপড়ে তাড়াত: আ বে হ্যাট! হ্যাট! ভাগ হিঁয়াসে! অলঙ্কার ব্যবসাদারি ও সিনেমা এক নয়, কতকগুলো আস্তরণবাদী স্মার্টনেস ও স্পেশাল এফেক্টকে ছবি বলে না, গাধা জনগণ আর গাদা ডলারের টিপি দিয়ে শিল্প সংজ্ঞায়িত নয়, হলিউড আদতে ইতর গাড়ল এবং ভাত ছড়িয়ে কাকপ্রত্যাশী, এ নিয়ে কান-এর অগুসন্দেহও ছিল না। সে প্রান্তরে এক দিন শোয়ারজেনেগার দাঁত ও বাইসেপ বের করে পোজ দেবেন আর ফরাসি জনতা তাঁর অটোগ্রাফ নিতে ল্যালা লুটোবে, কলিকালের নিশ্চিত সিন। আমাদের করণ জোহর যখন মুন্ডু আলো করে ঘুরে বেড়ান, তা ওরই অন্য টেক। দেবদাস-এর মতো রুদ্দি ছবি কান-এ ঘটাপটা করতঃ দেখানো হবে, জানলে যুগপৎ লজ্জা হার্ট-অ্যাটাক বিবমিষায় কবেই ক্যামেরাট্যামেরা গুটিয়ে প্রাক্তন ভগবানগণ টা-টা চলে যেতেন। আচমকা চতুর্দিকে শাড়ি কারি ও ভারতীয় নারীর কিঞ্চিদধিক হুজুগ তৈরি বলে অনেকেই ভাবছেন, বস, এই তো এস্‌সে গেচি, অবশেষে ভারত জগৎসভায় বেস্টো আসোনো লবে, আসলে ভারত ঘণ্টা করেছে, উক্ত সভাটি ঘুষখোর দালাল গামবাটের হাতে বিকিয়ে গেছে। সময় হয়েছে, ব্যাসদেব বা তাঁর ফরাসি সংস্করণ আবির্ভূত হোন ও সত্যবতীকে যেমন বলেছিলেন স্পষ্ট বলুন, মাতা, পৃথিবী (এবং ৩৫ মিমি) আজ গতযৌবনা, পোঁটলা বাঁধুন, টুথব্রাশ নিন, সটান বাণপ্রস্থে চলুন।



প্রাপ্ত ফাটাকেস্টরূপী স্টার তো 'গরিব ইন্ডিয়ান আইডল' মার্কী বাংলা ধমাকায় অ্যাক্সর, সোজা হয়ে দাঁড়াতে অবধি পারেন না, নাগাড়ে টলেন ও দোলেন, জড়ানো স্বরে মাঝেমধ্যে যা বলেন, আর যা-ই হোক, বাগ্মিতার বিশ্বকোষে ঠাই পাবে না। অনুষ্ঠানের বিচারকরা প্রত্যেকে পেয়েছেন নির্দিষ্ট ভূমিকা: তন্ময় বসু তিরিঙ্কি নিঠুর, ইন্দ্রাণী সেন ভাল মিষ্টি, মাথায় ফ্যাশন-কপড়া বাঁধা দেবজ্যোতি মিশ্র নরমে গরমে ফ্লোটিং। প্রতি ব্রেকে মিঠুন-বিষয়ক কুইজ, যেমন ওঁর ছেলের নাম কী, ওঁকে ওঁর বাচ্চারা কী বলে ডাকেন (ওয়াইল্ড গেস: বাবা!), নির্ঘাত কোনও এপিসোডে 'উনি রাত্রে কবার কুলকুচি করেন' গোছের অবশ্যজ্ঞাতব্য গ্রাণ্ডারি কোশ্চেন আসুচি। আর এত কেতা করে যে সব প্রতিযোগী নেওয়া হয়েছে, মা রে! বাছাবুছি কে করেন কে জানে, কিন্তু কিছু গাছ-অপোগণ্ড বাথরুমগানকেও বলবে বাছা, ও দিকে থাক। বাংলা গানকে অ্যায়সান ঝাড়পিট দিলে যে অবশ্যজ্ঞাবী শ্মশান, মোরা কি লব না তা হতে প্রিকশান?

বিশ্বকাপাকাপি

যে রেটে বিশ্বকাপাকাপি, রোনাল্ডোর মোটা হওয়া ছাড়া অন্য সাংস্কৃতিক আলোচনা রণে-বনে-লোকাল ট্রেনে টোটাল ব্যান। অনুগত গৃহবধূগণ অবধি তুলসী ছেড়ে চেলসি জপছে। ধাঁইধাঁই চর্মগোলক-ধাক্কানিতে সাঁস-বহু-ননদিনী-রায়বাঘিনী, যে যেখানে টি আর পি চড়ে মগডালে হাওয়া সেবনরত, সব হুড়মসে পড়তে পড়তে একেবারে মেট্রো টানেলে সঁধায়মান। কিন্তু তাতে নার্ভাস কেডা? গীতামাফিক তীর ফোকাস গেড়ে নিজ কন্ম করে যাচ্ছে। ঠিক জানে, এক মাস যেতে না যেতে, সুড়সুড়িয়ে ‘মা যাব’ বলে অই সেম আঁচলতলে ফিরতে হবে। ‘কিঁউ কি...’ অল্লানবদনে একটি মসৃণ জাম্পে কুড়ি বছর এগিয়ে গেল, ১০৪ বছরের বৃদ্ধা ‘বা’ (‘দেখতে মা কিন্তু দৃঢ়তায় বাবা’, প্রিন্টিং-মিসটেক সমাস) ধুমাধাড় দাপটে অদ্যও সংসার সামলাচ্ছেন। চুলে কিঞ্চিৎ সফেদ লাইন বৃদ্ধি, ব্যস, এ ছাড়া জিমেশ্বরের কৃপায় চরিত্রসমষ্টির দেহ্যষ্টি এতটুকু টসকা খায়নি বিশ বছরে! তুলসী তো হরিদ্বারে, লাগাতার পূজোপাঠ। আঃ, তাকে বাড়ি থেকে স্বামী বের করে দিল না? বউ হয়ে সে শাউড়ির মার্সি-কিলিং করেছিল না? মোদা বাত, তাদের বাড়ির তুলসীগাছটি বেবাক পটল তুলেছে সমনামা বধূটিকে ঘাড়ধাক্কার পরেই। ফলে নয়া তুলসীবৃক্ষ খুঁজতে খুঁজতে অধুনা-জেনারেশন কোথায়? এগজ্যাক্টলি। হরিদ্বারে। এবং সেখান থেকে এক পিস টবসুদু তুলসী হাতানো গেছে বটে, কিন্তু কেহ না জানলেও, তা সেই প্রিয় বউরানিরই ইদানীং-গৃহের পোষা ট্রি! বাপু, ‘কো ইনসিডেন্স-কে ফর্ম হিসেবে ব্যবহার করেছি’ বলে ঋত্বিক ঘটক সুবর্ণরেখা-য় ম্যান্টিং বীজ পুঁতে তো দিলেন, তাকে সুজলাং সুফলাং পল্লবিত করবে কে? সে ঝান্ডা-বহন শক্তি যে একতা কপুরের মিহিনস্কন্ধে, তাবড় পুনে-পণ্ডিত ড্রিমেছিল? বাংলা চ্যানেল, উঁহু, কম যায় না। ‘বহিঃশিখা’য় পাঁড় ক্রিমিনাল ইন্ড্রাগী হালদার জেনে আকুল, সে প্রাক্তন গারদ-সঙ্গিনী রিমঝিমের আপন দিদি (বেচারা শৈশবে কিডন্যাপ হয়েছিল), অসুস্থ শরীরেও তাই বার বার বোনকে ‘বল, মায়ের কথা বল, নইলে সালা এম্ফুনি এক ঝাপড় খাবি’ বলে কেঁদেফুলে একসা। তবে কিনা, যে কেহ বিশ্রামে আছ মহা-সাবধান, ‘রিফিউজি’ ঘাড়ে এসে পড়ল বলে। সে জন্মভূমি হারিয়েছে, পরিবার হারিয়েছে, কিন্তু ‘এ ক্যাওড়া, এ ক্যাওড়া’ বলে চিল্লিয়ে গান গাইবার ও তৎসহ পেলায় অশ্লীল মুদ্রায় নিম্ন-সাজেশন সমৃদ্ধ অঙ্গসঞ্চালনের লোফারমি হারায়নি। নায়িকা অবিশ্যি এতেই বিবশা। অন্য গানে সে পষ্ট স্বীকার যাচ্ছে, ‘ম্যাও ডেকেছে হলো, ওরে ম্যাও ডেকেছে হলো’, তার মুখচোখ ব্যাকানি ও আনুষঙ্গিক বডি-ছাঁকানিতে অর্থ সাফা: এই বেয়াড়া ডাক আদতে মেটিং-আহ্বান। সে ম্যাও সামলানোর মধুর দায় কে নাই পোয়াতে চায়!



বিদ্যাসাগর বেচারী নীরস মাইলফলক দেখে দেখে ইংরিজি সংখ্যা শিখেছিলেন। আর হালের শিশুগণ কী মধুর উপায়ে বানান শিখছে! গ্যালারির দিকে তাকান, মেয়েরা অনাবৃত পেটে বিশাল একটি একটি রঙিন অক্ষর বাগিয়ে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে দেশের মূর্তিমতী স্পেলিং! ধরা যাক পাঁচটি স্লিম সুন্দরী দাঁড়িয়েছে S, P, A, I, N লিখে। কুড়ি মিনিট পর A-র বাথরুম পেল। সে তাড়না দেশপ্রেমের চেয়ে বড়, সুতরাং লাইন ছেড়ে ধাঁ। ওরা বেমালুম হয়ে গেল SPIN! আর BRAZIL-এর Z, I, L তিন জনেরই যদি অনুরূপ প্রকৃতির ডাক আসে, সাংঘাতিক! হ্যাঁ, ঘানা নিয়ে অবশ্য বাঙালির তিড়িং লম্ফ মারকাটারি। গোরাগুলোকে দিয়েছে না ঠুসে! ওরা কালো, হামরা ভি কালো— বঞ্চিতের কামারাদারি উপচে পড়ছে দুনিয়াদারি ভেব্লে। সেমিনারটি ডাকা বাকি, দা ভিঞ্চি কোড-এর ন্যায় লুকোছুপি-উন্মোচক, যা ঘোষিবে: এক বাঙালি কদ্দিন আগে সন্ধ্যাভাষায় মুড়ে অমোঘ ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছিলেন: ‘কানা খানা গানা ঘানা, কেমন লাগে কুমিরছানা’!



তবে খেলা মনের মতো হোক না হোক, আদিদাস-এর বিজ্ঞাপন দেখে, সন্ধ্যার, যাকে বলে, পয়সা উঠে এসেছে। প্রত্যেক ছেলে ভাবছে, আরে, আমাগো পাড়া-বিশ্বকাপের একান্ত ফ্যান্টাসি, কেমনে এরা পেরেছে সেটা জানতে? আর ছয় থেকে ছিয়াশি প্রত্যেক মেয়ে বেকেনবাউয়ারকে দেখে এলানো-পোজিশন থেকে সোজ্জা ঝাঁপিয়ে জিঙ্গেস করছে, ‘এই হ্যান্ডসাম ছেলেটা কে গো?’ ভাবতে ভাল, লাতিন আমেরিকাতেও তবে ছেলেপুলে আমাদেরই মতো বাড়ির সামনের জায়গাটাকে মাঠ ঠাউরে কল্লনা ও দেখনদারি মিশিয়ে খেলাটা সেরে নেয়, আর আমাদেরই মায়েদের মতো, ধর্মকামী মহিলাগণ আপন ছেলেদের আত্মার আরাম বিকেলবেলার খেলাটি ফর্দাফাঁই করে, বাড়িতে ডেকে নেয়।



সহসা ভারতকে কৌতুকের আরকে চোবানোর সদৃশ দিকে দিকে রটি যাচ্ছে ক্রমে। ‘দ্য গ্রেট ইন্ডিয়ান লাফটার চ্যালেঞ্জ’-এ বিচারক সিধু প্রতি অক্ষরেই হেসে কুটিপাটি, ও দিকে দর্শক প্রবল প্রচেষ্টাতেও কাতুকুতায়িত হতে পারছেন না। ‘দ্য গ্রেট ইন্ডিয়ান কমেডি শো’ সমান হাজাকান্তিক, স্কিটে রাজপাল যাদব, ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত, বা মহেশ ভট্টকে সাড়ম্বরে ভ্যাঙাবার কালে আচমকা স্বয়ং মহেশ হাজির হলেই হিউমার হয় না, তারকা-গিমিক হয়। ‘মীরাক্কেল’? মীরের আক্কেল থাকলে ‘অই হুমোয় ধরেচে’ বলে সড়াং কেটে পড়ুন। রচনা বন্দ্যোপাধ্যায় আসার আগে ‘সাজনা হায় মুঝে রচনা কে লিয়ে’ গেয়ে মিনিটখানেক চুল আঁচড়ানোর মধ্যে মজার কিছুটি নেই। ক্লিশের পিছুটি আছে। আর বিশ্বকাপ

ম্যাচের আগে রণবীর শোরি মণ্ডিত একটি অনুষ্ঠানের জন্য তো সংশ্লিষ্ট লোককে জেলে ভরা উচিত। এর চেয়ে অগা বোরিং সারহীন কাণ্ড মগজ ঠুকে বের করা শক্ত। উঁচু থেকে সসেজ ফেলে বা বোর্ডে খুদে ইঁদুর ছেড়ে ম্যাচের ভাগ্য নির্ধারণ হচ্ছে! সত্যি, অভাগা যে দিকে যায়, চুনি-পান্না পিছে ধায়। বাঁচোয়া একটাই, ‘সোনা বৌঠান’-এ Buzzer রাউন্ডে প্যাকপ্যাকে পুতুলের পেট টিপতে হচ্ছে। গীতাঞ্জলি কে লিখেছেন? প্যাঁঅ্যাঁঅ্যাঁ!



স্টার ওয়ান দেখাচ্ছে ‘হাট বিট: দিল থাম কে খেলো’ কুইজ। কুইজ মাস্টার নেই, যদিও তাঁর গলা আছে। প্রতিযোগী, মানে কোনও সেলিব্রিটি, একা এক বিশাল ধাঁ-ঝঙ্কাস কাচের ঘরে। তাতে কী নেই: বই, সোফা, আপেল। জগিং করো, জুস খাও। স্ক্রিনে মাল্টিপ্ল চয়েস প্রশ্ন। সামনে ফোন, কম্পিউটারাইজড টেলিফোন ডিরেক্টরি! যাকে খুশি ফোন করো, বন্ধুরা প্রশ্ন শুনে ইন্টারনেট দেখুক, জিকে-বই ওন্টাক, জেঠুকে জিজ্ঞেস করুক, পৃথিবী উন্টে দিক। আসলি মজা, প্রতি প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার সময়: ৫০০ হ্রস্পন্দন। হ্যাঁ, এখানে সময় হিসেব করবে ঘড়ি নয়, তব নিজ হাট। সে ব্যাটা যত ক্ষণে ৫০০ বার দাবড়াবে, খুঁজে মরো ঠিকভুল। অর্থাৎ, ‘ও মাগো কী হবে গো’ টেনশনওলার মেয়াদ অনেক তাড়াতাড়ি শেষ, ঠাণ্ডামাথা শান্ত লোকের সময় বহুত। গুড়ম গুড়ম দামামা টাইপ ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিকে তোমার হাট বেজে চলবে। মা-ঠাকুমারা খামখা টেনশন করে আমাদের বহু খাঁকানি শুনেছেন। এখন লাখো টাকার কুইজে নার্ভাস আইকনরা নাক নিংড়ে শোঁ-শোঁ প্রাণায়াম করছেন, যাতে হৃদয়বিট বশে থাকে। জ্ঞান, উপস্থিত বুদ্ধির সঙ্গে মাথা ঠাণ্ডা রাখাকেও মোক্ষম কুইজাস্ত্র নির্ধারণ করে কাতারে হাতালি নিন নির্মাতারা।



তরুণ মজুমদার নতুন ছবি করে প্রমাণ করলেন, অতি প্রতিভাবান সিনেমাকারেরও রিটায়ারমেন্ট এজ থাকা ভাল। অবশ্য সত্যজিৎ-এর ‘গণশত্রু’ থেকেই এ তত্ত্ব নিজেকে দামামা পিটিয়ে জাহির করছিল, কিন্তু কেউ শোনার সাহস করেনি, কারণ উনি এত লম্বা, তদুপরি বাঘের ব্যারিটোন। তরুণবাবুর এ ছবির পোস্টারে আবার এক দিকে উত্তম (কারণ তাঁর নাতি নায়ক), অন্য দিকে হেমন্ত (তাঁর নাতনি নায়িকা)। এ বিষয়ে সুহৃদ অনিন্দ্য চট্টোপাধ্যায়ের অমর উক্তি উদ্ধার করার লোভ কিছুতে সামলানো গেল না: এ ছবির নাম হওয়া উচিত ‘দাদুর কীর্তি’!

২৫ জুন, ২০০৬

কা জু - ক্রিশমিশ

বিশ্বকাপ শেষ, রবি ওঝা-র 'খেলা' শুরু। রবিবাবুর 'এক আকাশের নীচে' বাংলা সিরিয়ালের মাইলফলক, সেখানে স্বাভাবিক অভিনয়, বাঙালি মধ্যবিত্তের জ্যাস্ত জীবন নিয়ে লেখা দূরন্ত স্ক্রিপ্ট আমাদের নিজস্ব ঘরদোরকেই চোদো/কুড়ি ইঞ্চি আয়নায় ধরত। আমরা তো ঠিক কোম্পানি অধিগ্রহণ বা ডেডবডি পুঁতে দেওয়া নিয়ে ভাবিত থাকি না, আমাদের ঝামেলা জায়ে-জায়ে মন কষাকষি কিংবা ছোট মেয়ের টিউটরের সঙ্গে প্রেম। কিন্তু ও রকমটা একদা করে ফেলেছেন বলেই ওঝামশায় এ বার বোধহয় বৈচিত্রের সন্ধানে। সামান্যই ক'টা এপিসোড হয়েছে, এর মধ্যেই চড়াস্য চড়া দাগটি মনোডেসিবেল কাঁপিয়ে বাজছে। শুধু ক্ল্যারিনেটের কাঁদুনি পেছনে পোঁ ধরে নেই। তা হলেই যাত্রার সঙ্গে মিলনোমহান হয়ে যেত। চরিত্রগুলো চিত্রকৃত ও একমাত্রিক, একেবারে ক্লিশে, 'টাইপ': পবিত্র পুলিশ, বখাটে বড়লোক, বশংবদ বধু, শুচিবায়ুগ্রস্ত শাশুড়ি। স্ক্রিপ্ট গাশু গোদা। অভিনয়ের গ্রাফ মেলোড্রামা ফুঁড়ে সিলিঙে। দীপঙ্কর দে = (ছবি বিশ্বাস+কমল মিত্র) x ৩— অ্যায়সা দুঁদে বাপ। তাঁর দাপটে গোটা বাড়ি এক ডাইনিং টেবিলে নিখুঁত টাইমে ভাত খায়, অনুমতি ছাড়া চেয়ার ছেড়ে নিতম্ব ওঠাতে পারে না, বাড়ির মেয়ে সাতটার বেশি বাইরে থাকলে ডিনার বেমানুম বাজেয়াপ্ত। একটাই ভাল, দীপঙ্করের হলদেটে 'জডিস চশমা' এ বার পুজোয় ফ্যাশন হতে পারে। আর এক সিরিয়ালে তো নায়ক-নায়িকা ঠিক করেছে তাদের প্রেমের মূল্য নির্ঘাত বাপ-মায়ের ভাল্লাগার চেয়ে বেশি নয়! অতএব তাঁদের আপত্তি শুচিখড়মের মতো মাথায় বয়ে তারা স্বেচ্ছায় অন্য অন্য পার্টনার বিয়ে বসবে, ব্যক্তিগত জীবনকে পরিবারের হাড়িকাঠে বলি দেবেই, এ মর্ষকামী প্লেজারে বজ্রটাইট চোয়াল চেপে নাচতে নাচতে এগোচ্ছে। সিরিয়ালে ড্রাগ, সেক্স দেখালে আন্দোলন ঘটে। আর এই চূড়ান্ত অশ্লীল অমানবিক ধারণা দেখালে কারও হেলদোল পয়দা হচ্ছে না। ভাল। কোন দিন সতীদাহকে পুজো করে সিরিয়াল প্রচারিত হবে। লোকে ধূপধুনো নিয়ে দেখতে বসবে এক দিন, প্রতি দিন।



জিদান অ্যায়সান টুসো মারলেন যে গরু ও গণ্ডার লজ্জায় মুখ লুকোতে গিয়ে ঘাসে হেঁচে দিল, বাচ্চা না ঘুমোলে মা হাঁকলেন, 'অয়, অয়, জিদান এল রে, জানলার বাইরে দাঁড়িয়ে মাথায় শান দিচ্ছে কিন্তু', আর হঠাৎ কথা নেই বাস্তা নেই মিডিয়ার সুড়সুড়ি খেয়ে নেকুচন্দর পাবলিক 'আহা রে, এটু টু মারবে না? ওই লোকটা আগে দুটু কথা বলেনি বুঝি' মার্কী ঈশপের গল্পো জপছে। আসলে গবা আইকনবাজি ছাড়া বিশ্বের চলে না। আরে ভাই, ফুটবলে কাঁচরাপাড়া থেকে কামচাটকা অবধি খিস্তির ষাঁড়াষাঁড়ি বান, আবহমান। ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগানের প্লেয়াররা বিরোধী খেলোয়াড় তো

কোন ছার, রেফারিকে অবধি গালাগাল দিয়ে ভূত ভাগিয়ে দেন, এক সময় তো দুরন্ত ট্রিক ছিল রেফারি ফাউল দিলে তাঁর দিকে হাতজোড় করে থিস্তি দিতে দিতে এগিয়ে যাওয়া, যাতে গ্যালারি থেকে ভাবে ক্ষমা চাইছে, আর রেফারি বোঝেন মা চাইছে। কিংবা বোন। এ সকল স্ট্র্যাটেজি খুব নীতিগ্রস্ত নয় বটে, সে তো একটাও ফাউল করা উচিত নয় ঠিকঠাক এথিক্স মানতে গেলে, কিন্তু অমন গান্ধীদুরন্ত নীতি মানতে গেলে তো বিবাহিত লোক বিকিনি দেখলেই ডিভোর্স ডাকতে হয়। মাতারাঞ্জিকে রেড কার্ড দেখানো উচিত ছিল যাঁরা বলছেন, তাঁদের পরামর্শ শুনলে ফিফাকে এখুনি বেশ ক'শো এক্সট্রা রেড কার্ড ছাপতে দিতে হবে। সিন্ধু স্ক্রিন প্রিন্টিং করলে খরচও কম না। তবে সবচেয়ে অশ্রু-ওসকানো পয়েন্ট নাকি: 'মা তুলেছে'। উলে বাবা লে। ছোনুমোনু আমার। মা তো নয়, ম্মা। ম্ম্মা। ম্ম্ম্ম্মা। এটা কি তাপস-পাল-সন্ধ্যারানির ক্লাইম্যাক্স? একটা লোক যদি প্রতিপক্ষের মনোযোগ হড়কে দেওয়ার জন্য খচাৎ বিঁধিয়ে দিতে চায়, কী তুলবে? সে কি বলবে 'তোরা ন্যাড়া মাথায় গন্ধ, কাল ফাইনাল বন্ধ'? বরং একটা গোটা ফুটবল ম্যাচে কেউ কারও মা তোলেনি, এটা একটা জবর খবর হতে পারে। ভরসা: জনগণ, গণজন ও ননগজ-দের এই ধাস্টামি শট মেরে উড়িয়ে ইন্টারনেটে জিদানকাণ্ড নিয়ে রইরই ইয়ার্কি চলেছে। ভিডিয়ো-খেলা: কতগুলো মাতারাঞ্জিকে তুমি গুঁতিয়ে ফেলে দিতে পারো। আরও: 'কী ভাবে জীবনের সমস্যার সমাধান করতে হয়' সিরিজ। দাদা হাজরা কোন দিকে? জানি না। ধড়াম টুঁ। আর একটি দৃষ্টিকোণ বিষয়ক, এই গুঁতাকে নানা দেশ কী ভাবে দেখছে। আমেরিকা দেখছে: মাতারাঞ্জি দিব্যি মাঠে হাঁটছেন আর হঠাৎ মাটি থেকে গুপ্ত দরজা খুলে উঠে আসছে 'মুসলিম উগ্রপন্থী', ব্যস, ঠাই ঠাই ঠাই ঠাই ঠাই। তবে শ্রেষ্ঠটা তো সবারই এত ক্ষণে জানা। মাতারাঞ্জি আসলে জিদানকে জিজ্ঞেস করেছিলেন 'হাম ক্লোর মিন্ট কিঁউ খাতে হ্যায়?' দড়াম অস্তে জিদান: দুবারা মত পুছনা!



আর এক সুপারম্যানের পতন দেখে তো খাঁকখাঁক হাসি চাপা দায়। ভিনগ্রহের চামড়া টাঙিয়ে এত যে 'সুপারম্যান রিটার্নস' ঢকা, ও দিকে হিরোর কেঠো মুড়ুতে সিকি এক্সপ্রেশনও ধরে না। অবশ্য এ দিক থেকে অতিমানবিকই, এত খারাপ অভিনয় সাধারণ নশ্বরের পক্ষে সম্ভব নয়। আর অভিনয়ের আছে কী? জোড়া ঘুঁষি পাকিয়ে শোঁ শোঁ ওড়া, পেলায় ভারী জিনিস প্রাণপ্রণ পাকড়ানো— গাড়ি, প্লেন দিয়ে শুরু, শেষপাতে একটা গোটা মহাদেশ উপড়ে স্পেসে হাঁকড়ে দেওয়া। নিরেট, পাতি, গল্পহীন, তার ওপর এই যুগেও হলিউডি স্পেশাল এফেক্ট দেখে বার বার হাই উঠবে। ও দিকে 'ক্রিশ'? যার দু'খানি R (KRRISH) দেখে আমুল বিজ্ঞাপন দিয়েছে FRRESH? সত্যিই, তরতাজা, দুরন্ত, ঝকাস। এইখানেই ভারতের জয়, আমেরিকা থেকে লোক ভাড়া করে এনে অতুলনীয় স্পেশাল এফেক্টের সঙ্গে মেশানো হয়েছে আমাগো দুর্দান্ত স্ক্রিপ্ট। তাতে আবেগ আছে, মানবিকতা আছে, মায় শচীন ভৌমিকও আছেন। একটা লোক খুব জোরে উড়তে পেরেই দর্শকের মাথা কিনে নিয়েছে, ভারতের এত গাধা-মনন নয়। স্পিলবার্গ অবধি এক বার ডাইনোসর দৌড়



ক্রিশ: সুপারম্যান দিশি, কিন্তু ফিশি নয়

নার্সিং হোম পর্যন্ত ‘অমুক টাকায় বাইপাস সার্জারি এখানে ছাড়া কোথাও হয় না’ হোর্ডিং-রত। কিন্তু ক্যাম্পেনের নিশ্চিত জয় সূচিত হল অধুনা, ‘অর্জুন’ ছবির অ্যাড পড়ল ‘অর্জুন ছাড়া মহাভারত হয় না’। এ বার ‘ছাড়া ছাড়া বিজ্ঞাপন হয় না’ লিখে দিলেই, সোহাগা।

২৩ জুলাই, ২০০৬

করাতে পারলে আর থামতে চান না। কিন্তু এখানে অপরিণত আত্ম-লাই নেই, চিত্রনাট্য এমন দুরন্ত কষা হয়েছে, এমন আষ্টেপৃষ্ঠে বুনে দেওয়া হয়েছে অসম্ভব স্মার্ট চকমকিগুলো গল্পের সঙ্গে, ওগুলোকে ভাসতে থাকা তেলের মতো এক্সট্রা মনে হয় না। আর হুতিক? উঃ। যেমনি দেখতে, তেমনি শোয়ারজেনেগারীয় বাইসেপ, তেমনি চারটে রোলে অভিনয়।

১. গ্রাম্য সরল কৃষক, বা বলা ভাল টারজান, যে পশুপাখিশিশু বোঝে শহুরেপন বোঝে না, ২. সপ্রতিভপ্লাস ক্রিশ্ণা, ৩. ক্যাবলা কিন্তু জিনিয়াস বাবা, ৪. ধুঁকন্ত প্যারালিসিস-গ্রস্ত বাবা। আর নাচছেন তো রবারের মতন। টানটান, মসৃণ ছবি। ইমোশন আছে, মোচড় আছে, তাকে হেজিয়ে ঘষটানো নেই, ন্যাকামি নেই। হান্স-এর মতো এখান থেকে ওখানে উড়ছেন ক্রিশ্ণ, ম্যাট্রিক্সের কিয়ানু রিভ্‌স-এর মতো ঐকছেন বেকছেন স্লো মোশনাচ্ছেন ফের চকিতে হেবিস স্পিড। রাকেশ রোশন তুখোড় দক্ষতায় দল গড়েছেন (টুটু বসু লজ্জা পাবেন), বিদেশ থেকে অ্যাকশন ও এফেক্টস-বিশারদ, দেশ থেকে সবচেয়ে অপূর্ব চেহারাওলা হিরো ও পাঁচ জন চিত্রনাট্যকার, ফলে মিশ খেল বিদিশি মিস্তিরিগিরি আর দিশি মগজাস্ত্র, জমে একেবারে কাজু-ক্রিশমিশ!



একটি নিউজ চ্যানেল ‘হানা ছাড়া ত্যানা হয় না’ গোছের প্রবল টিজার-এ শহর মুড়ে দেওয়ার পর আসলি পাঞ্চ-লাইনটা আসার আগেই তাদের নাকের তলা থেকে তাবৎ ঝড় চুরি করে নিয়ে ‘ইয়ে ছাড়া কম্পিউটার হয় না’ লিখে মাত করে দেয় আর একটি কোং। কিন্তু ব্যাপারটা অ্যান্ড হিট,

তো মার সেই কই ?

স্বাধীনতা নিয়ে চ্যানেলে চ্যানেলে যত ইন্দিপিন্দি হোক, স্টার ওয়ান বিজয়ী চুটকি-লেখকদের বেবাক উড়িয়ে দিক সেনাবাহিনীর সঙ্গে 'সুখোই' বিমানে, কেহ কি মারতে পারবে সেই অনবদ্য 13C বাস-কে, যার পিছনে খচিত '১, ২, ৩— আমরা স্বাধীন, ৩, ৩, ৬— নেতাজি করেছেন জয়। ৬, ৬, ১২ — নেতাজি কোথায় আছেন বলতে পারো?' অসামান্য নামতাটি তাবৎ বাঙালি খুদেকে কোঁতকেলা করে গেলানো উচিত ও অচিরে পাড়াস্টেজে ধ্বনিত: 'নোমোস্কার। কবিগুরু 13C-র, এক-দুই'! এ লিখনের তলায় অবশ্য 'বাসে উঠে খুশি, যেন উত্তমকুমারের হাঁসি', সে এটু তুয়েবুয়ে 'ফ্ল্যাগ উড়িয়ে খুশি, যেন গান্ধীর ফোগলা হাঁসি' বাগালেই, ধুরো স্বাধীনতা প্যাকেজ। এ দিকে পুজোর আচাভুয়া থিম-ঘোষণা পথেঘাটে ব্যানার রূপে সংস্থিত। একটি থিম: চিরুনি! বিশাল চিরুনির ছবি দিয়ে, পাশে: 'চিরদিনই ছিল সাথে, নতুন করে চিনলাম তাকে'। উকুন নিকি ও খুশকি ছাড়া আজি তবে জগজ্জননীর মহিমা দাঁতে কাটবে আমাগো পোষা কাঁকই! আরও: চিচিং ফাঁক গুহা। ঘড়ঘড়িয়ে দু'দিক হতে দরওয়াজা খুলে যাবে। হালের বিন্দাসগণ অবশ্য আলিবাবার নাম শোনেনি, মেট্রোর স্লাইডিং দরজাও ভাবতে পারে। আবার মহাভারত নিয়ে হেবির ক্রাইসিস! অ্যাডিন 'কঙ্ক' ছিল যুধিষ্ঠিরের গো অ্যাজ ইউ লাইক-এর নাম। বিরাট রাজার সভায় অজ্ঞাতবাসের জন্য যুধিষ্ঠির পাশার জম্পেশ বোর্ড ও ঘুঁটির বাক্স বগলে গুটিগুটি গ্রেট গ্যাম্বলার সেজে গেলেন, নাম নিলেন কঙ্ক। কিন্তু আজি এক হিন্দি ফিলিমওয়াল তঁার স্টার-অধ্যুষিত ছবির নাম এমন দিয়েছেন, স্মার্ট সংক্ষিপ্ত ফর্ম মুখে মুখে ঘুরিছে 'KANK'। ফলে, এপিকাভিধান চেঞ্জিত।



ইরানে শুরু হল ব্লগ-লিখিয়েদের ওপর নজরদারি, ধরপাকড়। ঠিকই, বই লেখার জন্য জেল হতে পারে, হাবিজাবি হ্যান্ডবিল ছড়ালে পিছমোড়া, তো ওয়েব কি পির? আসলে অনেকে এ অর্বাচীন আন্তর্জাল-বিশ্বকে এক বেবাক নূতন গ্রহ ঠাউরে ফেলেছে, যেন হেথা নরসত্তা এক্সট্রা-স্বাধীন তাধিনতাধিন, যেন হাতে করে লেখাগুলো ছোঁয়াছানা যায় না বলেই তারা এক বায়বীয় ইউটোপিয়া-জাত বাক্‌স্বাধীনতার কাচ্চাবাচ্চা। কখনও হয় বাপ? স্বপ্ন ও স্বমেহনের ফ্যান্টাসি ছাড়া আর কোন মাঠেই বা তুমি তছনছিয়া রেলায় খেলার প্রতিভা বিকাতে পারো, যাতে রাষ্ট্র টুঁটি মুচড়ে যথাযথ টাইট দেবে না? অতএব যৌনতা, আন্তর্জাতিক রাজনীতি সম্পর্কিত বাখোয়াজি, স্বদেশ লয়ে গজগজ— ইরানি ব্লগে চলবে না। আর

ইসলামবিষয়ক বেগড়বাই তো ইইইক্স! আশ্চর্য কী, বছরখানেক আগে এই ইরানের ‘সুপ্রিম কালচারাল রেভোলিউশন কাউন্সিল’ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিল ‘the distribution and screening of foreign films which promote secular, feminist, liberal or nihilist ideas and degrade oriental culture.’ ‘সেকুলার’, ‘ফেমিনিস্ট’, ‘লিবারাল’, আর ‘নিহিলিস্ট’ সকলই ভাইবেরাদর! এ অনেকটা ছোটবেলার ‘রথের মেলা’ রচনায় ‘ঝুড়িতে দেখলাম অগুপ্তি ছোট মূর্তি ! বাঁদর, পেঁচা, শেয়াল, জওহরলাল, ক্ষুদিরাম, ভাল্লুক...’-এর মতো, না? জার্মান কাগজে বেরোল, হিটলার বাইবেল বদলে ফেলতে আদেশ দিয়েছিলেন এবং সে কন্স পুরোদমে চলছিল। ‘যিশু আদৌ ইহুদি নন, তাঁর পরিবার এসেছিল কাভকাজ পর্বতশ্রেণী থেকে’ মার্কাস উড্ডট সমীক্ষা তো বেরোচ্ছিলই, প্লাস জার্মান ধর্মতাত্ত্বিকরা লিখেছিলেন ‘ইনস্টিটিউট ফর পিউরিফিকেশন অব ক্রিস্টিয়ানিটি’ প্রার্থনাগ্রন্থ, তাতে তাবৎ শ্লোকে হিব্রু শব্দটক বাদ দিয়ে তকতকে সাফসুফ। ‘হালেলুইয়া’ দেখলেই হাঁ হাঁ করে লাল দিয়ে ইয়া ঢাঁড়া আর কী। তবে সর্বাধিক দোদগু ‘জার্মান বুক অব ফেথ’, তাতে দশটি কম্যান্ডমেন্ট-এর সঙ্গে বাড়তি দুটি যোগ! তার একটি: ‘দাউ শ্যাল্ট রেসপেক্ট দাই ফুয়েরার’!



মকবুলাস্তে বিশাল ভরদ্বাজকে এ কলামে বিশেষ তোলাইদান ঘটেছিল। এ বার কথা গেলার সময় ঘনায়েছে, কারণ ‘ওমকারা’ এক অতি রদি জগঝাম্প। একটি রামগোপালমার্কাস পাতি, বোরিং, চড়াস্য চড়া, ‘আভারওয়ার্ল্ড ও থিস্টি ছড়ায়েচি, অতএব ফাটিয়ে দিয়েচি’ তুপ্তিওলা, বলিউডি ছকবন্দি ছবি। সব চরিত্র কার্ডবোর্ডে তৈরি, একমাত্রিক, গাঁকগাঁকে। সর্বাধিক অ্যালাস: গত বার শেক্সপিয়রকে ইচ্ছেমত ভাঙাচোরার যে দুর্দম কলারতোলা মস্তানি ও প্রতিভা শাঁ ঝলসেছিল, তা লেবড়েজুবড়ে, ‘দোহাই সেক্সপির’ রবে ভক্ত হনুর ন্যায় করজোড়ে একেবারে টায়েটায়ে ওথেলো-কে অনুবাদ করে দেওয়ার সেফ সড়কবর্তী হওন। শুধু ঘনঘটাকে উপড়ে উ. প.-তে এনে ফেললে আর শেষ সিনে নারী দিয়ে ভিলেনকে খুন করলেই নিজস্ব ওথেলো হয় না। কিছু অর্জন ও কিছু বর্জন করে মূল পাঠটিকে দাবড়ে পিষে চেটে চুষে স্বীয় লালায় সিক্ত করলে, তবে না সর্জন ঘটবে? রাম সেলফোনে রাবণকে ‘আবের দশমুখো, পাঁচটা ডাঁয় পড়বে পাঁচটা বাঁয়’ হুমকি দিল আর অমনি মহাকাব্যের আধুনিক এডিশন গজিয়ে গেল, ব্যাপার এত সহজ নয়। শুধু গ্যাজেট না, পরিবেশ না, ও তো আস্তরণ বাপ, তোমাকে ওর ক্রাইসিসের সঙ্গে মৌলিক ক্ষরণ মেশাতে হবে। ওর শরবতে তোমার গায়ের ঘ্রাণ, ঘামের নুন। নইলে, শ্রেফ পুনর্বীর ভ্যাজরং করার্থে, ক্লাসিক লোন নেওয়া নিরর্থক। আবার গানের সময় অজয়-করিনাকে স্লো মোশনে বাড়িময় দৌড় করানো হচ্ছে! আরও গদগদে: ওমকারা যখন একটি দলের নেতাকে বেধড়ক ঝাড় দেয়, সেই দলের গুন্ডা পয়েন্ট-ব্ল্যাংক আওতায় পেয়েও তাকে গুলি করে না, হাত নাগাড়ে কাঁপে, হিরোও উদ্যত নলের সামনে দিব্য অনার্ভাস, হেলেদুলে কার্য সেরে ঘটি তুলে আলগোছে জলটল খেয়ে এক্সিট মারে। পেছন হতে গ্লোরি-গান:

‘ওমকারা’! এর চেয়ে বাপ ‘কালিয়া, কালিয়া’ ইকো দিলিনে কেনে? আর সইফ আলি খান? কুঁজি মছুরা বই কিছুটি নন। একতা কপূরের সিরিয়ালে কুচক্রী ননদিনীগণ ও ভাবে যুগ যুগ আড়ে তাকাচ্ছেন। মোদা : ছবিটি হৃদমুদ বাঁকের কই, তালমিছরিতে নেই নিজের সই। আর একটি অগা ছবি ‘ইঁয়ু হোতা তো কেয়া হোতা’। এর শেষে একটি মোক্ষম প্যাঁচ হাজ, এবং তা-ই ভেবেই পরিচালক আগাগোড়া অ্যায়সান আত্মখুশি, প্যাঁচ-পূর্ব গ্রন্থিটুকু স্পি, থসথসে, বাঁধুনিহীন ছেড়ে রেখে হাবলা। সুহাসিনী মুলে নাচেন, পরেশ রাওয়াল গান, আর ইরফান প্রেমের ব্যর্থতার জাম্পকাটে ঘচাৎ মোচড় খান। ফক্কা। তার চেয়ে দেখে আসুন গে রাজা ভট্টাচার্যের নাটক ‘ফুডুৎ’, যদিও বেশ খানিক ছাঁটকাট ও টাইট-করণ প্রয়োজন আর অ্যাকাডেমিতে দেখলে বহু গানের কথা কিছু বুঝতে পারবেন না, কিন্তু গোটাটায় ভরপুর অকৃত্রিম আহ্লাদ, পেলায় ঝলমল, আর রাজার ভূমিকায় দেবশঙ্কর হালদার যা তুমুল খুশিয়াল অভিনয় করেছেন, তাঁকে কাঁধে করে হুররে দিতে দিতে সাত বার ময়দান প্রদক্ষিণ উচিত। তাঁর ক্ষণে ক্ষণে পাট ভুলে আধ হাত জিভ কাটা, মেলোড্রামার গন্ধ পেয়ে হাঁ হাঁ করে মুখস্থ যাত্রার সংলাপ আউড়ে ফেলা, হাই-পিচে স-স করে ডায়লগ, পরম ফুর্তিভরে গানের সঙ্গে কোমর বেঁকিয়ে নাচ: শুধু এ জন্যই নাটকটা দু’বার দেখা যায়। সেই রাজা থ্রেটস্টরক মুখ করলে আবার পেছন থেকে ‘শোলে’র গব্বর-মিউজিক! প্রথম দিকে তাঁকে শাহেনশা-ফাহেনশা বলা হচ্ছিল, পরে ‘অ্যাই তুই’। সব বন্ধু তো, পাট করছে একসঙ্গে। নাটক জুড়েই

পার্টের ভেতর-বাইরে সবার ঘোরনফেরন। মন্ত্রী তো হুবহু কাঠবুড়ো, দাড়ির গিঁটটিটসুদ্ধ, আর তিনি যখন পাহারোলাদের নিয়ে বাইকে চড়ে অভিযানে যান, মৃদু স্বরে ‘এই পথ যদি না শেষ হয়’ বেজে ওঠে। দারুণ! রঙ্গ দেখে তাবড় ডিপ্রেসনওলাও নিজ উদরে লিখবেন ১, ২, ১৯— মজার সংখ্যা গুনিস!

২০ অগস্ট, ২০০৬



ওমকারা : বড়িয়া অ্যাটমস্ফিয়ার, কড়িয়া থিস্তিখামারি,
শেষ অবধি নাথিং বাট টুকলি

পু জো য গাঁ ধী মু ন্না চ ড়ে

পু অ্যাড জো। ব্যস, স্টেপ ফেলার জো নেই। নিজের গ্যাটের কড়ি খরচা করে পাবলিককে আমোদ দেওয়ার জন্যে সংঘ-সমিতি সব হিল তুলে লাফাচ্ছে। মোড়ে মোড়ে কী টাটানো ব্যানার! বাঙালির তৃতীয় নয়ন ফুঁড়ে টুকটুকে ফোঁড়ার ন্যায় নির্গত পদ্যপ্রতিভা। ‘সিঁদুরে নেয়ে লাল মা ক্ষেপীর চাতাল’ কিংবা ‘হাভেলির দেশে মা ভবানীর বেশে’ তো আছেই, বিশদ কাব্য হল: ‘মেদিনীপুরের পটের ছবি চাও কি তুমি দেখতে আজ/ সাথে পাবে পুরুলিয়ার ছৌ মুখোশের নানান সাজ/ প্রিন্সকে পাবে জিদান পাবে রোবট আছে ভূতের নাচ/ আরো আছে অনেক কিছু হরেক রকম আলোর কাজ।’ আলোকাজের লিস্টি: জিদানের গুঁতো, প্রিন্সের নবজন্ম, ভূতের হাসি, রোবটের গুলি! কেউ কেউ মিলফিলওলা পদ্য পেরিয়ে স্মার্ট গদ্যে: ‘অমুকের পুজো দেখতে হয়, নইলে আফশোষ করতে হয়।’ কোন কাগজের শ্লোগান থেকে ইয়ে করা যেন? এ ব্যানারে আরও: ‘বাংলাদেশ, উড়িষ্যা, কেরালা, রাজস্থান, মণিপুরের পর... কি বিমানবাবু! এবার তাহলে কলকাতায় কোন রাজ্য?’ যাব্বাবা, কী রাজ্যের কী থেকে থিম হচ্ছে, খামখা বিমানবাবু ঠেলা খেলেন কেন? ব্যানারের আর এটু নীচে এলে মালুম দেবে। এ পুজো-কমিটির সভাপতির নাম অরূপ বিশ্বাস!



তুমি নব নব রূপে এসো ব্যানে। একে তো আমাগো টিভিতে ‘আর কিচ্ছুটি দেখাব না’ হুমকি তর্জনী তুলছে, এই যে কৌচে হেলান দিয়ে অল্প সেক্সটুকু চোঁ করে মেরে দেব রামের তলানির ন্যায় সে আরামটুকু অবধি টিপে মারতে আকুল এ শয়তানের হাড্ডি সরকার, ও দিকে খুশবু একটি সিনেমায় পেরিয়ারের স্ত্রী মনিয়ান্মাই-এর রোল পেয়েছেন বলে তামিলনাড়ু রাজ্য বিধানসভায় অবধি হলস্থূল, কারণ নায়িকাটি একদা বলেছিলেন বহু তামিল মেয়েই বিয়ের আগে যৌন সম্পর্ক করেন এবং তাতে দোষের কিচ্ছুই নেই (আ ছি, আ ছি, এ কী কতা গো অ্যাঁ খুশবুর ছেলের মা? বিয়ের আগে সেক্স কল্লে দোষ নেই! বলে বিয়ের পরে সেক্স করলেই অসৈরন, নিতান্ত প্রজননার্থে গা-বমিবমি কাজটি আমাদের নাক টিপে এক আধ বার সইতে হয়, আর সে জন্য অপরাধবোধে সকালসন্ধ্যে কম বার হাপুসহপুস নাইছি না)! ও উজ্জিতে তিনি যে তাবৎ তামিল মেয়ের পবিত্রতায় দামি ও পার্মেন্ট চুন প্লাস কালি বেশ তরিবৎ করে ঢেলেছেন সন্দেহ নেই, অতএব তাঁকে তো আর তামিলদের এক আদর্শ নারীর, নিষ্ঠা ও ত্যাগের প্রতিমার, ভূমিকা নিভাতে দেওয়া যায় না। নটী বিনোদিনী কী করে চৈতন্যের রোল করবেন? হক কথা। আর ইহাতেই আটকে নেই বিশ্ব জুড়ে অকন্মা

খেতিপিসিগণের খ্যানখ্যান। মালয়েশিয়ায় সেন্সর বোর্ডকে আদেশ দেওয়া হল ভারতীয় ফিল্মে কোনও আত্মহত্যার দৃশ্য থাকলেই কেটে বাদ দিতে, কারণ এই গোছের এক ছবির কুপ্রভাবেই নাকি কে মহিলা ট্রেনলাইনে বাচ্চাকাচ্চাসহ গলা দিয়েছেন। অর্থাৎ বেচারি মালয়রা ধীরে আস্তে ‘মাদাম বোভারি’ থেকে ‘ক্লিওপেট্রা’ অবধি বহু ক্লাসিক বেঘোরে খোয়াবেন। আশা করা যাক ও দেশে কেউ ভাল ফিল্ম দেখতে না পাওয়ার শোকে স্বহত্যা করবেন না। আমেরিকায় ডাক্তারদের বলা হচ্ছে তাঁরা যেন বাচ্চা বা টিন-এজারদের কক্ষনও না বলেন তারা ‘obese’ (বড্ড মোটা), তাতে তাগো হৃদে নেগেটিভ অনুভূতি ফুটবে। বলতে হবে ‘ওজন বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখছি এটু।’ ডাক্তারি ডায়লগেও পলিটিকাল কারেক্টতা এমন গাঁতিয়ে ঢুকে গেলে, রোগীর ক্যানসার হলে তাঁরা কী বলবেন? ‘আপনার, ইয়ে, তেমন কিছুই হয়নি, বুইলেন না? আপনি ক্রমেই, ‘আনন্দ’-এর রাজেশ খন্না বা ‘কাল হো না হো’-র শাহরুখের মতো, ইয়ে, গ্ল্যামারাস হতে চলেছেন। আমার ফিজটা?’



বিখ্যাত মার্কিন রিয়ালিটি শো ‘দ্য সারভাইভারস’ ছ’বচ্ছর ধরে রমরম চলছে, এ বার টি আর পি ঘোর তোলনার্থে প্রতিযোগী দলগুলো গড়া হল স্পষ্ট বর্ণভেদ অনুযায়ী। চারটি দল: কালোদের, এশীয়-মার্কিনদের, হিস্পানিকদের, সাদাদের। বোঝাই যাচ্ছে, অফিস থেকে হুমড়ি খেয়ে বাড়ি ফিরেই জাত্যভিমান লেপ্টেসাপ্টে ‘সাদা হাকুশ কালোগুলো যেন আমাদের পেরিয়ে না যায়!’ কিংবা ‘তবে রে অত্যাচারী পাঁশুটেরা! আজ সন্কেয় নিপাত যাবি!’ আমেরিকার গোমুখ্য ও বর্তমানে তিরিঙ্কিতর সমাজে এ ফুসলানির দরকার ছিল কি না, জিজ্ঞাসিত হয়ে প্রযোজক মার্ক বার্নেট বললেন, ‘কই, এ দেশে তো কেউ মানুষের চামড়ার রং হিসেব করে ঘেন্না করে না!’ এবং তৎপরে ‘যতই থিয়োরি কপচাও, এক রঙের লোক মানেই এক কুঠুরিতে গাদাগাদি’ থিমেই বেজে উঠে— ‘এই তো নিউ ইয়র্কেই ‘লিটল আফগানিস্তান’ আলাদা অঞ্চল রয়েছে। হয়তো ৩০১০ সালে, যখন আমাদের সবার চামড়ার রং কফির মতো হয়ে যাবে, এ সব পার্থক্যে আসবে যাবে না। কিন্তু এখন, যা সত্যি তা মেনে নিতে হবে।’ আয়ারল্যান্ডের নাট্যকার জন মিলিংটন সিঞ্জ-এর সম্পূর্ণ রচনাবলি নিয়ে তৈরি হল নাটক ‘ডুইডসিঞ্জ’। অভিনীত হচ্ছে ঝাড়া ন’ঘন্টা ধরে। এক রচয়িতার তাবৎ সৃষ্টি একধারসে দেখতে পাওয়া খুবই ভাল, কিন্তু যে সময় ‘অ্যা! তিন ঘন্টার সিনেমা’ চিখ কান পাতলেই শোনা যাচ্ছে ও কারও মনোযোগ টানা আধ মিনিটের বেশি ফোকাস মারতে পারছে না, সে যুগে এই? গাছ-আঁতেলও পারবেন, ইমেজ ও স্পন্ডিলোসিস যুগপৎ ব্যালেন্স করতঃ শিরদাঁড়া সোজা রেখে অত ক্ষণ বসতে? আশা করা যাক রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে কারও এমত চিন্তাভাবনা নেই। টানা তিরিশ দিন তো বাথরুম না গিয়ে থাকা যাবে না।





হিন্দি ছবির হিরো!

‘বেন হার’ দেখে এসে বেশ আঁতেলসুলভ ঘাড়ঝাঁকানি দিয়ে বলার চল ছিল, ‘এ ছবির নায়ক বেন হার নয়, মেসালাও নয়, যিশু।’ কিন্তু সে ছবির মতো ইনডাইরেক্টলি না কয়্যা, ২০০৬ সালে, সরাসরি মহাত্মা গান্ধীকে নায়ক করে, তৈরি হল একটি মেনস্ট্রিম হিন্দি ছবি! গান্ধীবাদ নিয়ে ক্লাস ফাইভ থেকে হাসাহাসি করা নিয়ম। গান্ধী ছিলেন বোকা আর নেতাজি ছিলেন ঠিক, গান্ধীর পথে চলেই আমাদের স্বাধীনতা আসতে দেরি হয়ে গিয়েছিল, সব শিশু জানে। বড় হয়ে কিছু লোকের ধারণা বদলায় বটে, কিন্তু বেশির ভাগই ‘মাইরি অত ছোট কাপড় পরে কী করে সবার সামনে আসত’ মার্কী আবছা বিস্ময় ও শ্রাগ-মূলক ঔদাসীন্য নিয়ে চেয়ে থাকে। এই ‘লগে রহো মুন্না ভাই’-এর একটা চরিত্র যেমন আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলে, গান্ধীর দুই ছেলেমেয়ের নাম ইন্দিরা গান্ধী আর রাজীব গান্ধী। সোজা কথায়, পপুলার উইজডমে, গান্ধীর কথাবাত্তা উদ্ভট ও অবাস্তব, এক গালে চড় মারলে উজবুক ছাড়া কেউ অন্য গাল প্রম্পটলি বাড়ায় কি, অতএব গান্ধীবাদী=গাড়ল নির্বিবাদী। সেই জমানায় দাঁড়িয়ে, গণ্ডগামিকে বশ করে টাকা তুলতে হবে জেনেও, হিট ছবির সিকোয়েল করতে গিয়ে, প্রথমেই সিকোয়েল-সংজ্ঞাকে বেঁকিয়ে শুধু মূল চরিত্রগুলোকে রেখে বাড়তি ব্যাগেজগুলোকে বেমালুম ভাসান দিয়ে, নতুন গল্পের একদম কেন্দ্রে ক নয়, খ নয়, গান্ধীবাদকে রাখলেন রাজকুমার হিরানি! আর এ গান্ধী ঝাপসা নন, লং শট-গ্রন্থ নন, দিব্যি সামনে আসছেন হাসছেন বসছেন। এবং শেষ অবধি এ-ও: গান্ধী, ছবির যে প্রেমময় সদাহাস্য বৃদ্ধকে তত ক্ষণে লোকে বেদম ভালবাসছে, তিনি কোনও ভারবান সত্তা নন, এক ধারণা। লোকের পেছায় অ্যালার্জি আছে এমন জ্ঞান ও গম্যিকে সারল্যে নামিয়ে এনে কিন্তু কিছুতেই তারল্যে গড়িয়ে যেতে না দিয়ে, ওজনদার মূল কথাগুলো অবলীলায় বলে কিন্তু এতটুকু বোর না করে, তরোয়ালের ধারালো ধারে দুঃসাহসী ব্যালেন্স-হাঁটন, ও একটি পেছায় স্মার্ট টানটান ঝলমলে কমেডি নির্মাণ! কী হচ্ছে রে ভাই হিন্দি ছবিতে! বাংলাওলারা যে উড়ে গেল দূর দিগন্তে! কী কচ্ছিলে বাবু, যখন ওরা ‘মাই এক্সপেরিমেণ্টস উইথ ফিল্ম’ লিখছিল? কেন, ধর তত্ত্ব মার আলপিন মর্মে একের পর এক প্রোজেক্ট ধরে, ‘মাতাআ, ফিনিশ!’

১৭ সেপ্টেম্বর, ২০০৬

জো লি কে পি ছে

এরে কয় ঈশ্বরের নয়া কৃপা-স্কিম: বাই ওয়ান, গেট ওয়ান ফ্রি। দুগ্লা যেতে না যেতে ভারতের বুকে নেমে এয়েচেন অ্যাঞ্জেলিনা জোলি! ব্যস, ফুর্তি-শাবকদের হৃদয়ে নাল পড়ছে সপাসপ! দ্যাকা দে, দ্যাকা দে ম্মা। ওই ওই বোধহয় জোলিদির নাকের ডগা দেখা গেল রে, জানলায় ওই খোঁচটা ঠিক কনুইয়ের চিমসে চামড়া লয়? আরে এই ড্যাকরা, গতর নেড়ে হোটেলের লন্ড্রিতে যা না, কী কী কাচতে দিল দেখে আয়, ঘামটাম সব শুঁকতে কী রকম, আর হ্যাঁ, ওয়েটারের কাছে পাক্সা ইনফো, বিরিয়ানি খেয়ে কটা উদ্যার হেউ আর কটা হেউ। হ্যাঁ রে অটোওলা, ও সোনা ড্রাইভারটা, বল না, ওঁয়ারা সফর করতে বেরিয়ে এই সিটে, অ্যাঁ, তোর এই রংচটা রেঞ্জিনে, অ্যাঁ, অবিকল চলটা-ওঠা এইখেনটায়, মায়াবী জোড়ানিতম্ব ঠেকিয়ে বসেছিলেন রে? অ্যাঁ? ওম পাওয়া যাবে এখনও হাত দিলে? উফ, আপুন-ত্বকে চিমটি কাট রে চিমটি কাট, ব্র্যাড পিট আর ভিমরুল-কামড়ানো অধরউলি জোলিসাহেবা, বিশ্ব-সেক্সগডাগডি, জোড়ে এয়েচেন এ কেলটে কোঁকড়ানো দেশে। তো আমরা পেন্টু খুলে লাচব না? দিয়েওছে তো, ধুমসো বডিগার্ড, একটা রিপোর্টারের গলা একেবারে চিপে চুমরে। যে, ইংলিশ-বেংলিশ বুঝি না, হলিউডের কাছে তোরা চাকর-বাকর ক্লাস। টানা পা চাটবি, ভক্ত হনু হয়ে থাকবি। অস্কারের জন্য ল্যা-ল্যা করবি। সে আর বলতে, পালোয়ানদা? ‘অঁঃ, অঁঃ, অঁস্কার নঁবোঁ’ ফুঁপিয়ে এ ছবি অফিসিয়াল যাচ্ছে তো ও খাবলেখুবলে ইন্ডিপেন্ডেন্ট দৌড়চ্ছে। তবে, যে রেটে ভারতীয় শাড়ি নারী curry আপনাগো পাঁশুটে দাঁড়িপাল্লায় বাটখারা বাগাচ্ছে, ক্যান জ্ঞানের দাড়ি বি ফার বিহাইন্ড? যে হারে ‘বা বাচ্চু’ বলে পিঠ চাপড়ে লেড়ে বিস্কুট ছুড়ে দিচ্ছেন, আজ নয় কাল, জোর পরশু, অস্কার জুটবেই। আঃ, হোক না তব সিনেমাবোধ আপনার মাস্‌লটার মতোই নিরেট, ডলারপুষ্ট, ‘হিট করিলেই ফিট’ গাম্বু-কনফিডেন্সশালী? সাটিকফিটিক তো ঝলসাবে ধাঁচকধাঁ? উফ, সে দিন কী তুবড়িটা ফুটবে রে, কী বুধিয়াটা ছুটবে! দিস পার্ট অব প্রশংসা স্পনসর্ড বাই হ্যানা অ্যান্ড ত্যানা, কেমন লাগে শ্যাম্পেনফেনা? দেশভর্তি ভাসান-নেত্বের মধ্যে তখন কী চেলাবে বিজয়ী লোকটা? ‘ও মানিকাকু! তুমি তো শুয়ে শুয়ে নিয়েছিলে! হান্সি কেমন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পেলুম!’

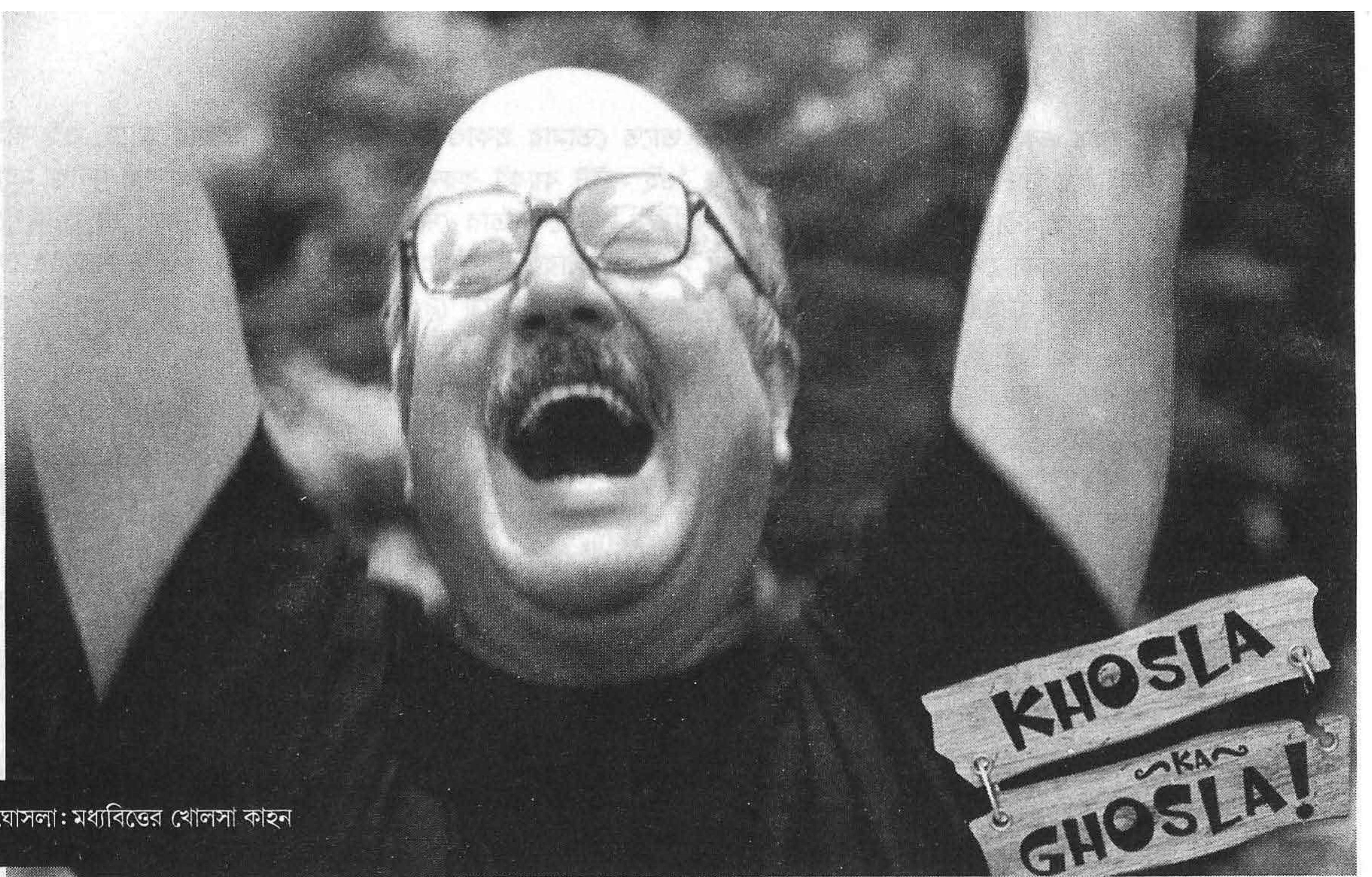


লেজার স্ক্যানিং করে দেখা গেল মোনালিসার পোশাকের ওপর অদ্ভুত ফিনফিনে ঢাকনা, যা সেই সময়ের রীতি অনুযায়ী

শুধু গভিণীদের বা সদ্যমা-দের পরানো হত, অর্থাৎ মডেল মহিলাটি হয় জন্ম দেব-দেব করছিলেন বা সবে দিয়েছিলেন, শাহজি করুন উপনিষদ নিয়ে ১০৮ এপিসোডের সিরিয়াল করবেন যাতে ২৫ কোটিরও বেশি টাকা লাগবে এবং তোলা হবে ৩৫ মিমি রঙিনে, শাহজিই রাজা রবি বর্মা-কে নিয়ে ছবি করছেন ইংরিজি-হিন্দি-মালয়ালম ত্রিভাষনে এবং সইফ আলি খান-মণ্ডিত ছবিটি মুক্তি পাবে ২০০৭-এ রবি বর্মার জন্মদিনে খোদ প্যারিসে, আনাউশে আনসারি বিশ্বের প্রথম মহিলা রকেট-বেড়ানি শুধু নন, প্রথম মানুষ যিনি মহাকাশ থেকে নিয়মিত ব্লগ লিখলেন, রাউলিংকে মার্কিন এয়ারপোর্টে আটকে দেওয়া হচ্ছিল কারণ উনি সপ্তম হ্যারি পটারের পাণ্ডুলিপি হাতে করে উঠছিলেন এবং বইপত্তর এখন কাছে রাখা ব্যান কিন্তু শেষমেশ উনি ঘাড় শক্ত করে থাকায় শিল্পের জয়, উত্তর প্রদেশের গুলবাহার শেরওয়ানি পাঁচিশ বছরের ছেলেকে ত্যাজ্যপুত্র করলেন কারণ সে ধম্মগুরুর ফতোয়া উপেক্ষা করে ‘বন্দে মাতরম’ গেয়েছে, নাতসি জমানায় হিটলারকে নিয়ে জার্মানদের বানানো চুটকি সংগ্রহ করে রুডলফ হেরজগ লিখলেন ‘হেইল হিটলার, দ্য পিগ ইজ ডেড’— এ সব জেনে কী ঘটনা হবে?



হ্যাঁ, একটা অন-লাইন কমিউনিটি হয়েছে, ‘উই হেট ইন্ডিয়া’, এবং তাতে জ্বলজ্বল করছে ত্রিবর্ণ পতাকা পোড়ানোর ছবি। আশ্পদা! মুম্বই হাইকোর্টের আওরঙ্গাবাদ বেঞ্চ মহারাষ্ট্র সরকারকে তুরন্ত আদেশ: ওয়েব-কোম্পানির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নাও। এ বার প্রশ্ন, এটা আমাদের পক্ষে যতই অপমানজনক হোক, এক জনের (বা একশো কোটি জনের) কেন ভারতকে প্রকাশ্যে ঘেন্না করার অধিকার থাকবে না? ভাবুন, ‘আমেরিকাকে দেখলে ওয়াক ওঠে’ সাইট থাকলে কেমন রইরই চার্লাইন লিখে গর্বিত মুচকি নিয়ে কফি হাউসে বসতুম? কিংবা ‘বুশটা মরলে ভাল’ সাইটে পদ্য বাগালে কলারে বিকোত ‘সাচ্চা ভাবনাবাজ’? তবে যদি-টদি নয়, এ সব ‘হেট সাইট’ সত্যিই আছে। প্রেমকে ঘেন্না করার, শিশুকে ঘেন্না করার, যৌনতাকে ঘেন্না করার, হোমওয়ার্ককে ঘেন্না করার সাইট আছে। আমেরিকা, ইজরায়েল, পাকিস্তান, ব্রিটেনের বিরুদ্ধে আছে। ইসলামের বিরুদ্ধে আছে। গান্ধিজি, সনিয়া গান্ধী, বুশ, কংগ্রেস, বিজেপি, ভারতীয় কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে আছে। হিমেশ রেশমিয়া হেট ক্লাব আছে। আবার এদের প্রায় প্রত্যেকের বিরোধী-ঘেন্নক সাইটও আছে। মানে, ‘আমরা তাদের ঘেন্না করি যারা ব্রিটেনকে ঘেন্না করে’ ইত্যাদি। আর, তাই তো হবে! সেটাই তো বাক্‌স্বাধীনতা। খুব ভাল করে যেটা বুঝে নিতেই হবে: বাক্‌স্বাধীনতাকে মর্যাদা দেওয়া মানে, তোমার যা সবচেয়ে অপছন্দ, সে কথাটাও অন্যের বলার অধিকার ষোলো আনা আছে, তা সসম্মানে স্বীকার করে নেওয়া। ওইটা না পারলে, শুধু তোমার পছন্দসই বাক্যগুলো শোনার জন্য উদারতার ধ্বজা ওড়ালে, ভণ্ডামি। যত ক্ষণ বিশ্বায়নকে থিষ্টি করে থুড়ে দেওয়া হচ্ছে, বলব আহা বাহা আওনে প্রগতিম্যান, যেই মাও জে দং-কে ধুইয়ে দেওয়া হবে বলব দে



খোসলা কা ঘোসলা: মধ্যবিত্তের খোলসা কাহন

শালার গলায় পা— প্লিজ বাথরুম যাও ভাই। কমোডের জলে আপনার মুখ আপুনি দ্যাখো। হুঁ, সেই ঠোঁটের ওপর মাছিগোঁফ, পাট করে আঁচড়ানো চুল, হ দিয়ে নাম। ‘উফ কী গরম’ বা ‘রবীন্দ্রনাথ ভাল’ এ কথার জন্য বাক্‌স্বাধীনতার সম্মানের দরকার কী? যা শুনলে বুকে ধড়াস করে লাগে, আঁচে ভেতরটা খাক হয়ে যায়, গা ঘিনঘিন করে ওঠে, তা বলতে দেওয়ার অধিকার স্বীকার করো। রুশদি বলেছিলেন, বাক্‌স্বাধীনতার অধিকার কথাটার মানেই নেই, যদি না বাক্যের মাধ্যমে অন্যকে আঘাত করার অধিকারটাকে সম্মান দেওয়া হয়। ভলতেয়ার : তোমার সঙ্গে আমি একমত নই, কিন্তু তোমার সেই বিরুদ্ধ মতটা প্রকাশের অধিকার রক্ষার জন্য আমি প্রাণও দেব। একটা লোকের বলার অধিকার

আছেই, ভারত একটি শয়তান, নীচ, কুচুটে দেশ। তাতে তোমার প্রকাণ্ড রেগে যাওয়ার অধিকার আছে, ওই সাইটে গিয়ে গাল দিয়ে ভূত ভাগানোর অধিকার আছে, ‘ওই সাইট বয়কট করুন এবং মেরা ভারত আসলে দুর্দান্ত মহান’ সাইট খোলার অধিকার আছে, এমনকী মেজাজ হারিয়ে ‘আ বে তোর দেশই বা কী এমন রে’ বলে যে ওটা খুলেছে তার দেশের পতাকা পোড়ানোর ছবি দিয়ে অন্য সাইট খোলারও অধিকার আছে। কিন্তু তার পেছনে সরকার লেলিয়ে দেওয়ার অধিকার নেই। নেই। টুটি টিপে গলা মুচড়ে মতামত থামিয়ে দেওয়ার অধিকার নেই। তুমি ইগনোর করো, খেপে লাল হও, জনমত গড়ো, তোমার যুক্তি দিয়ে আমায় কাটো। কিন্তু পথনাটক করার সময় গুলি করতে পাবে না। সব্বাইকে বুঝে নিতে হবে, ‘ওর কথা শুনে আমার খুব রাগ হচ্ছে’ আর ‘মার ব্যাটাকে’ সমার্থক ভাবে ব্যবহার করা যাবে না। গেলে, আস্তে আস্তে পৃথিবী সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে বললে পুড়িয়ে মারা শুরু হবে। আমার মুখটা রাষ্ট্রের ব্যাংকাঠেকলেই আমাকে পুঁতে দেওয়া যাবে। ‘পাকিস্তান মরুক’ বললে হাততালি পড়বে আর ‘দেশপ্রেম কথাটা বোগাস, সে প্রেম কীসের পবিত্র যা অন্যকে নীচু ভাবতে শেখায়, বর্ডারসাপেক্ষ প্রেমের কথা বলে সঙ্কীর্ণমনা স্কাউন্ডেলরা’ বললে ক্ষুর বেরবে। আবেগের গোদা বাসে চড়তে গিয়ে মানুষের সবচেয়ে দামি মৌলিক অধিকারের বডির ওপর দিয়ে চাকা চালিয়ে দেবেন না। সেই গবেট প্রশ্ন চুষে ফুলে ওঠা ঘাতক আঁকশি এক দিন আপনারও রোদ্দুরের শামিয়ানা হড়াস টেনে নিতে পারে।



সংক্ষিপ্ত কিন্তু সাংঘাতিক ইম্পর্ট্যান্ট: দিবাকর বন্দ্যোপাধ্যায় পরিচালনা করলেন ‘খোসলা কা ঘোসলা’। দারুণ, দারুণ, দারুণ ছবি। মধ্যবিত্তের কোলকুঁজো অস্তিত্ব, তার ফ্যালফ্যালে ভিত্তি চাউনি, তাকে নিয়ে ক্ষমতার তুড়ি মেরে ছিনিমিনি, তার তেতো-গেলা রাগ, লাজুক ভাল-লাগা, ঘুঁটি বেছে নেওয়ার প্রাণান্ত দ্বিধা, জড়িয়েমড়িয়ে বেঁচে থাকার ভারী ইচ্ছে, সব এমন জলরঙে কিন্তু কমেডিতে আঁকা, আর অপূর্ব সংযম নিয়ে, এমনকী প্রেমের দৃশ্যও, মিষ্টির মিষ্টি, ন্যূনতম আঁচড়ে ফোটানো : যেন এক বাঙালি ছবি-করিয়ের জন্মই অপেক্ষা করে ছিল।

১৫ অক্টোবর, ২০০৬

৩ চি ত্য, ব উ - চি ত্ত

ওই, শিরশিরিয়ে বয়ে গেল ফিল্মোৎসবের এয়ার-কন্ডিশন, আবার অ্যালার্ম দে উঠে বদনে জ্বুন্তন ও নিতম্বে পুরীষ জোরে চেপ্তে কৃষ্টি ফলাতে ছোটো নন্দন। শুধু দেখে শান্তি নেই, বোকার মরণ লোকে জিগায়, 'কেমন লাগল'। সত্যি প্রতিক্রিয়া জানানো তো না-মুমকিন, কারণ 'আমার কেমন লাগল'-র চেয়ে অধিক জরুরি: মেজরিটি আঁতেলের কেমন লেগেছে। সে হুবহু অক্টেভে রা মেলাতে পারলে, তবে না খেলতে নেবে? হাফ-গেরস্ত ডেলিগেটের দল নিজ ইগো ও অশিক্ষা ব্যালেন্স করতঃ হাঁটছে ছুটছে চারানা দিয়ে বাথরুম করছে এবং আপন রসবোধকে স্বয়ং সম্মান না দিয়ে নাগাড়ে পণ্ডিত হাতড়াচ্ছে: সিন অধুনা সাঁ-পরিবর্তিত, আন্তর্জালের কল্যাণে। এবে নিয়ম সুস্মার্ট: কাল কোন কোন ছবি মারবে, লিস্ট করো। রাত্রে কম্পিউটার খোলো, এবং এস্তার গুগ্লেও। কোথা লাগে বং-বোদ্ধা! বিশ্বের তাবড় ক্রিটিক, মায় পরিচালক লিজে বাতেলা শিখাবেন। ছবি দেখতে ঢোকার লাইনেই ষষ্ঠ দৃশ্যের ভাবসম্প্রসারণ, পঞ্চদশ ডায়লগের ব্যবচ্ছেদ। 'দাদার কি দেখা?' ওই আর কী, ডিভিডি। গর্বে ফুলে ইতিউতি চাও। অ্যাডমিরেশন কুড়াও। এ দিকে নিজের তারিয়ে তারিয়ে ছবি-দেখাটি যে সমূলে ধ্বংস করলে, তোমার কুমারী মনে শিল্পটি তার সকল ভালমন্দ লয়ে সঘন বর্ষাবে, তুমি তার তিল-আঁচিল চেটেপুটে ভোগ করবে, শুধু তোমার জন্যই আবারও খুলে যাবে অই আলোকিত আয়তক্ষেত্র, আর তুমি সবটুকু শুষে বুকের ধন করে রাখবে/পথে ফেলবে ছিবড়ে আঁটির ন্যায় একমাত্র তোমারই বিচারে: রসগ্রহণের এই মূল শর্তটিতেই কুড়ল মেরে, দ্যাকো চলে কলকাতাইয়া ছবিলাভার। সে জানে, জানস্কো নয়, ইয়াঞ্চো। রেনে, রেসনাইস নয়। আর কী? উহাকে করুণা দাও।



ছি! এই গাড় সিজনে 'নতুন ডনে ডনডনাল' সংগীত যাচছেন? বরং যান মার্টিন স্করসিজ-এর 'ডিপার্টেড' সমীপে, যা অবিকল তাঁর ছবির মতোই। দুর্ধর্ষ সপ্রতিভ, অপূর্ব অভিনয় ভর্তি, দেখতে ভয়ানক ভাল লাগে, এবং বেরিয়ে দু'মিনিট বাদেই আর কিছুটা মনে থাকে না। তবে এ ছবি হল ডনx২। এখানে পুলিশ গুন্ডার দলে নিজেদের লোক তো ঢুকিয়ে দেয়ই, আবার সেই গুন্ডা পুলিশের দলে নিজের লোক ঢোকায়। ডবল-গিঁটু। এই স্পাই ওই স্পাইয়ের মধ্যে মূল আইসপাইস। আর কী অপ্রত্যাশিত গোলাগুলি! এমনি বসে আছি, একটুও প্রস্তুত নই, আচমকা দড়াম! ধাঁই! কী মরতে

মার্টিন হংকং-এর এক ছবির লম্বাটে রি-মেক করতে গেলেন, কে জানে। তবে সেমিনারবাবু হলে কিন্তু ধুমাধাড় প্রবন্ধ-স্কোপ। স্করসিজ-এর ছবির পর ছবিতে লিওনার্দো গ্যাংস্টারের অধীনস্থ চালা, সেই নির্মম গুন্ডাই তখন তার পালক-পিতা, পুত্রপ্রতিম ডি কাপ্রিও ফুটন্ত ঘৃণা নিয়ে মুখ বুজে তাবৎ হুকুম তামিল করেন, অস্তে টাইট দেন। আমরা অয়দিপাউসীয়-জটিলতার স্টেনসিলে পেন্সিল বুলিয়ে, একে পিতার প্রতি পুত্রের প্রবল আক্রোশ হিসেবে, খুন হওয়ার ভয়কে ক্যাস্ট্রেশন ফিয়ার বলে চালিয়ে, গুন্ডা বা তার প্রিয় চামচের সঙ্গিনীর প্রতি ছেলেটির লালসাকে মাতৃগমন-গৃঢ়েষণা বা অন্য ইংরিজি দিয়ে ঢেকে, দুশো পাতা নামাতে পারব না?



মেয়েদের জন্য নয়া আইন, হিংসাটিংসা থেকে তাদের রক্ষা করা হচ্ছে, ভাল। কিন্তু সঙ্গিনীকে মারা যাবে না, ধর্ষণ করা যাবে না, এর সঙ্গে জোড়া হল: জোর করে পর্নোগ্রাফি দেখানো যাবে না! কেন? বাচ্চাকে জোর করে জিওগ্রাফি পড়ানো যাবে আর বউকে জোর করে পর্নোগ্রাফি দেখানো যাবে না? পর্নোর চেয়ে আমূল সং, সুতরাং সুন্দর, কী আছে বিশ্বে? এই একটাই মানুষের পরম মুক্তির ক্ষেত্র। এই একটা জায়গাতেই 'পাপ' কথাটা অবধারিত বাতিল। অপরাধবোধ বেআইনি। জীবনের আর সর্বত্র সভ্যতার

রেলিং, ভব্যতার নাছোড় জ্যামিতি। নিজের ইচ্ছে কপ্ করে গিলে নেওয়ার ধরাকাট। শুধু এই একটি আশ্রম, যা মানুষকে বলে, আয়, কোনও ভয় নেই। না, এই সব ভাবিস বলে তুই নোংরা না, নিজেকে ঘেন্না করিস না, দ্যাখ, আরও কত লোক এ রকম ভাবে, এর চেয়েও অন্য, বেশি, সাংঘাতিক। নে। একদম খুলে দে তোকে। কেউ শাস্তি দেবে না। কোনও লজ্জা নেই, এখানে বেহায়া উন্মোচনেরই উৎসব। কোনও ঘেন্না নেই, এখানে কিছু কদাচার নয়। রাষ্ট্র তোকে যা ভাবতে শিখিয়েছে, ধর্ম তোকে যা ভাবতে



শিখিয়েছে, বাবা তোকে যা ভাবতে শিখিয়েছে, কিছু ইম্পট্যান্ট নয়। সব রীতি-নীতি-ভীতির বাইরে, সব কিছু থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে, যে জায়গাটায় তুই শুধু তুই, যে তুই বাথরুমে বসে অন্য রকম ভেবে শিহরিত হোস, সেই একেবারে একা, আদুড়, চামড়ার ভিতর উলঙ্গতর-র জন্য এ প্রাপ্তর। পর্নোগ্রাফি মায়ের আঁচলের চেয়েও দামি, জরুরি। মা-ও বিচার করেন। পাপী ছেলেকে লাস্ট সিনে গুলি করে মারেন। কিন্তু পর্নোগ্রাফি অনন্ত ও নিঃশর্ত প্রশয়প্রদায়ী। এ স্বাধীনতা আর কোথাও নেই। পর্নোর বিরুদ্ধে যে বলে, সে মানুষের চরম স্বাধীনতার বিরুদ্ধে বলে। জানি, আইনটা পর্নোর বিরুদ্ধে নয়। বলা হচ্ছে, কেউ ‘জোর করে’ কাউকে পর্নো দেখাতে পারবে না। ঠিক। জোর করে কাউকে কিছুই করানো উচিত না। অফিস বেরবার সময় বউকে ‘অ্যায়, গোরা-র আশি পাতা পড়ে রাখবি, আমি এসে ধরব’ বলাও উচিত না। ‘যাবে না মানে! আমাদের বাড়ির বউ ডোভার লেনে যাবে না!’ বলাও। আসলে, আলাদা করে পর্নোর উল্লেখে তার গায়ে ঘিনঘিনে ভিলেনের লেবেল আবারও সাঁটা হচ্ছে বলে বলা, জোর করে যদি কিছু করানো ঠিক হয়, তা পর্নো দেখানো। জীবনের অন্যতম সেরা আনন্দ থেকে স্বেচ্ছায় বঞ্চিত থাকার মৌলিক অধিকার নিশ্চয়ই প্রত্যেকের আছে, কিন্তু এক বার অন্তত ‘করে দ্যাখ না’ বলাটা হিতৈষীর উচিত। বিশেষত তার যদি দাম্পত্য মসলা সংগ্রহের সদিচ্ছা থাকে। কত লোক তো আছে, আড়ষ্ট, গবা, পারভার্ট-শুচি। দেখব না, কারণ দেখা অনুচিত। এক বার অন্তত উচিত্যর চেয়ে বউ-চিত্তকে প্রাধান্য দে মা। অন্যের ক্ষতি না করে নিজ আঁশটে লালসা চরিতার্থ করায় অপরাধ কোথায়? হ্যাঁ, পর্নোর বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগাবলি। তার মধ্যে ‘এতে মেয়েদের অপমান’ তর্ক বহু বছর চলছে, থো-পর্ন ফেমিনিজমও আছে, সে বলে বাকস্বাধীনতার পক্ষে থাকলে পর্নোর পক্ষে থাকতেই হবে, আজ অন্তত এটুকু প্রকাশ থাক যে নেট খুললে পুরুষদেরও নারীরা এস্তার চাবকাচ্ছে হামা দেওয়াচ্ছে শেকলে বাঁধছে। পুংশরীরকে তেড়ে ভোগ্য হিসেবে দেখানো হচ্ছে। অতএব পর্নোর বিরুদ্ধে আসলি প্রহার: এতে সব মানুষকে তার হৃদয় থেকে বিযুক্ত করে, শুধু ‘শরীর’ হিসেবে দেখা হয়। উত্তরে বলার, আঃ কী যে আরাম, অন্তত এই একটা ক্ষেত্রে মানুষটাকে শুধু দেহ হিসেবে দেখতে পারায়! এমনিতেই আদ্রেক সময় যৌনাঙ্গকে হৃদয় বলে ভুল করতে হয়। তার পর যদি একটা জায়গাও না থাকে, যেখানে শরীরকে শুধু ও শুধুমাত্র শরীর ভেবেই, আবেগব্যাগেজ দ্বিধাধাঁধা ছাড়াই ভোগ করা যায়, কাঁচা, গরগরে ভোগ, তা হলে বাঁচা অনেকটাই মলিন হয়ে যায় না কি? ভালবাসার মানুষের সঙ্গে বা ভালবাসা-উচিত মানুষের সঙ্গে আমাদের যৌনতা তো শুধু যৌনতা নয়, এক বস্তা ইমোশনের কুয়াশা। যথেষ্ট ভালবাসছি কি না, আঁা সঙ্গমকালীন অন্য লোকের কথা মনে পড়ল কেন, আহা বেশ জোশ উঠত ওকে চাটি স্কেলের বাড়ি মারতে পারলে ছি এ সব কী ভাবছি, এ বার গুড়িয়ে উঠি যাতে ও ভাবে আমার ভীষণ আরাম হচ্ছে। পর্নো হচ্ছে সেই স্বর্গ যেখানে কোনও দায় নেই। ভনিতা নেই। পার্টনারদের মন রাখার কথা মনে রাখতে হয় না। কারণ তাদের মন নেই। উফ, ক্লপকথা ব্যতীত কী! এ যে মানুষের (যে শেষ পর্যন্ত বাই ডেফিনিশন একা, অর্জি-অভিলাষী) কাছে কী প্রয়োজনীয়

রিলিজ! কুটকুটে দৈনন্দিনের পাঁজরায় কী পর্যাপ্ত লাথ! নিন্দুক বলে, পর্নো বাস্তবেও মানুষকে ওই চোখেই সহ-মানুষকে দেখতে শেখায়। বাজে তক্কো। পর্নো অবাধে চলতে দেওয়ার পর প্রচুর দেশে যৌন অপরাধের সংখ্যা বেশ কমে গেছে, এমন পেপার গুচ্ছের। ফ্যান্টাসি আর বাস্তবের ফারাক বোঝার ক্ষমতা লোকের আছে। নইলে মেট্রো স্টেশনের সুন্দরীটিকে নাহক ন'জন ছুটে জড়াত। পর্নো কিছু কম লোকে হামলে দেখছে না। তারা অনেকেই জীবনানন্দও বুঝছে। দুটোই চুটিয়ে ও ন্যূনতম অসততা ছাড়াই। ক্যাবারেতেও যাব, কথকেও, ধর্মে, জিরাফেও, এবং প্রতি ক্ষেত্রে মনকে তার ছাঁচে ঢেলে নেব, এ নমনীয়তা ও অভিযোজনক্ষমতা পরিণত মানুষের থাকবে না কেন? 'পিটুলিগোলা নিয়ে দারুণ আছি, দুধের কথা তুললেই পেটাব' চিল্লাবার মধ্যে গৌরব নেই, বাবুছোনা।

১২ নভেম্বর, ২০০৬

হা বি জা বি ম ন খা রা বি

পৃথিবীভর্তি কী আশ্চর্য উতরোল চলেছে, সৌরভ ভারতীয় টিমে ফিরতি চাল পাচ্ছেন, ঝলমল সার্কাস শহরে আসছে, 'ইউটিউব'-এ বাচ্চার হাসি থেকে শুরু করে বাচ্চার বাবার দাসী অবধি সমুদয় হোম-ভিডিও চাখা যাচ্ছে আরামসে, ফর্মে ফিরছেন রোনাল্ডিনহো, চিড়িয়াখানার জলহস্তীর বাঁ গালে গোলাপি ব্রণ টসটস করছে— ও দিকে আমাদের গ্রুপ-থিয়েটারগণ, যাঁদের কিনা এ সকল আগুনে-ঘনঘটার প্রতি সতত এক্সট্রা-সচেতন ও দায়িত্বশীল থাকা উচিত, এই গুরুত্বপূর্ণ থিমরাশি চুটিয়ে উদযাপন করে অ্যাকাডেমিতে উলুধ্বনি মচিয়ে দেওয়া উচিত, তাঁরা কী করছেন? হাবিজাবি উদ্ভট নাটক করে মানুষের ছ'মাইল হাই উৎপাদন করছেন, হলের দু'টো রো-ও ভরাতে পারছেন না, আর গ্রিনরুমে গিয়ে নিজ-পিঠ চাপড়াচ্ছেন। এমনই এক নাটক, যা আজকের প্রেক্ষিতে একেবারে, পুরোপুরি, সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক, অবাস্তব— নিয়ে হাজির হলেন 'পঞ্চম বৈদিক', যাকে বোকারা চিনি শাঁওলী মিত্রের গ্রুপ বলে। তাঁরা জর্জ অরওয়েলের 'অ্যানিম্যাল ফার্ম'-এর নাট্যরূপ দিয়েছেন: 'পশুখামার'।

আশ্চর্য লাগে, একটা ১৯৪৫ সালে প্রকাশিত বস্তাপচা গল্পকে খামখা নাট্যরূপ দেওয়ার মানে কী? রংচটা প্রাচীন ব্যানারবহন? আজ পশ্চিমবঙ্গে চারিদিকে আনন্দের বান ডেকে যাচ্ছে, প্রতিটি মানুষের জীবন আধুনিক থেকে আধুনিকতর হচ্ছে, মানুষের সামনে কোন নকশার হলুদ সোয়েটার কিনব এ ছাড়া কোনও সমস্যা নেই, সস্তায় ছোট গাড়ি কিনে মসৃণ বাইপাসে চালাব: মানবসমাজের এই পরমতম সাধ পূর্ণ হতে চলেছে, সেখানে শাঁওলীরা করছেন কিনা একটা বিষয়, গ্রাস্তারি, নাকে-কাঁদা নাটক? অবশ্য দোষটা মূলত অর্পিতা ঘোষ-এর। তিনি ইংরিজি নভেলাটিকে তাক থেকে ঝেড়েঝুড়ে নামিয়ে অনুবাদ করে, নাট্য-নির্দেশনা করে ফেলেছেন। একে তো এই জর্জসারের হাড়বজ্জাত। স্তালিনকে দু'চক্ষে দেখতে পারতেন না। গল্পোটি লিখেছিলেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়, সেখানে বিপ্লবকে, বিশেষত স্তালিনের অধীনে বিপ্লবের দশাকে, দেঁড়েমুশে কোপানো হয়েছিল। স্তালিন কবেই মরেছে গেছেন, আর বিপ্লব তো প্রবল সফল ভাবে ঘটেই গেল গত ক'দিনে, এখন এ সব আজগুবি নাটক করা মানে স্বীয় চিন্তার দেউলিয়াপনাকেই উদ্যোগ করা ছাড়া আর কী?

কাহিনি মোটামুটি এ রকম: একটা খামারে জন্তুরা বিপ্লব করে মানুষদের হটিয়ে দেয়, কারণ মানুষরা তাদের নিংড়ে খাটায়, অত্যাচার করে, খেতে দেয় না, এ দিকে তাদের শ্রমের ফল নিজেরা আত্মসাৎ করে সুখে থাকে। জন্তুরা স্বপ্ন দ্যাখে এক মানুষহীন পৃথিবীর, যেখানে শোষণ নেই, পীড়ন নেই, নিজের ফলানো ফসলে পশুদের নিজেদের অধিকার,

এবং যেখানে কোনও ছোট-বড় নেই। সব জন্তুই ভাই-ভাই। বিপ্লব জোরসে হয়, সবাই নাচে-গায়, ক'দিন খুব ভালই চলে, কিন্তু আস্তে আস্তে পশুদের মধ্যেও অবধারিত ভাবে তৈরি হয় এক ক্ষমতাসীন শ্রেণী। প্রভু-জন্তু। তারা বুলিটি রাখে ভাইব্রাদারির, কিন্তু অন্য জন্তুদের অত্যাচার করে, খেতে দেয় না, হৃদ খাটায়, তাদের শ্রমের ফসল আত্মসাৎ করে। এবং সবচেয়ে সাংঘাতিক: এই নেতা-জন্তুরা শুরু করে মানুষের সঙ্গে বেচাকেনা। সেই মানুষ, যারা কিনা শ্রেণিশত্রু! যাদের বিরুদ্ধে কিনা উত্তাল বিপ্লব! যে মানুষদের মারের বিরুদ্ধে, নীতির বিরুদ্ধে লাগাতার খুনঝরা লড়াই, বহু পশুর আত্মত্যাগ, যে অন্যায়ভর্তি মানুষ-বাদের বিপরীতে যাওয়ার জন্যই এই মহান পশু-বাদ, সেই মানুষধর্মকেই হলায়গলায় লাল-ঝরা চুমু সাঁটিয়ে, নিজেদেরই আগে-বলা কথাগুলোকে বেঁকিয়ে-চুরিয়ে ওপরচালাকি দিয়ে ঢেকে অন্য চেহারা দিয়ে, ধুমাধাড় লেনদেন শুরু হয়। এক সময় এও অর্ডার জারি হয়, মানুষের কাছে বেচে দেওয়া হবে মুরগিদের ডিম।

কী! কী বেচে দেওয়া হবে? তাদের চির-কমরেড যে পাখি; সখা, দোসর, সহ-পাখি যে পাখি; তাদের ডিম। যে পাখির কথা গাইতে গিয়ে পশুসংগীতে কলজে উথলে ওঠে, যে পাখি কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ঠোট থেঁতিয়ে নখ খুবরে এনেছে এই বিপ্লব, যে পাখি তার স্বপ্নের ভোর আনার বকলমা সমর্পণ করেছে তাদের কাছে, সেই পাখির ডিম আজ বেচে দেওয়া হবে। কিন্তু এ তো স্বজনহত্যা! তুমি তোমার বিপ্লবের সঙ্গীর না-ফোটা ছানাকে খুন করছ! তোমার সংগ্রামের বন্ধুর সর্বসম্বল বিকিয়ে দিচ্ছ? ঘোষণা হয়: এইগুলো, এই আত্মত্যাগগুলো, এই পশু-বিধির আপাত বৈপরীত্যগুলো নাকি উন্নতির জন্য জরুরি। যারা বোকা, বুঝছে না, পরে এতে দুর্দান্ত লাভ হবে। কিন্তু বোকারা তো থাকবেই চিরকাল। মুরগিরা চেষ্টায়, জান কবুল আর মান কবুল, আমাদের রক্ত-রস দিয়ে বোনা সৃষ্টি অন্যের হাতে তুলে দেব না। কিছু অন্য জন্তুও তাদের সাপোর্টে গলা মেলায়। তাদের কথা পরে হচ্ছে, শালা বহিরাগতর দল, শাস্তি হিসেবে মুরগিদের সমস্ত দানা বন্ধ করে দেওয়া হয়। ধীরে ধীরে, খেতে না পেয়ে, দুবলা দুর্বল হয়ে, তারা ঘাড় গুঁজড়ে আপোস করে। দয়া করো কমরেড, যা কাড়ার ছেঁচড়ে হিঁচড়ে মুচড়ে নাও, প্রাণে মেরো না।

কয়েকটা পশু অবশ্য নিতান্তই ঠ্যাটা ঘাউড়া জানোয়ার, তারা ক'দিন গুজগুজ ফুসফুস করে 'কই আমাদের নিজেদের স্বপ্নজমানায় তো এ রকমটা হওয়ার কথা ছিল না' মহা ত্যাভাইম্যাভাই জুড়ে দেয়। অ্যাকশন নেওয়া হয় তুরন্ত। পোষা মস্তান-কুকুর দিয়ে মুহূর্তে তাদের টুটি কামড়ে দুমড়ে ছিঁড়ে ফেলা হয়, হ্যাঁ, প্রকাশ্যেই, কিচ্ছুর পরোয়া না করেই, যাতে অন্যদের হাড়হিম-ভয়ে হুৎপিগু পেটে সঁধিয়ে যায়, এবং এও বুঝিয়ে দেওয়া যায় পট্টাপট্টি: ভবিষ্যতে যেন কেউ কোনও সংঘাত, চ্যালেঞ্জ, বিতর্ক-টিতর্কর মধ্যে যাওয়ার চেষ্টা না করে। লিডারের বিরুদ্ধে যেন কোনও স্লোগান না ওঠে। দাঁতালো ডালকুত্তা রেডি।

মোদা কথা, মানুষদের ঠিক যে যে জিনিসগুলোকে ওয়াক-ঘেন্না করে বিপ্লব শুরু হয়েছিল, সেই লাথিয়ে কেড়ে

নেওয়া, সেই চাবুক-সংস্কৃতি, সেই ভুলভাল বুঝিয়ে তথ্য গোপন করে সাধারণ পশুদের আরও আরও সর্বহারা করে দেওয়া, সেই পেটোয়া ভেড়ার দল দিয়ে নাগাড়ে মিথ্যে মন্তর চিল্লিয়ে হাবলা প্রাণীদের মগজ ঘুলিয়ে দেওয়া, সেই নিজের কাজ উশুল করে নিয়ে কমরেডকে অনায়াসে কসাইয়ের কাছে বেচে দেওয়া, সেই 'আমি সর্বশক্তিমান, অতএব ঘাহা করিব তাহাই সত্য' রক্তচক্ষু রোয়াব— হুবহু কাণ্ডগুলোই আবার ফিরে আসে, হয়তো আরও বেশি ধারালো হয়ে, আরও সাঁড়াশিবাচক।

পশুরা স্তব্ধ হয়ে ভাবে, এক দিন এরাই কি একেবারে উন্টো কথাগুলো বলে আমাদের এই মানুষদেরই বিরুদ্ধে আন্দোলনে शामिल করেছিল? আমাদের প্রিয়জনদের, সন্তানদের কি আমরা এই আদর্শের জন্যই বলি দিয়েছিলাম? ভাবে, কিন্তু বলতে পারে না, থতিয়ে, সিঁটিয়ে ওঠে। দূর থেকে তারা দ্যাখে, আর রাখঢাক নেই, নেতা-জন্তুরা মস্তিভরে মানুষেরই এক গেলাসের ইয়ার, যে মানুষকে এই মাটি থেকে এক দিন দাপিয়ে তাড়ানো হয়েছিল, সেই মানুষরাই আজ তাদের খামার পরিদর্শনে আসে, পিঠ চাপড়ে দেয়। প্রজা-পশুরা অন্ধকার খোঁয়াড়ে ঠাণ্ডায়, খিদেয়, ভয়ে মরতে মরতে চোখ রগড়ায়, স্বৈরাচার আর সাম্যবাদের মুখগুলো কেমন মিলেজুলে ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে না?

আচ্ছা, এ নাটক এখন করার মানে কী? কথাবলা-পশুটপু দেওয়া একটা উদ্ভট রূপকথা ধাঁ করে স্টেজ করে দিলেই হয়ে গেল? পঞ্চম বৈদিক এমন কোনও কমিউনিস্ট-শাসিত রাজ্য দেখাতে পারবে, যেখানে সরকার শিল্পপতির তাঁবেদারি করতে গিয়ে সাধারণ মানুষের পেটে লাথি মেরেছে? সারা জীবন 'পুঁজিবাদ নিপাত যাক' বলে চাঁচিয়ে লাখ লাখ মানুষকে উজিয়ে সেই শ্লোগানে ভর করে ক্ষমতায় এসে তার পর এক দিন পুঁজিবাদের নির্লজ্জ দালাল হয়ে সাধারণ লোকের জিভ খেঁতলে খুলি গুঁড়িয়ে ভুবনমোহন হেসেছে? একটি ঘটনাও দেখাতে পারবে, যেখানে বামপন্থী সরকার পোষা পুলিশ দিয়ে কৃষক-মজদুর-সংগ্রামসার্থীদের পেটাতে পেটাতে মাটিতে বিছিয়ে পাঁজরা ফাটিয়ে দুরমুশ করেছে?

এমনিতেই অবাস্তব উদ্ভট, তার ওপর আবার 'মানবাধিকার দিবস'-এ এই নাটকটা করায় সিরিয়াস দর্শকের মেজাজ তীব্র খিঁচড়ে যায়। কবে যে এরা অকথ্য আঁতলেমি ছেড়ে প্রকৃত পংবঙ্গীয় নাটক শিখবে!

১৭ ডিসেম্বর, ২০০৬

প্লুটো জগন্নাথ

ধুম-টু লেগেছে হৃৎকমলে। ২০০৬-এর সেরা শব্দ নির্বাচিত হয়েছে 'Plutoed', অর্থাৎ 'বামনায়িত'। কাউকে তার অবস্থান থেকে হড়াৎ করে নীচে নামিয়ে দেওয়া=প্লুটো করা। এ বার 'শালা সান্যাল প্রোমোশন পেল আর আমায় প্লুটো করে দিল?' কিংবা 'চ্যাপেলটা গবা। আরে সহবাগকে প্লুটো কর!' রণিত হবে বাসে-ট্রামে। গত বছর জলতলে শুটিং করতে গিয়ে মারা গেছিলেন স্টিভ আরউইন (বং-সংজ্ঞা: 'ওই যে কুমির নিয়ে যা ইচ্ছে করত যে অ্যানিম্যাল প্ল্যানেটের লোকটা'), তাঁর আট বছরের মেয়ে বিন্দি আজ মেগা-সেলিব্রিটি। বাবার শোকসভায় তার বক্তৃতা অস্ট্রেলিয়ার 'টিভি মোমেন্ট অব দ্য ইয়ার' নির্বাচিত। এখন নিজস্ব অনুষ্ঠান 'বিন্দি: দ্য জাঙ্গল গার্ল' তৈরি, প্রচারের আগে সে ওয়াশিংটনে ন্যাশনাল প্রেস ক্লাবে বক্তৃতা দেবে বিখ্যাত টক শো-তে যাবে পেগ্গায় ডিনার খাবে রাসেল ক্রো, নায়োমি ওয়াট্‌স, রুপার্ট মারডক-এর সঙ্গে। পাবলিকের সিমপ্যাথি-তরঙ্গ রোধার সাধ্য শিবের বাপের নেই, কিন্তু তা চড়ে 'ডুব ডুব ডুব ডলারসাগরে' প্রকল্প ও ছোট্ট মেয়ের শৈশবকে যত্ন করে টুটি মুচড়ে মারা হয়তো ঠিকঠাক না। নোবেলজয়ী নাট্যকার দারিও ফো এ বার মিলানের ফ্যাশন র‍্যাম্পে হাঁটবেন। 'রোমিও গিগলি' ব্র্যান্ডের নয়া পুরুষ-পোশাক-ঘনঘটা পেশ করবেন, তাঁকে ঘিরে থাকবে রেনেসাঁ-যুগের খানকয় চিত্র। গত বছর মিলানের মেয়র হওয়ার জন্য লড়েছিলেন, হেরে গেছেন, এ বার মনে হয়েছে টপ বুদ্ধিজীবীর একটু জামাকাপড়সর্বস্ব স্টেডিয়ামে নামা দরকার। নোবেল পেয়েছেন বলে আশি বছরেও ভীমরতি হবে না সে দিব্যি অবশ্য কেউ দেয়নি। ওরহান পামুক এক রোববারের জন্য 'র‍্যাডিক্যাল' দৈনিক কাগজের অতিথি-সম্পাদক হয়ে প্রথম পাতা জুড়ে তুললেন শিল্পীর স্বাধীনতার দাবি। বললেন, তুরস্কের প্রশাসন এবং সংবাদপত্র মিলেজুলে বাকস্বাধীনতাকে খুন করছে। উদ্ধৃত করলেন ১৯৫১-র এক কাগজ-নিবন্ধের অংশ, যেটির সঙ্গে নাজিম হিকমত-এর ছবি ছেপে লেখা ছিল 'সবাই একে চিনে নিন, দেখলেই মুখে থুতু দিন'। পামুক লিখলেন, এই বাক্যটিই এ দেশে শিল্পীদের প্রতি কর্তৃপক্ষ-মনোভাবের সারাংশ, এখনও। খবর দেওয়া হয়নি, সরি, গত বছরেই অ্যালান লাজার, ড্যান কার্লান, জেরেমি স্নেটার বের করেছেন বই: '101 মোস্ট ইনফ্লুয়েন্শিয়াল পার্সনস ই নেভার লিভ্ড' (১০১টি সবচেয়ে প্রভাবশালী কাল্পনিক চরিত্র)। প্রথম হলেন 'মার্লবোরো ম্যান', মার্লবোরো সিগারেটের বিজ্ঞাপনের মাচো পুরুষ-ধারণাটি, যাঁকে লেখকরা বলছেন '২০০ বছরের সবচেয়ে বিখ্যাত খুনি', দ্বিতীয় জর্জ অরওয়েলের 'বিগ ব্রাদার', সান্তা ক্লজ চতুর্থ, মিকি মাউস ১৮নং, বার্বি ৪৩। আমাদের বোধহয় বাঁটুল দি গ্রেট আর বুলাদির মধ্যে লড়াই। কম্পিউটারের সবচেয়ে জনপ্রিয় নিলাম-সাইট 'ই-বে'তে নিলাম হল ব্রিটনি স্পিয়ার্সের চিবিয়ে ছিবড়ে করে ফেলে দেওয়া

চিউয়িং-গাম, টম ক্রুজ ও কেটি হোমস-এর বাচ্চা 'সুরি'র প্রথম 'সলিড'-বিষ্ঠার ব্রোঞ্জ প্রতিরূপ। আইকন-নিষ্ঠা থেকে 'লং লিভ বিষ্ঠা' স্প্রিন্ট টেনে এ কী লীলে দেখালি রে, ওগো মোর ওয়াকময়!

একটি নামী কোম্পানির নারী-জিন্সের বিজ্ঞাপনে বেশ কিছু নগ্ন পুরুষ মর্মরমূর্তি-মার্কাসেজে ঘাড়মোড় গুঁজড়ে শুয়ে বসে হামা দিয়ে মাটিচাটা হয়ে ক্রীতদাস-পোজে, আর তাদের কাঁধে পিঠে গদানে নিতম্বে দাপিয়ে চড়ে এলিয়ে পা দোলাচ্ছেন সুস্মিতা সেন। পাশে স্লোগান: 'রুল'! অর্থাৎ, শাসন করুন, দাবড়ে রাখুন, আধিপত্য বিস্তার করুন। লোকগুলিকে আসবাবের মতন ব্যবহারের নির্বিকার ধরন এবং তাদের যে ভঙ্গিমাগুলিতে আনত বিন্যস্ত স্তূপীকৃত করা হয়েছে, প্রায় আক্ষরিক ভাবে আবু ঘাইব-এর কথা মনে করিয়ে দেয়। পুং-সত্তাকে প্রশ্নাতীত ভাবে মাড়িয়ে দেওয়ার বিস্তীর্ণ উল্লাসও দিব্যি বিরাজে। পুলক জাগে ভাবতে, এই অ্যাড উল্টো করে যদি একটি ছেলে-জিন্স বেচা হত! খানপাঁচ স্বাস্থ্যবতীকে নগ্ন করে মার্বেল-সুরত দিয়ে, হাঁটু গেড়ে বসিয়ে, হামা দিইয়ে, কোল পাতিয়ে, তাদের গায়ের ওপর অভিষেক বচন গাঁতিয়ে চড়ে মহা-আয়েসে দাঁত খুঁটতেন! আহা রে, কত ফেমিনিস্টের ছ'মাস চলে যেত বাইলাইন লিখে, কোব্তে ছাপিয়ে, সেমিনার করে, দোকানের কাচ রুন্ঠন ভেঙে, সর্বোপরি মই নিয়ে হুই উঁচা উঁচা হোর্ডিঙে উঠে ডিঙি মেরে আলকাতরার পোঁচ বোলাবার সার্কাসোচিত কেরদানিতে! বিজ্ঞাম্যান, প্লিজ, পাঞ্চ করুন না মিনসে ও জিন্সে। চপচপ কেচ্ছা চাখা যায়।

আরুে ও সব কড়োরপতি-ফতি বাঁ দিকে রাখুন। সা
রে গা মা পা পায়ে। একটা ফাঁসি দেখাব, টি আর পি
ছাদ ফুঁড়ে স্পুটনিক। লাইভ হলে তো কথা নেই।
এক্ষুনি সাদ্দামকে কোন খেউড় মারা উচিত? এস এম
এস পাঠান। বিজয়ী খিস্তিটি জল্লাদ দেবে। মাঝখানে
নাটাবাবুর ইন্টারভিউ: ঠিক কী প্রসেসে নট-টা বাঁধছে
এখন, আপনি হলে কী ভাবে, আচ্ছা দড়ি কি ঠিক
বাছা হয়েছে? পিচ-রিপোর্ট থেকে ম্যান অব দ্য ম্যাচ।
উফ, আজু কী ইউফোরিয়া, চরম স্বাধীনতার আমলকি
মিডিয়ার

মার্লবোরো ম্যান : স্মার্ট খুনি



করতলে লোপা-ক্যাচায়িত। রাষ্ট্রীয় হত্যা সাড়ম্বরে টেলিকাস্ট দফায় দফায়! ‘ঘাড় খেঁতলে রক্ত ভেপসে যাওয়ার পর কী ঘটল? জানতে হলে দেখুন ২য় এপিসোড!’ সিরিয়াল দিব্যি পরিকল্পিত (নইলে অমন হাই-সিকিয়ারিটি জায়গায় মোবাইল নিয়ে ঢোকা অসম্ভব), এবং এ গতিকের পূর্বাভাস বহুদিন হতে টুকি দিচ্ছে। সদ্য ছেলেহারা বাপের হাউহাউ কান্নায় লেন্স পিছলে ইন্টারভিউ, এমনকী পরিবারের সকলকে কিচ্ছু না বলে জড়ো করে ক্যামেরা চালিয়ে সহসা স্বজনবিয়োগের টাটকা খবর প্রদান, যাতে তাঁদের দড়াম আঘাতটা লাগে একেবারে ‘অন ক্যামেরা’। গর্তে পড়া অসহায় বাচ্চার হাল-অবস্থা থেকে পার্টিতে মেয়ে-স্টারকে অসভ্য ছেলে-স্টারের জোর করে সাপটে চুমু, সবই আমাদের আচারের শিশি। ‘দিস ডুকরে ওঠা স্পনসর্ড বাই তমুক আইড্রপ, জীবনের নানা কাঁদাকাটা যেন চোখে না লাগে’ চালু হয়নি এখনও, সে আর ক’মাস? সন্কে সাড়ে ছটায় দেখুন সদ্যবিধবার সিঁদুর মোছা ও শাঁখা ভাঙা। সাতটা থেকে ব্রণওলা কিশোরের স্বমেহন (ঘুলঘুলি থেকে লুকিয়ে তোলা)। সাড়ে সাতটায় লোফারের দল চড় মারবে ষাট বছরের বৃদ্ধকে (কোন পাড়ায় বলব না, সারপ্রাইজ-ট্রুপ পাঠাব), আটটায় আপনাদের সবার প্রিয় ‘লাইভ-ধর্ষণ’, এ সপ্তাহের কোমল হতভাগিনীর স্ট্যাট ৩৬-২২-৩৮। সিধে কথা, ক্যামেরা ছোট, সাউন্ডও রেকর্ড হচ্ছে, এ বার চান করে বেরবার সময় নিজ পরিবার হতেও সাবধান। ‘শুধু তা-ই পবিত্র যা ব্যক্তিগত’ মুচড়ে বাতিল। নিজ গামছা নিজে সামলাও। নয় কেন? আর্ট তো বাওয়া হয়ে হয়ে পচে গেল। বাস্তব এ বার প্রতিশোধ নিচ্ছে। পাবলিক ট্রুথ চাটছে ল্যা ল্যা। সাজানো অভিনেতার যৌনতা দেখবেন না হোটেলে হনিমুনারের অচেতনে তোলা সাচ্চা কাঁচা সঙ্গম? শিল্পা শেঠি সব বুঝে শুনে চব্বিশ ঘণ্টা নিজেকে মেলে দিচ্ছেন দরকারি টু তরকারি, ‘ইউ-টিউব’ সাইটে সড়াৎ বস্ত্রমোচন ঘটছে শামিল প্রেমিকার— আলাদা। কিন্তু সন্মতি ছাড়া? অনবধানে? কোনও মানুষের সন্মতি-ব্যতিরেকে কিচ্ছুই কি প্রকাশ্যে দেখানো যায়, যা তাকে বিনাদোষে বিপর্যস্ত করতে পারে? এমনকী, যে নিরীহ লোকটা অফিস যাচ্ছিল বা সেলুনে চুল কাটতে এসেছিল, তাকে প্রকাণ্ড অপদস্থ করে ‘বকরা’ বানিয়ে তা গোটা জাতির সামনে বার বার হাসির খোরাক হিসেবে চালানো যায়? মৌলিক অধিকাররা বেড়াতে গেল তবে। এবং তাবৎ সমঝদারি, নরমতা। উডি অ্যালেন অবশ্য সেই ১৯৭১-এই ‘ব্যানানাজ’ তুলেছেন, যেখানে প্রথমেই দেখানো হয় এক রাষ্ট্রনায়ককে হত্যার লাইভ টেলিকাস্ট। ক্যামেরা-ট্যামেরা বসিয়ে নানা অ্যাঙ্গলে খুনটি তোলা হয়, গুলি লাগার পর ঢলে পড়া নেতাকে জিজ্ঞেসও করা হয়, ‘কেমন লাগছে?’ ছবির শেষ দিকে নায়কের থরোথরো ফুলশয্যার লাইভ টেলিকাস্ট। সঙ্গে কমেড্টি। এ বার উনি অমুক খুলছেন, তার পর করছেন তমুক, হতে পারবেন ফাট্টাফাটি কামুক? শেষে যখন ক্ষান্তি, পোঁ-দৌড়ে অ্যাংকর ও ক্যামেরা একেবারে ঘাড়ের ওপর, ‘বউদি, কেমন লাগল?’ হায় উডি, ভেবেছিলে উদ্দাম বাড়িয়ে-চাড়িয়ে, অ্যাবসার্ড উদ্ভুটে কাণ্ড ভেবেচিন্তে দুর্দান্ত ডার্ক হিউমার রচছ, দেখা গেল উঁহ, জিনিয়াস কমেডিকার নহে, তুমি স্রেফ নস্ত্রাদামুস বটে। বাস্তব তোমায় পুরো প্লটো করে দিল বস?

১৪ জানুয়ারি, ২০০৭

গু ভা গা জে ন

বাঙালি তো সোজা কথা না বাপ, পেট থেকে পড়েই সংস্কৃতিবাজ। চৌমাথায় প্যান্টালুন খুলে নাও, মিনমিনিয়ে মিলিয়ে যাবে, কিন্তু কলচরের জায়গাটায় ঝাড় দিয়েছ তো খবরদার, একেবারে ন্যাটজিও-র ডলবি-হালুম বাঘ। বই পড়তে দেবে না মানে? অ্যা? বই পড়তে দিবনে কী রে হতভাগা? বাপ তুলবি মা তুলবি ঠিক আছে, বইমেলা তুললি কী বলে? কী সব দুষণ-ফুসন হয়ে চাড্ডি বুড়ো হাবড়া আর মরকুটে বাচ্চা হাপর টেনে মরবে, তাই হায়ার থট-কে অপমান! বলে নাকি বেঁচে থাকা বই পড়ার চেয়ে জরুরি! আরে ও বাঁচাকে আমরা খুতু দিই রে। যে বাঙালি বই না পড়ে বাঁচে, তাকে আমরা জনি লিভার বলি। কোনও বাঙালি দেখেছিস, চব্বিশ ঘণ্টা গ্যাদাড়ে মেগাসিরিয়াল গিলছে? মোবাইল-মেসেজের বাইরে এক অক্ষরও পড়ছে না? সম্পাদকীয় নিবন্ধ ছেড়ে শব্দসন্ধানের দিকে ঝুঁকে পড়েছে? চিঃ! মনে রাখিস, প্রত্যেকে, ইচ অ্যান্ড এভরি, রবিদাদুর কোলে বসে মুখেভাত খেয়েছি রে, তবে এই জাত এতটি বড় হতে পেরেছে। এ সব কী নেকু কাঁদুনি, হাওয়ায় বিষ নিয়ে আদিখ্যেতা? পরের প্রজন্ম বাঁচবে কি মরবে তাই নিয়ে তোর এত প্যাখনা কেন? মরুক না শালারা গ্যাঁজলা উঠে শির টাটিয়ে শ্বাস চাইতে চাইতে, আমরা তো আমাদের ঘটমান বর্তমানটা ফুঁ দিয়ে ফাঁপিয়ে নেব, না কি? কৃষ্টিসব্বশ্ব বাঙালি ডাইভ দিয়ে পদ্য লিখছে, প্যাঁচ কষে গদ্য লিখছে, পি এফ ভেঙে লিটল ম্যাগ বার করছে, চালে নাম লেখা প্র্যাকটিস যাচ্ছে, এক্সট্রা ফিশফ্রাই ভেজে রাখছে, ব্যাংক অ্যাকাউন্টের ফর্ম ছাপাচ্ছে, সমস্ত এই একটি পাকবনের পানে তাকিয়ে, আর তোরা বেরসিকের খাড়ি এসে আর্টে গোচোনা ঢেলে দিলি? আর্ট! আমাদের দেবতা, সবেধন গব্ব-আইটেম! সর্বত্র ঝাড় খেয়ে ফোঁপাবার একমাত্র সান্ত্বনা-সোফা! তার চেয়ে জীবন বড়! আরে এ ছারের জিন্দেগি তিন চাঁটে স্যাক্রিফাইস করব, অ্যাঞ্জেলিনা জোলি ছেড়ে আমরা গীতাঞ্জলি-র দিকে তাকিয়ে লাল ফেলি রে শুয়ার। কী হবে, নাহয় বাঁচবে লোকে নীল হয়ে কাশতে কাশতে মুখে রক্তগয়ের তুলে, বাচ্চারা জন্ম থেকে কুঁতিয়ে কুঁতিয়ে ইনহেলার নেবে, কিছু শুড্ডা মুখ ভেটকে টাঁসবে বচ্ছর না ঘুরতে, ক্ষতি কী? তুরীয় প্লেজার পেতে হলে এটুকু সাফার করবিনে? সুহানা সাফার হ্যায় ইয়ে। কী বললি? এত যদি বইমেলা-প্যাশন তো সন্ট লেক যাচ্ছি না কেন? মানে? উজিয়ে বাইপাস অবধি চলে যাব? উরিব্বাস, ওই অষ্টাশি ক্রোশ পেরিয়ে? সারা দিন খাটনির শেষে টায়ার্ড লাগে না? আর ফেরার বাস না পেলে কি তুই ঘাড়ে করে পৌছে দিয়ে যাবি? তা ছাড়া ওখানে নাকি মোগলাই-ফোগলাই পাওয়া শক্ত? সুনসান রাস্তায় টিমটিমে চা আর লেড়ে বিস্কুট? তবে কোন সাহসে বললি রে পাজির পাঝাড়া? সংস্কৃতি ভাল, যত ক্ষণ তা হাতের নাগালে থাকে, মেট্রোর পাশে হয়,

ফট গিয়ে থ্রন পকোড়া সাঁটিয়ে ঝট বেরিয়ে আনন্দবাজারের নিন্দে আর কমলকুমারের প্রশংসা করে অলিপাবে ঢুকে পড়া যায়। আবার অন্ত কী? খাবি না কানের গোড়ায়! বাতাসে উটকো গন্ধ বেরোল, সংস্কৃতিকে বলি দিয়ে নাচছে! যন্তু আলফাল। কবে পাগলাগুলো বলবে আলিপুর্নে এসি চালাবেন না, ওতে কী সব গ্যাস বেরিয়ে সেই সাউথ পোলার বরফ গলিয়ে দেবে, আর হড়হড়িয়ে জল এসে আমাদের মোবাইল অবধি ভেসে চুষুড়। হ্যাঁ, শুনে আমরা স্বেচ্ছায় যেমেনেয়ে খাবি খাই, আর চাঁদিফাটা গরমে টানাপাখা দিয়ে হাওয়া করে যাবে তোমার বাবা! শোন বস, সস্তায় নাম কিনতে চাইলে সংসার্জেশন: গড়িয়াহাট থেকে ট্রাফিক তুলে দেওয়ার আন্দোলন কর, বালিগঞ্জ অবধি আগাছা পোঁত। তখন আমরাই তাদের বৃক্ষফ্যাচাং ক্যাম্পেনের শার্প, সিওর-হিট ছড়া লিখে দেব: ‘আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু/ উদ্ভিদকে বলেছিলেন পশু!’



‘পারজানিয়া’-কে হুমকি দিয়ে গুজরাতে বন্ধ করে দেওয়া হল। উলঙ্গ ইতরামির রাজ চলেছে আর কী। শিল্প তো ফুটবলের ভাই, যে পারবি লাথিয়ে নে। বজরং দল-এর ‘বাপু বজরঙ্গী’ ফোন করে জানাল, সে ছবিটা দেখবে, তাপ্পর যদি তার মনে ধরে, তবেই গুজরাতের মানুষ দেখতে পাবেন। নচেৎ, ব্যান। বাঃ। এ বার তা হলে ক ক্লাব থ ক্ষেত্র গ গোয়াল ঘ ঘোঁট থেকে থোকা থোকা সেন্সরজেরু সমাজকাকু হেলান দিয়ে হলদে রুচি খুঁটতে খুঁটতে ‘আবে এই!’ গাঁতিয়ে কৈফিয়ত তলব করবে আর শিল্পী অমনি ঠকঠকিয়ে সাষ্টাং হয়ে তাদের থাবা চাটবেন। পরিচালক বলেছেন, সেন্সর বোর্ড ছাড়পত্র দিয়েছে, তবে কে বাপু বজরঙ্গী, যে তার অনুমোদন চেয়ে হাত কচলাতে হবে? মান্টিপ্লেক্স অ্যাসোসিয়েশন এ সব যুক্তিতর্কের ধার মাড়ায়নি, ‘ব্রাহ্মি ব্রাহ্মি’ রবে ছবির ঝাঁপ নামিয়ে দিয়েছে। আবার পুলিশ নাকি বলেছে হলের প্রোটেকশন দেবে। হাঃ। পুলিশ কার, শিল্পমোদীর না নরেন্দ্র মোদীর? পারজানিয়া-তেই দেখানো হয়েছে, মানুষকে টানতে টানতে এনে পেট্রল ঢেলে গায়ে আগুন লাগাচ্ছে, আর পুলিশ দূরে বসে হাসছে। সুতরাং তুমিই জিতেগা ভাই জিতেগা হে গুডাগার্জেন, তুমি হাজার হাজার লোক নিয়ে মুসলিমপট্রিতে চড়াও হয়ে টুটি ধরে শিশু বৃদ্ধ যুবা যুবি তরোয়ালে কোপাবে লাঠিতে খুলি ভাঙবে ঘরে শেকল তুলে জ্যান্ত পোড়াবে মেয়েদের নাগাড়ে ধর্ষণ করবে যৌনাস্ত্রে ফচকেমি করে তরোয়াল ঢুকিয়ে দেবে পোঁচ দিয়ে স্তন কেটে ক্যাচ-ক্যাচ খেলবে— আর এ নিয়ে ফিল্ম করলে তোমার কাছেই সার্টিফিকেট চেয়ে হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। বাহবা। হে ঠ্যাঙাড়ে, শিল্পের থাবড়া তো খাওনি! খাবে কী করে, বোকাখাবড়া দেশ, ন্যাকাচৈতন আর্ট চলেছে মুখে দই তুলতে তুলতে, নায়িকার বিয়ে হবে কি না ভেবে ডুকরে উঠছে লাস্ট রো অবধি। আর ছদ্মস্মার্ট হলিউডপোঁছা থ্রিলার চলেছে পিছু পিছু। তাই সিনেমাকে ভেবেছ নিতান্ত পিকনিকপ্রতিভা, বেশি বেঁড়েমো বুঝলে সহ-মস্তান মোবাইলাইজ করে বেধড়কা রদা দেখালেই চুপ। অতএব যে সম্প্রদায়

পথে হাগবে, সে-ই ফের ফ্যাগও রাঙাবে। হিন্দুদের বজ্জাতি নিয়ে ছবি করলে হিন্দু মৌলবাদী সংগঠন হুমকি ঝাড়বে, মুসলিমদের বজ্জাতি নিয়ে ছবি করলে মুসলিম মৌলবাদী সংগঠন ফতোয়া ছাড়বে। সেটাই মূল হরর, এই পারজানিয়া কোনও মুসলিম-সৃষ্ট দাঙ্গার বিরুদ্ধে ছবি হলে কিছু অন্যথা হত না। বাপু বজরঙ্গীর বদলে পাপু মৌলবি ফোন করে অশিক্ষিত ঔদ্ধত্য ফলাত, এই যা। আর সবার ওপরে সর্বাধিক বিশাল সম্প্রদায় তো আছেই: নির্বোধ। সেন্সর বোর্ডেও তার আধিপত্য কিছু কম না। ফলে তীব্র ছবি তদ্দিন অবধি ব্যান থাকবে, যদিও না তার গায়ে মরচে ধরছে, পাবলিকের স্মৃতি থতিয়ে আসছে। যাতে সপাট ছোবলটা (যেটা কিনা ছবিটা বানাবার একমাত্র উদ্দেশ্য) মিইয়ে ত্যালত্যাল করতে থাকে। সব মিলিয়ে, শিল্পীর সার্কুলার সহজ: সেফ খ্যাল, নয়তো পেছনে লাথ খা। এ কথাও তেড়ে স্মর্তব্য, আমাদের বাংলা এই ধামটামোর ম্যাপে জ্বলজ্বলিয়ে স্থিত। হেথা যা ফটরফটর, শ্রেফ ‘সেফ টার্গেট’ আক্রমণের মাজাকি। এ রাজ্যে থেকে বিজেপি-কে ধুইয়ে দেওয়ার চেয়ে নিরাপদ মহত্ব আর কী? গুজরাতের দাঙ্গার বিরুদ্ধে যে হুমোকাঙিকরা কোব্তে লিখে বক্তিতে দিয়ে কান্না ছিটিয়ে হন্যে হয়ে গেছিলেন, যান না তাদের কাছে সিঙ্গুর নন্দীগ্রাম নিয়ে ছবি বানাবার বরাত নিয়ে। ফট করে দেখবেন এ চর্যাপদ রিভাইজ দিচ্ছে ও ভবভূতি ঝালিয়ে নিচ্ছে সে রবীন্দ্রনাথের বস্তাপচা নাটক নতুন অ্যাঙ্গলে স্টেজে নামাচ্ছে ভুরুফুরু কুঁচকে। স্বাভাবিক। প্রাইজের চক্কর আছে, বিদেশ যাওয়ার টিমে নির্বাচন আছে, আর নতুন গাড়ির ই এম আই-টা তো দিতে হবে! কারও এই নিয়ে পুরো দৈর্ঘ্যের ফিকশন-ফিল্ম করার সাহস হলে (ডকু-র কথা বলছি না, ও কেউ দ্যাখে না), ফোনে অবশ্য হুমকি-ফুমকি আসবে না, ও সব বড্ড লাউড, ‘ভুল মেসেজ’ বলে নন্দন থেকে বহিষ্কারের ফস্কা-গেরোও আর নয়, সিধে ডেকে নিয়ে গিয়ে এল সি-র ধারে হকিস্টিক দিয়ে বিছিয়ে দেবে। আমিও যে রামতড়পান দিয়ে ‘গুন্ডাগার্জেন’ লিখেছি, সংগঠনটা গুজরাতে বলেই। আলিমুদ্দিনে হলে, ‘দুষ্টুসোনা’ দিয়ে চালিয়ে দিতাম। এ ভাবেই গড়াবে। আমাদের অত কী? যে যার মতো পয়সা করে নিই চলুন। মুসলিমদের তো এমনিতেই ‘মোল্লা’ বলি আর পাকিস্তানের সাপোর্টার বলে ঘেন্না করি, অতএব মেরেছে ঠিক আছে, অমন ভাবে না দেখালেই পারত, না? সাবধানে রাস্তা পার হবেন, মশারি টাঙিয়ে শোবেন। টা-টা। এই খেয়েছে, ও কথাটা তো এখন লোডেড। বিড়লা।

১১ ফেব্রুয়ারি, ২০০৭

এ ই অ্যা ক পু রা ত ন

তেল কোম্পানির দৌলতে 'আঁতেল'-এর সংজ্ঞা পাণ্টে 'অন্য তেলের আঁতে ঘা'! আমাদেরও, ফট করে বং-বুদ্ধিজীবীগণের প্রতি চাহিয়া বিস্ময়ের সীমা নাই। এমনিতে বুদ্ধিজীবী মানে কাছা খুলে লাল ফেলতে ফেলতে প্রভুর পেছন পেছন, যদি চাড্ডি ফেনিবাতাসা, কিন্তু আজ সহসা নূতন ও পোক্ত মেরুদণ্ড সাপ্লাই ঘটেছে। সপ্রশংস ধাঁ রইল। আর হ্যাঁ, কবীর সুমনের টিভি-অনুষ্ঠানে এক নচ্ছার শ্রোতা ফোন জ্যাম করে দিয়ে ভেবেছিলেন, আর ফোন আসবে না, ওঁর কথাটিও বুঝি মুড়াবে। হায় গাধা, বাঘ চেনো না। সুমন টানা একা যা বলে গেলেন, অবিশ্বাস্য বাগ্মিতা ও আশিরনখ সং ঘৃণা তাঁর কথায় যে ক্রমাগত সপাং সপাং জোগান দিল, যে ঠাটিয়ে থাপ্পড় তিনি রচলেন, সহস্র গণজনের ফোন-ইন তার এক ইঞ্চিও পারত না। বরাবরই প্যাশনেট, সুমন থরথরিয়ে কাঁপছিলেন। শুনতে শুনতে সত্যি লতলতে কেঁচোরও গায়ে ডোরা জেগে ওঠে, হাত মুঠো হয়ে তেলোয় নখ বসে যায়। শেষে বললেন, 'নাটক করলাম কি? করলামই বা। যদি করে থাকি, স্বাধিকারে করেছি।' সুমনকে প্রণাম। 'জাগ্রত জাতি' হওয়ার কথা বললেন তিনি। জয় গোস্বামী অন্য এক সাক্ষাৎকারে বললেন, মাথা ঝুঁকিয়ে, খুব মৃদু, নিভন্ত স্বরে, এখন যা হচ্ছে, যে ভাবে সবাই প্রতিবাদে शामिल, ভাল, কিন্তু কিছু দিন পর দেখবেন, আবার সব চূপ। এবং তার কিছু দিন পর ফের অন্য এক নন্দীগ্রাম। জয়কেও কুর্নিশ। বোধহয় এ পোড়া দেশে তিনিই ঠিকঠাক দেখছেন। পাঠক খেয়াল রাখুন, একটি টিভি চ্যানেলে নন্দীগ্রামের বিশদ খবর দেওয়ার পর নাকের পাটা ফুলিয়ে ওপিনিয়ন পোল করা হল: 'উচ্চ মাধ্যমিকের দিন বন্ধ ডাকা উচিত কি না।' এই ওপিনিয়ন পোল নয়: 'পুলিশ আর ক্যাডার মিলে নির্লজ্জ অমানুষিক তাণ্ডব চালিয়ে গুলি করে কয়েকটা মানুষের হৃৎপিণ্ড এফোঁড় ওফোঁড় করে দেওয়া উচিত কি না।'

তবে আসল মজা: বচ্চন কলকাতা শহরে এসছেন। এর পর তো কোনও ভদ্রলোকের শাবক বাথরুমে ইয়ের পর যথাযথ পাছাপ্রক্ষালন করে সময় নষ্ট করতে পারেন না! আগাছা মাড়িয়ে মেন রোড ছাড়িয়ে তেত্রিশ কোটি ক্রাউড জমে জম্পেশ জেলি, ট্রাফিক জ্যাম চোদোটা রাষ্ট্রপতি আসার সমান, আর একটি ছবির শুটিঙে তো এমন সিকিয়ারিটির বজ্রব্যবস্থা, লোকে বচ্চন দেখতে গিয়ে ইয়া গোঁপওলা কম্যাভো দেখে ইকুয়াল পুলকিত হয়ে ফিরে আসছে! তার ওপর আবার ওই স্টুডিয়ার ধারে কাছে সবার ছাদে ওঠা বারণ। হুঁ হুঁ বাওয়া, চরম মেগাস্টার তোমার লোকালিটিতে শট দেবেন, আর তুমি নিজের বাড়ির ছাদে উঠে নিজের কাপড় মেলবে, ও সব প্যাখমবাজি চলছে নে কো! পাখি দেখতে ইচ্ছে হলে পাখির বই কিনে দ্যাখো। ভয়: কভু তুইয়েবুইয়ে কোনও বঙ্গডিরেক্টর টম ক্রুজকে

কালকুত্তায় আনলে, টানা ২৩৮ দিন কারফিউ-কালে আমাগো আলুপঁয়াজ কিনে দেবে কে?

অস্কারবাবাজি তো ফের বেহায়া কাণ্ড মচিয়েছে। এ যে কী আজগুবি মুদ্রাদোষ জগৎ: জুড়ে একটা লোক যখন দুর্দান্ত কাজ করে চলবে, তাকে কিছুতেই যথাযথ পাত্তা দেওয়া হবে না, তাগ্লর যবে বহুদিন অস্ত্রে সে হেজেমজে নিজ ছায়ার গাঢ় আমরা থেকে ক্রমশ ফিকে পেনামরা, তখন ‘ওহোহো, দেকেচো, চেটেপুটে খেলুম তোর জন্যে রাখলুম না যে!’ বলে ধাঁ করে দারুণ প্রাইজ, নিতান্ত রদি সাম্প্রতিক কাজের জন্য। যেন, এই নির্দিষ্ট বই বা ছবিকে সম্মান দেওয়াটা তো অজুহাত, আসলে দিচ্ছি সর্বাঙ্গীন কারবারের জন্য, লাইফটাইম ইয়ে টাইপ। কিন্তু সেই বছর যে অধিক ভাল লিখেছিল/গেয়েছিল/এঁকেছিল? যে ‘বেবেল’-এর মতো তুঙ্গ-কৌশলে গল্প বলেছিল? চুলোয়। স্করসিজ প্রাইজ পেলেন, অস্কার-মঞ্চে ত্রিবাঘা স্পিলবার্গ-কপোলা-লুকাস মিলে তাঁকে ‘দ্যাখ দিকি, তোকে অ্যাডিন দেয়নি? কী আক্কেল মাইরি এদের! যান্গে, ভেরি ভেরি সরি, মশলা খাবি?’ ভঙ্গিতে জড়াজড়ি সমাপন করলেন। কিন্তু যে ছবির তরে এ বিলম্ব-বিয়োনো, সে ‘ডিপার্টেড’ যে কী জঘন্য, বাপ।

কিছু লোকের শহিদ হলে যত সুবিধে, গৃহীত হয়ে গেলে তার দ্বিগুণ ঝাড়। যদিইন অনুরাগ কাশ্যপ ব্যান-মহলে আটকা ছিলেন, বহুত গ্ল্যামার ঝরেছে। এ বার ‘ব্ল্যাক ফ্রাইডে’ দেখে বোঝা গেল, কচকচে তথ্যচিত্র বই নয়। হ্যাঁ, ভীষণ নিষ্ঠায়, নিঃশেষে রিসার্চিত, গুঁড়োটি যেন বাদ না যায় প্রতিজ্ঞায় অনুপুঙ্খ ধৃত। আবার সে জন্যই, বড্ড নীরস, ছাড়া-ছাড়া, ফোকাসরহিত। এত জন টেররিস্টের নাম ধাম ও পলায়নকাম অঝোরে বর্ণিত হতে থাকে, ডিটেলে হিসেব রাখতে কালঘাম ছুটে যায়। এর চেয়ে এক-আধ জন

প্রোটাগনিস্ট বেছে গুছিয়ে কড়া আলো ফেললে সুবিধে হত বোধহয়। তবে হ্যাঁ, মুম্বই-বিস্ফোরণ যে বাবরি মসজিদ কাণ্ড বা শিবসেনার দাঙ্গারই অনিবার্য গণিত, এবং সে ধর্মজল্লাদরাও কিছুতেই এর দায় এড়াতে পারে না, স্পষ্ট উচ্চারিত।

‘মেগাপড’ নাটকটি ফাঁদা চমৎকার, জগৎ জুড়ে মেয়েদের পেট থেকে দামড়া প্রাপ্তবয়স্ক মানুষই বেরচ্ছে, যারা সব পারে সব জানে। কারণ তা-ই তো চাওয়া



বেবেল: ভাল ছবি, অস্কারহীন

হয়েছিল: এমন সন্তান যে দেখতে ভাল, আঁকে দারুণ, আবৃত্তিতে দড়, সাঁতারে চ্যাম্পিয়ন, পড়াশোনায় ফাস্ট, কুইজে তুখোড়। বাচ্চার ঘাড়ে এই থান চাহিদাই তো চাপিয়ে দেওয়া হবে। তো বাচ্চাদের বিদ্রোহ, মেগাপড হয়ে জন্মানো, এবং সিধে কথা: তারা এই বাপ-মা'র দায় নিতে নারাজ। চমৎকার সংলাপে এক মেগাপড মা'কে বলে, আয়নায় গিয়ে দেখে এসো, তোমরা কী, আর সন্তানদের কীর'ম চাইছ। সত্যিই তো, ভিত্তি, অপদার্থ, নির্বোধ গাছ থেকে হঠাৎ অমৃত ব্র্যান্ডের ফল গজাবে কেমনে? কিন্তু অভিনয় বিরাট ভাল নয়, নাটক সাজানোর শিথিলতা প্রচুর, সংলাপ বহু ক্ষেত্রে ন্যাকা। রিভাইজ দিলে ভাল।

বেরোল গায়ক শিলাজিৎ-এর বই: 'প্রাপ্তমনস্কদের জন্য'। পুরোটা নীল পাতায় ছাপা। ব্লু ফিল্মের ন্যায়, ব্লু বুক। পাবেন শিলাজিতের ছোটবেলার টুকরো, গান তৈরির টাকরা, আঁকা ছবি, লেখা পদ্য, টেনিসরত ফোটো, মাঝরাত্রে কলকাতার বুক হল্লাহাটি করে গান গাওয়ার সিডি, সংক্ষেপে: শিলাজিতের যা ইচ্ছে, তা-ই। শিলাজিতামো। বই জুড়ে প্রবল কেয়ার করি না ভাব, হরফবিন্যাসে চমকধমক, কিছু ব্রিলিয়ান্ট লাইন, কিন্তু হয়, শেষ অবধি প্রতিশ্রুতিময় তুবড়ির মতো হুউশ করে অল্প কিছুটা উঠেই গেল গেল মিইয়ে ফুস। আসলে নিজেকে কিছু জায়গায় একটু বেশি সিরিয়াসলি নেওয়া, আর বেঘোতর্জন দাবড়ালেও ততটা না বর্ষানো, নিরাপদ ছকে খেলা। যাক, কিছু দারুণ লাইন: 'বাবা ফিশারিজ ডিপার্টমেন্টে চাকরি করত। তাতে সরকারি মাছেদের যে খুব উন্নতি হয়নি সে তো বুলাদিও জানে।'

ম্যাক্স মুলার-এ ব্রাত্য বসুর অনুবাদে সুমন মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায় 'আগুনমুখো'। গোটা নাটকে সর্ব ক্ষণ 'উরিয়্যাঃ, কী নতুন দিলুম রে' ভাব, কিন্তু পাতিত্বে একেবারে ম-ম করছে। বাটখারার মতো ভারী, আড়ষ্ট সংলাপ, অনুবাদের খোলস ওঠেনি ভাল করে, হিন্দি গানের ঝিৎচ্যাক ব্যবহার করে মিডিয়াবশ্যতা দেখানোর প্রাণপণ ক্লিশে, পুরো নাটকটার চলন একঘেয়ে, নিষ্প্রাণ, ঘ্যানঘ্যানে। আসল দোষ বোধহয় মূল জার্মান নাটকেরই, যা বিপুল হাত্তালিপ্রাপ্ত, গাদা গাদা ভাষায় অনুদিত। উপাদান সাংঘাতিক: টিন-এজার ও তার দিদির বড়দের গোটা বাঁচাটার প্রতি ঘেন্না, বড়দের মতো বাসি মড়া হয়ে ওঠার ভয়, ভাইবোনের পরস্পরকে আক্ষরিক আঁকড়ানো, হ্যাঁ, সেক্স, এবং নাছোড় আগুন-অবসেশন, ছারখার-আকাঙ্ক্ষা, কারণ আগুন যুগপৎ নাশ ও শোধন করে। মুশকিল, এই ধ্বংসম্যানিয়ার তাত পোয়ানোর পানসে চাল যে কত্ত পচেছে, আর সন্টলেকে দম্পতির ঘরে বোম ছুড়ে 'এটা সিঙ্গুরের জন্য আর ওটা গুরগাঁওয়ার' বলে শটে রাষ্ট্রদ্রোহী প্রগতিশীল হয়ে ওঠা যে কী সস্তা, আর মেকি, বানানো, আর এমন একটা অন্ধকার নাটক, সব চুবিয়ে সর্বনাশ ডাকার নাটক, হ্যাঁ শালা বাপ-মাকেও কুপিয়ে খুন কর হাতুড়ি দিয়ে খুলি ভাঙ বলার প্রলয়-নাটক করতে গেলে যে খরখরে গুপ্তির ধার দরকার, কুচকুচে আঁধারে ঝিকিয়ে ওঠার খার দরকার— সে জিনিস যে ফালাফালা মৌলিকতায়, শিরছেঁড়া দলছুটতায় শান খায়, তা এখানে এতটাই ভোঁতা, থ্যাঁতা: কাতুকুতু আর হাই ছাড়া অন্য ফুলকি ওঠে না।

পে ছ নে নে ক ডে ?

নববর্ষ শুভ হবে, সন্দেহ নেই। মোবাইল কোম্পানি অবধি বাঙালিয়ানা বেচতে উব্বুত। হারমোনিয়াম থেকে টানা রিকশা নিয়নলাঙ্কিত হোর্ডিং-এ উঠতে পেয়েছে। এখন বাঙালিয়ানা খানিকটা 'ট্রাইবাল আর্ট'-এর মতো। শহরে বড়লোক যেমন শখ মারতে গ্রাম-গ্রাম রিসর্টে যায় আর বাচ্চারা হাঁসের পেছনে ডাক-ডাক করে ছোট্টে, কে কাকে ডাকছে আর প্যাক দিচ্ছে ভাল বোঝা যায় না, তাপ্পর সত্যিকার আদিবাসীদের আগুন-ঘিরে নাচের 'গালা-নাইট', চাড্ডি স্বাস্থ্যবতী থাকলে 'জিও পাগলা', ঠিক সেই ধাঁচে, অধুনা মেনস্ট্রিম স্মার্ট তকতকে ব্যাভারবিন্যাস (যা পশ্চিমবাংলার রাজধানীর প্রতিটি রেস্তোরাঁ ব্যাংক তেতলা বইবিপণিতে গিয়ে আমাদের ইংরিজিতে কথা বলতে বাধ্য করে, আর না পারলে হীনম্মন্যতায় চুবিয়ে মারে, 'এক বাটি সুপ দুভাগ করে দেবেন' না বলে আমরা বলি 'ওয়ান ছিথেন সুইট খর্ন সুপ ইনটু টু') এঁটো ছুড়ে দেওয়া প্রশ্নে বচ্ছরকার দিনে বাঙালিয়ানাকে এটু চাপ দিচ্ছে। আসুন না, আমরা গ্লোবাল সপ্রতিভরা, 'গো অ্যাজ ইউ লাইক' করি, একটি করে ধুতি দত্তক নিই। গেলাস-ঠোকাঠুকি শেষে 'চিয়ার্স'-এর বদলে বলি 'উল্লাস!' তরিয়ে দিই বাংলাকে! সাথে কি প্রতিযোগী 'এই কথাটি মনে রেখো' গাইবার পর সারেগামাপা-বিজয়ী অ্যাংকর মণিমুক্তো ঝাড়ে: তোমার সুর তো ভালই, কথাও ভাল!



'নেমসেক' ছবিতে চোখের আরাম খুব, অবরেসবরে মনও ওথলায়, কিন্তু হরেদরে এ হচ্ছে পরীক্ষার আগের রাত জেগে জিওগ্রাফি। ছবিতে সম্পর্ক গড়ে ওঠার জন্য বরাদ্দ একটা দৃশ্য, সম্পর্ক ভাঙার জন্যও তা-ই। নির্মাতার বেশি সময় নেই, বইটা পুরো কভার করতে হবে। মনে পড়বে ইন্টারনেটে জেনিফার শাইম্যান-এর প্রোজেক্ট: তাবৎ হলিউড ক্লাসিকের তিরিশ-সেকেন্ড ভার্সন, চরিত্ররা সব খরগোশ। আধ মিনিটে এক্সরসিস্ট, আধ মিনিটে ক্যাসার্লাংকা, আধ মিনিটে টাইটানিক। ছবির মূল+জনপ্রিয়তম মুহূর্তগুলোকে প্যারডি করে, অ্যানিমেশনে মজা-কাণ্ড। 'নেমসেক'-এ খরগোশ নেই, 'উপন্যাসের মূল পয়েন্টগুলো ছুঁয়ে গেলেই তার রস আপনিই নিংড়ে নেওয়া যায়' এ গবা-প্রবণতা আছে। মীরা নায়ারের বোঝা উচিত, বাবার মৃত্যুর পর ন্যাড়া হওয়া কাছা পরা বাঙালি নায়ককে তার বহুদিনের মেম-প্রেমিকা 'চলো নিউ ইয়ারে বেড়িয়ে আসি, তোমার মনটা এ সব থেকে দূরে থাকবে', বললেই তক্ষুনি দমাস করে বিচ্ছেদ হয়ে



নেমসেক : তড়িঘড়ি পোজ, চটপট ডোজ

যায় না, বন্ধুদের সামনে
নতুন বউ স্বামীর ডাকনাম
নিয়ে একটু রসিকতা করলেই
ভয়ানক রাগারাগি আর
বিছানায় কঠিন হয়ে শুয়ে
থাকা হয় না, আর বউটিও
কালক্ষেপ না করে তার
প্রাক্তন প্রেমিকের দেওয়া বই
পড়তে শুরু করে পরের
দৃশ্যেই ফোনে চুমু-বিনিময়
অবধি চলে যায় না। আবার,
স্টেশনে বউকে রিসিভ
করতে এসে তার পরকীয়ার
কথা জানতে পেরে, এক বার
চাঁচিয়ে, ঝাঁকিয়ে দিয়ে,
হনহনালেই বিয়ে তক্ষুনি
চুরমার হয়ে যায় না। এ যেন

ছবি নয়, কাহিনির সামারি, সম্পর্কের প্রেসি, ঘটনার হাইলাইটস। এখানে এমনকী সম্বন্ধ করে বিয়ে করা বউ প্রথম যৌনতার
রাতে একটু আড়ষ্ট অবধি হয়ে যায় না, স্বামীর হাতকে একবারটিও ধরে বিভিন্ন অঞ্চলে যাওয়া থেকে বিরত করে না, ফটাফট
চিত্রনাট্য এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কাজে তারা মহাব্যস্ত। ইউনিটের পেছনে নেকড়ে তাড়া করেছিল কি? যাপ্পো, ইংরিজি ফিল্মে
বাঙালি বিয়ে দেখাচ্ছে, মাঝে মাঝেই চরিত্ররা বাংলায় সংলাপ বলছে, ইংরিজিতে সাবটাইটেল পড়ছে, কী গব্ব না?



স্বাইফটাইম টিভি-র গেম-শো 'গে, স্ট্রেট অর টেকন'। তিনটি পুরুষ থাকবেন। এক জন সমকামী। আর এক জন বিষমকামী,
কিন্তু হয় বিবাহিত, নয় স্টেডি-সম্পর্কবান, 'অলরেডি সোল্ড' আর কী। অন্য জন বিষমকামী শুধু নন, 'ফাঁকা

আছি'। প্রতিযোগী মহিলাটিকে সকলের সঙ্গে 'ডেট' করে, বা 'পিঁঠটা কঁটকঁট করছে, এঁটু মাসাজ করে দাঁও না গো' বলে, বা সুইমিং পুলে কোরাসে সাঁতার কেটে, বা যা ইচ্ছে তা-ই করে, শনাক্ত করতে হবে কে শেষোক্ত ফুর্তিযোগ্য পুরুষ। সমালোচকরা তুমুল দুরমুশ চালিয়েছেন, মোক্ষমতম তিরঃ সমকামীটি কেন 'টেক্‌ন' হতে পারেন না? সমকামী বলে তাঁর প্রেম-পার্টনার থাকলে তিনি 'টেক্‌ন' নন? তবে যাঁরা এখুনি মিছিল করবেন ভাবছেন, অন্ত রাগের কিছু নেই, সেই ২০০৩-এই সমকামী গেম-শো হয়ে গেছে, 'বয় মিটস বয়', যেখানে 'ভুল' বিষমকামীদের কাঁকর বেছে 'ঠিক' সমকামীকে পছন্দ করতে হত।



'গ্রাফিক নভেল' এখন হেবির ফ্যাশন, এ আর কিছুই নয়, শ্রেফ ছবিতে গল্প। টিনটিন, অ্যাসটেরিক্স-ও গ্রাফিক নভেল, কিন্তু তাদের কমিক্স বললেই মিটে যেত, চাল যে লঘু। এ বার চেষ্টা: ছবির নাটকীয় সম্ভাবনা আর সাহিত্যের গভীরতা এক পায়ে ধারণের। ফোটোগ্রাফি, পেন্টিং, কার্টুন, উপন্যাসের বহুস্তর জটিল আখ্যান: সবটা নিংড়ে নেওয়ার। বিশ্ব জুড়ে গুচ্ছ অ্যায়সা হচ্ছে, কিছু নির্ঘাত ভাল, অধিকাংশই ছিঁচকে ওপরচালাকি ভর্তি। আসলে এই মাধ্যমের সবচেয়ে সুবিধে: যে গল্পটাও ভাল লিখতে পারে না আবার ছবিটাও ভাল আঁকতে পারে না, কিন্তু দুটোই কিছুটা কিছুটা পারে, সে চড়ে পড়ো রানিং-এ। সম্প্রতি সারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর দ্বিতীয় গ্রাফিক নভেল 'দ্য বার্ন-আউল'স ওয়াড্রাস কেপারস' বের করেছেন ঘটাপটা করে, শুরুটা দেখে দিব্যি জমাটি লাগে, রহস্যঘন সুড়ঙ্গের মতো বিপুল ও বহুগামী আঁকবাঁক, কিন্তু দারুণ নকশাওলা জাল আড়ম্বরে ছড়ানো যত সহজ, তাকে অভিজ্ঞ ধীবরের দক্ষতায় গুটিয়ে আনা বাঁশ-শক্ত, ও আসলি ক্যালি। এবং সে গুড়ে ব্যালি। কিছু অবাস্তব কলকাত্তাইয়া বাবু-বর্ণনে বইয়ের আয়তন বাড়িয়ে, টিপিকাল বাঙালি বোঝাতে সেই ইস্ট-মোহন ইলিশ-চিংড়ি মার্কা পানসে হিউমার ছিবড়ে উইট ছড়িয়ে, শেষমেশ আর কিছু মাথায় না এসে জন্মান্তর-টন্মান্তরের মশলা ছিটিয়ে কোনও ক্রমে দি এন্ড। চমক আছে, একটা জানলার বাঁ পর্দা হাতে-আঁকা তো ডান পর্দা ফোটোগ্রাফ, কিন্তু হয়, সস্তা ম্যাজিক কদদুর যায়? মাঝামাঝি অবধি পড়তে ভালই লাগবে, জটিল টুইস্ট, তুখোড় জট, কিন্তু প্যাঁচ খুলতে দমসম, পেঁচার পালক থলথলা।



নিউ ইয়র্কের 'লুজিং সামথিং' নাটকে 'আইলাইনার সিস্টেম' নামে এমন তাজ্জব ভিডিও-কেরামতি ব্যবহৃত হল, যাতে অভিনেতাকে শূন্যে ভাসমান দেখানো যাবে। অ্যাডিন এ সব হত দড়িদড়ার সাহায্যে, এ বার অভিনেতা লুকোবেন

আড়ালে, আর তাঁর 'প্রোজেকশন' নিখুঁত ভাসবে হাওয়ায়। এই প্রযুক্তি, যা নট বা নটীর 'ক্লোন' তৈরি করে 'প্রক্ষেপণ' করে মুহূর্তে, সহজেই জন্ম দিয়েছে ডবল রোলের। মানে, কিছু সিনে, স্টেজের ডান দিকে ক-বাবুর সঙ্গে স্টেজের বাঁ দিকে ক-বাবু এস্তার কথা বলে যাচ্ছেন। আগে থেকে রেকর্ড করে রাখা ক-বাবু 'মর্য' হয়ে এসে দাঁড়াবেন এখনকার ক-বাবুর সামনে, এবং তাঁরা নাট্য চালাবেন। পোস্টার ভাবুন: অভিনয়ে শম্ভু মিত্র, শম্ভু মিত্র এবং শম্ভু মিত্র!



'...এখনো, এখনো যদি ঘরে বসে নিজেকে বাঁচাই/ যদি বাধা না-ই দিই, তত্ত্ব করি কী হল কার দোষে/ যদি না আটকাই, আজও না-যদি ঝাঁপিয়ে পড়তে পারি/ আমার সমস্ত শিল্প আজ থেকে গণহত্যাকারী।' এটা গুজরাতের গণহত্যার সময় লেখা, শেষ মলাটে ছাপা। ভেতরের চোদ্দোটি কবিতা নন্দীগ্রামের পর লেখা, 'বিজল্ল' থেকে বেরনো বইটির নাম 'শাসকের প্রতি', লেখক জয় গোস্বামী। 'ওই যে জননী, ওই যে,/ আটকাতে চেষ্টা করছে নিজের ধর্ষণ/ বুকে বাচ্চাটাকে আঁকড়ে ধ'রে/ ওই ওরা কোল থেকে শিশু কেড়ে, মাথা মুঠো করে/ দু-আড়াই প্যাঁচে ঘাড় ভেঙে/ নড়বড়ে পুতুলটাকে ছুঁড়ে দিল নদীর ভিতরে/ তুমিও দাঁড়িয়ে দেখলে, আমিও দেখলাম।' মসী অসির চেয়ে আর ধারালো নেই, এ ধারণা ইদানীং চালু। এই কবি সে ধারণাকে এ গাল ও গাল রেকারিং থাপ্পড় কষাবার, এ সময়ের আমোদগেঁড়েমি ও পদলেহনের মাজাকির বিরুদ্ধে একা সাঁতরাবার ক্ষমতা ধরেন। 'দাঁড়িয়ে দেখা' পাবলিক আর কিছু না-পারুন, খুঁজে কিনুন বইটি। ফালাফালা হোন।

১৫ এপ্রিল, ২০০৭

ধা র ক রা ধা রা লো

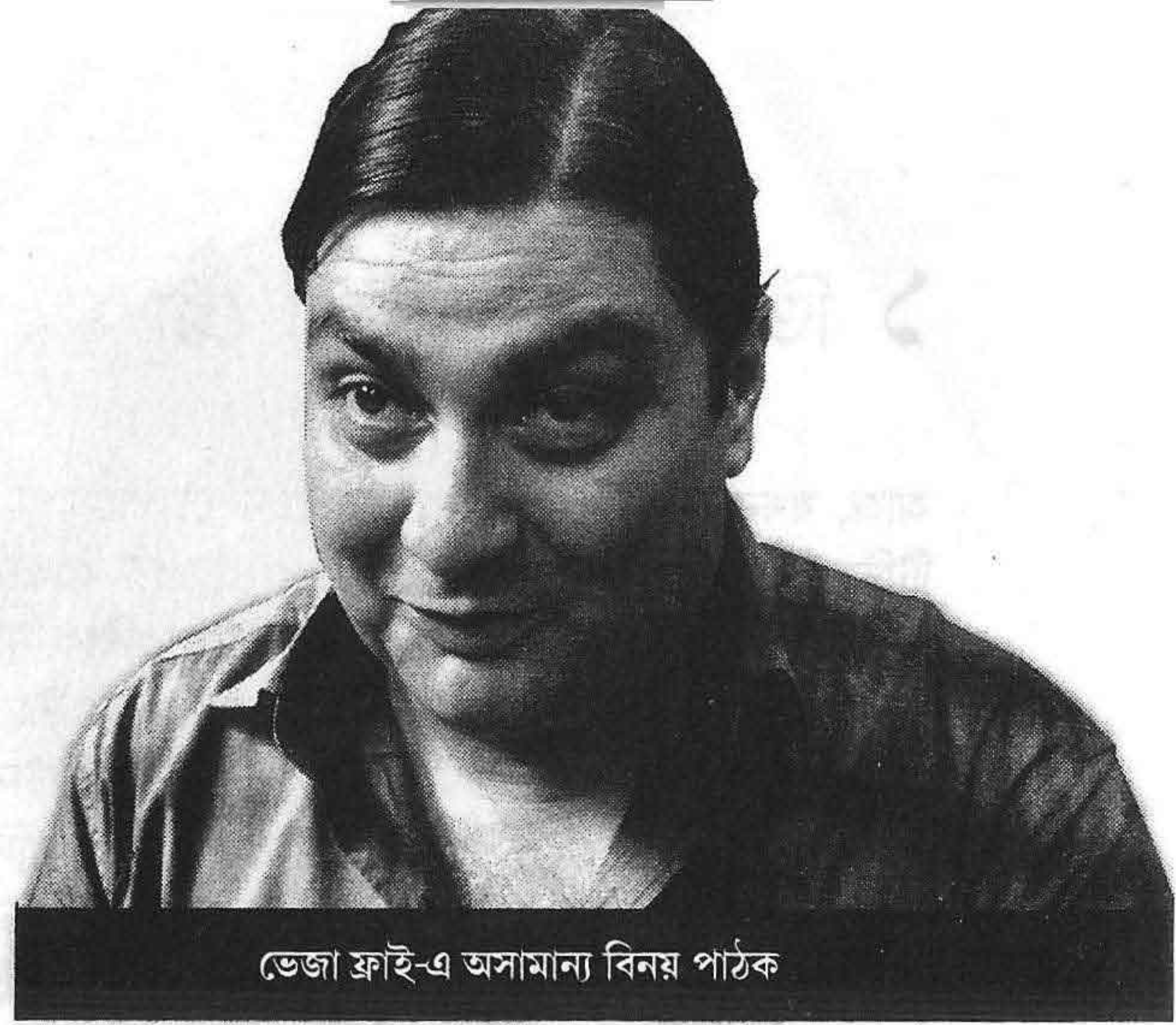
উদিকে যুগপৎ প্রভু ও প্রিয় দাড়িম্যান তো সে দিন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের হয়ে কলম ধরলেন। মাইরি। পঁচিশে বৈশাখ ঘরে ঘরে পৌছে গেল তাঁর শিল্পায়ন-সমর্থন। একটু ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে অবশ্য, কবির তো আর স্ট্রেট নাক দেখান না। যাক্কে, পঃবঃসঃ-র অ্যাডে মোদা কোটেশন দাঁড়াল, শিল্পায়নের প্রগতি থেকে মুখ ঘুরিয়ে বসে থাকলে তুমি মৃতের চেয়েও খারাপ, জীবন্ত (কে বলে মরার বাড়া গাল নেই?), নূতন কাল নাকি মানুষের কাছে নূতন অর্ঘ্য দাবি করে। তবে এই ‘নূতন অর্ঘ্য’ যে উদ্দাম মার্ভার এবং খুচখাচ রেপ, তা জানলে চিরসখা-টি নারায়ণ দেবনাথোচিত ‘ইইক্স!’ বলে ভেবলে চেয়ে থাকতেন সন্দেহ নেই। কেন চেয়ে আছ গো বাপ, শাসকের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ। বিশেষত সেই শাসক যদি এ হাতে টাটা ও হাতে রবিননাথন নিয়ে জাগল করতে করতে ‘তব নাম এই বলে খ্যাত হোক, তুমি আমাদেরই লোক’ লাগ ভেলকি প্রদর্শনের ডঙ্কা ধরে। তা বাপু ফ্র্যাংকলি, নন্দীগ্রামের ও সব ডিপ্রেসিং খটাখটি চৌপহর কাঁহাতক, তা ছাড়া কবীর সুমন তো ‘নন্দীগ্রাম’ অ্যালবাম বার করেই দিয়েছেন, মহাশ্বেতাকে নিয়ে সেপারেট গানসুদ্ধ, আর ভায়োলেন্স নিয়ে অত আপত্তি তো গিলক্রিস্টের ব্যাটিঙের লাইভ টেলিকাস্ট বন্ধ কর আগে, ওর চেয়ে হিংস্র কী-ই বা আছে ভু-ঝাড়পিটসমূহে। বরং ভাবি ‘স্পাইডারম্যান থ্রি’-র কথা, সেখানে নায়কের লড়াই পাপীর বিরুদ্ধে নয়, পাপের বিরুদ্ধে। মানে সত্যিই, ছবিতে ‘পাপ’কে আলাদা ভাবে দেখানো হল! হ্যাঁ, মানুষের আধার ছাড়াই, আলাদা একটা কালচে থকথকে ব্যাপার, সে ব্যাটা হিলহিলিয়ে গিয়ে যাকে খপাৎ করে ধরে সে-ই পাপী হয়ে যায়, মনে খলবলে আকাঙ্ক্ষা জাগে, মানবিকতাকে গুলি মেরে ইচ্ছাচার ফলাতে মন চায়! ফলে স্পাইডারম্যান, যে আদ্যন্ত সৎ, এবং লাল পোশাকধারী, সহসা হয়ে ওঠে স্লিক কুচকুচে, স্মার্টতর, চোখে ঝিলিক দেয় খচাৎ, সে বন্ধুকে বেধড়ক পেটায়, সহকর্মীর নামে চুকলি কেটে চাকরি ছাড়িয়ে দেয়, প্রেমিকার সামনে অন্য মেয়ে নিয়ে ফুর্তি করে, সর্বোপরি, তাড়া করতে করতে এক ভিলেনকে একেবারে নিকেশ করে দেয়। এ একেবারে তার চরিত্রের বিপরীত, কারণ সে কাউকে খুন করারই বিরুদ্ধে। তাতে কী? কালো পোশাক আনখগর্দান আঁকড়াবার পর থেকে হি ইজ লাভিং ইট, সভ্যতার পরিখা মসৃণ জাম্পে টপকে নীতিস্কেপ দোমড়ানো উদ্যানে বুপ্ ল্যান্ড করে তার হেবির লাগে। ক্ষমতাশীলকে যে ক্ষমতাশীল হতে হবে, ভুলতে পেয়ে নেতৃত্ব থামে না। যাক, শেষে বৃষ্টিপাত ধূসর সন্ধ্যায় চার্চের ডগায় বসে সে গ্যাঁড়াকল বোঝে, অতি কষ্টে পাপতত্ত্ব ছেঁড়েখোঁড়ে (সে কি আর সহজে ছাড়ে, সাঁটতে সাঁটতে পেঁচিয়ে পাকিয়ে প্রায় তার গা হয়ে উঠেছিল, এবং একটা পর্যায়ের পর কাউকেই কমলি ছাড়ে না), ক্লাইম্যাক্সে কেলে শূঁয়োগুলোকে বোম মেরে ওড়ায়। নীতিকথা: তোমার

সব সময়ই একটা বেছে নেওয়ার পথ থাকে, ‘আমার কিছু করার ছিল না’, বা ‘আমি পরিস্থিতির শিকার’ বলে কিছু হয় না। যদি প্রশ্ন দাও, পাপ এসে তোমাকে ধরবে, এবং ধরলে, তুমি অনেক কিছু পাবে বটে, নিজেকে হারাবে। অতএব আসলি ফাইট তোমার সঙ্গে তোমার। সঙ্গে মনে রাখুন, ভোজপুরী ডাবিং-এ রবি কিষণ-এর গলায় মাকড়ম্যান প্রেমিকাকে বলে, ‘জানম তুম তো মুজফ্ফরপুর কি লিচি কি তরহ দিখতি হো!’ রবি নাকি আবার সংলাপে নিজে নিজেই তুলসীদাসের বহু পদ ঢুকিয়ে দিয়েছেন। পাপের খাবলা থেকে বাঁচিলি বাপ, ডাবিঙের কবল থেকে পাল্লি নে!



না, নিউ ওয়েভ দূর অস্ত, কিন্তু উন্মাদ ঝটকা লেগেছে সিওর। মান্টিপ্লেক্স/ বিশ্বায়ন/ ডিভিডি, কে ম্যান অব দ্য ম্যাচ কে জানে, তবে রেজাল্ট নিশ্চিত: তিন দিন না খেয়ে না দেয়ে দুটো বিয়েবাড়ির দরজা টিভিতে নাগাড়ে দেখে যাওয়া আকাঁড়া পাবলিক অবধি সিনেমা দেখার সময় বচন বা শাহরুখের মতো বাজে অভিনেতা কিন্তু বিকট স্টারদের পেরিয়ে যেতে শিখেছেন। নাসিরুদ্দিনদের গেছে যে দিন একেবারেই গেছে ভাবা হয়েছিল, কিন্তু আজি ডবল সূর্য ট্যাকে সে দিবস পুনর্হিট: বিনয় পাঠক, বোমান ইরানি, রণবীর শোরি, পরেশ রাওয়াল, কঙ্কণা, ইরফানদের কেন্দ্রীয় চরিত্রে রেখে ছবি হচ্ছে, বক্স অফিসে তেড়ে টাকা তুলছে। এঁরা দেখতে-শুনতে কদাপি ভাল না, তাতে কিছু এসে যায় না, অন্য রকম স্ক্রিপ্ট হচ্ছে, দুর্দান্ত অভিনয়, স্বতন্ত্র ফিল্ম। যে ছবিরা এই ঝড়-বদল আনছে, বিপ্লবের কাঠবেড়ালের মর্যাদা অন্তত তাঁদের খাতে বরাদ্দ নিশ্চিত। ‘ভেজা ফ্রাই’ এ গোত্রেরই তুমুল ফিল্ম। আশ্চর্য গল্প, টাটকা চিত্রনাট্য, তুখোড় অভিনয়, ছবি জুড়ে খরখরে বুদ্ধির ধার একেবারে নতুন অস্বিজেন দিয়ে মুখ ধুইয়ে দেয়। গোটা ফিল্মে কণামাত্র শিথিলতা নেই, এবং পুরোটায় পরিচালক সাগর বল্লারীর নিয়ন্ত্রণের স্পষ্ট উপস্থিতি। ক্যামেরার সার্কাস তাঁর দরকার নেই, শব্দের হররাও না, হোক না গোটা ছবিই প্রায় একটা বাড়ির ভেতরে, কিছু এসে যায় না, যত ক্ষণ চিত্রনাট্য আর অভিনয়— আসলি দু’টি ভল্ল— খতরনাক। সাগর বল্লারী এবং অর্পিতা চট্টোপাধ্যায়ের অবিশ্বাস্য স্ক্রিপ্টের জন্য দু’শো কুর্নিশ প্রাপ্য।

খে য়ে ছে!! এখন লেখাটা কাটি কী করে? ইয়ে, দাদারা, দু’শো থেকে ওটা কমিয়ে সাড়ে তেরো হচ্ছে, কারণ ছবিটা ফরাসি ফিল্ম ‘ডিনার গেম’ থেকে আদ্যন্ত টোকা। টোকা বলে টোকা! একেবারে পূর্ণচোতা: আঁশখোলাসুদ্ধ, দৃশ্য বাই দৃশ্য, পরিস্থিতি বাই পরিস্থিতি, কোথাও ডায়লগ বাই ডায়লগ। কিন্তু হ্যাঁ, বুদ্ধিমানের মতো কপি। আমরা যেমন বন্ধুর পরীক্ষার খাতা দেখে লেখার সময় ত্রিভুজ ABC-র নাম টুক করে XYZ করে দিই, এখানে বুধবার হয়েছে শুক্রবার, ট্রেনে আলাপ হয়েছে বাসে আলাপ, ফুটবল-পাগলামো হয়েছে ক্রিকেট-ক্রেনজ, আর দেশলাইকাঠি দিয়ে সৌধ বানানোর নেশা হয়েছে গানের শখ। না, হাসবেন না, বেশ কিছু ডায়লগ এঁরা নিজেরাও লিখেছেন, ‘তুই রবীন্দ্র জৈন-কে



ভেজা ফ্রাই-এ অসামান্য বিনয় পাঠক

গান শোনাতে গেছিলি, তোকে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছিল না?’-র উত্তরে ‘ধুর, রবীন্দ্র জৈন অন্ধ, প্রতিভা দেখবে কী করে?’ তো আর মূল ছবিতে ছিল না। যেমন ছিল না রজত কপূর পিৎজা অর্ডার দেওয়ার সময় পেছন থেকে বিনয় পাঠকের অসম্ভব ডিসটার্ব করে চলার দুর্দান্ত দৃশ্য। ১৯৯৮-এ তোলা ফ্রান্সিস ভেবের-এর ছবির চেয়ে কিন্তু শেষবেশে এই হিন্দি ছবি জমাটি বেশি। স্বাভাবিক। সামনে যদি একটা অপূর্ব শিল্প রাখা থাকে, কাঠামো চর্বিচার্বাসহ গোটা, তখন তাকে এ দিক ও দিক কিছু জুড়ে কিছু ফুঁড়ে আরও ধারালো করে তোলা মজাকাজ। সেটা এঁরা ফাটিয়ে করেছেন। বিনয় পাঠকের নিজে রসিকতা বলে নিজেই অদ্ভুত অটুহাসি, বার বার প্লাস্টিক ঝেড়ে দড়ি পাকিয়ে অ্যালবাম সুটকেসে পোরার পিটপিটে পারফেকশন, ফোন করেই ‘ইটস রিংগিং’ বলে পুলকিত হয়ে ওঠা, সব নতুন। মোদা :

একটা কৌতুক-পরিস্থিতির মধ্যে যতটা রস, নিঃশেষে নিংড়ে নেওয়ার কাজটা ‘ভেজা ফ্রাই’ দাপিয়ে করেছে। সে তুলনায় মূল ছবি একটু কাঠ-কাঠ, হড়বড়িয়ে সেরে দেওয়া। অভিনয়ের মধ্যে দিয়ে চরিত্রগুলোকে অনেক বেশি মাংস দিয়েছেন হিন্দিমানুষরা। বিনয়ের জন্য তো ভিৎগ্রহের বিশেষণ বানাতে হবে, রজতও দুরন্ত, ইচ্ছে করে চেপে খেলেছেন, যাতে বিনয় স্লগান। না, চুরি কক্ষনও ভাল না, শিল্পে তো নয়ই, কারণ মৌলিকতারই সর্বোচ্চ নম্বর, তবে টুকতে গিয়ে হলিউড না নিয়ে ফরাসি কমেডি নেওয়া হল, আর সেটাকে ‘উন্নততর’ করে ছাড়ল, সে জন্য দশ-বারো বাড়বে না?



সেলফোন আবিষ্কারের চেয়ে কিছু কম যুগান্তকারী না, বাংলা খাবার-দোকানের নাম ‘নোলা’! সাবঅন্টার্ন শব্দ হে, তোমারই জয়! ইদিকে উদ্দাম স্মার্ট বিজ্ঞাপন, ইংরিজিতে লেখা NOLA, আমরা তো ভেবেছি ইটালিয়ান সেন্ট-টেন্ট, ‘রান নোলা রান’ সম্ভাব্য স্লোগান! বছর ঘুরতে না ঘুরতে ‘নোলা স্যাকস্যাক’ নাম হলে, যথার্থ ইংরিজি।

১৩ মে, ২০০৭

১ ডি লান ৭ অ্যাক্ট

আজ, যখন আদনান সামি হয়ে গেছেন রোগাসোগা ফিটফাট, অন্য মোটা পুং-স্ত্রীগণ লাল দল ও নীল দল ঠাউরে টিভিতে সবার সামনে কুচকাওয়াজ ও হাঁপের আওয়াজ ছাড়ছেন এবং ছেলেরা টি-শার্ট খুলে ওজনযন্ত্রে দাঁড়াচ্ছেন কিন্তু মেয়েরা টি-শার্ট খুলছেন না অর্থাৎ ওটা আবশ্যিক নয় অর্থাৎ মোটা পুরুষদের অপ্রয়োজনীয় উর্ধ্বাঙ্গ উন্মোচনের অসহায় শিকার হতে হচ্ছে, কাশ্মীরা শাহ তাঁর প্রথম হলিউড ফিল্ম ‘দ্য প্রিন্স, পিম্প, দ্য জ্যাকাল অ্যান্ড দ্য স্পেড’-এ সাজছেন ইয়া গোঁপদাড়িওলা ৭০ বছরের সাধু, শ্যারোন স্টোন রাজি হচ্ছেন হিলারি ক্রিষ্টনকে প্যারডি করে এক মিনিটের ব্যঙ্গাত্মক বিজ্ঞাপন করতে, আফগান লেখক ও চলচ্চিত্রকার আতিক রাহিমি তুলছেন রবীন্দ্রনাথের ‘কাবুলিওয়ালা’, যেখানে কাবুলিওয়ালার চোখ দিয়ে দেখা হচ্ছে গোটা গল্পটা, মিনির বাবার চোখ দিয়ে নয়, অর্থাৎ এখানে ‘কাবুলেটা’ না, বরং কলকাতাটা আর বাঙ্গালিবাবুগুলোই ভিন্নগ্রহী, হল্যান্ডের ‘দ্য বিগ ডোনর শো’— এক আশ্চর্য রিয়েলিটি শো যেখানে এক মরণাপন্ন রোগী তাঁর কিডনি দান করবেন তিন ‘প্রতিযোগী’র মধ্যে থেকে এক জনকে বেছে (যাঁরা কিডনি না পেলে বাঁচবেন না), তা ১ জুন প্রচারিত হতে হতে শেষটা জানানো হচ্ছে এত ক্ষণ যাঁকে ব্রেন-টিউমার রোগী (ও কিডনি-দাত্রী) হিসেবে দেখানো হচ্ছিল তিনি আদতে এক অভিনেত্রী এবং দিব্যি সুস্থ, এবং সম্ভাব্য কিডনি-প্রাপকরা (যাঁরা সত্যিই অসুস্থ) তা আগাগোড়াই জানতেন, এবং এই চোরামি করা হচ্ছে কিডনি দানের পক্ষে সচেতনতা গড়ে তুলতে এবং কেউ এটা ‘জিনিয়াসের কাজ’ বলে লাফাচ্ছেন কেউ ‘কী পেঁয়াজি হচ্ছে মানুষের চরম যত্ত্না নিয়ে’ চেষ্টাচ্ছেন— তখন, ‘ওরে কোব্তে করিসনি কোব্তে করিসনি’ পইপই ওয়ার্নিং কিছুতে না শুনে, শিল্পের চিনি জীবনে চাটতে মরিয়া বাঙালি ‘পাবলিকের মার কেওড়াতলা পার’ লব্জ সুপারহিট হতেই ডোম প্রদীপকে মেরেধরে, পোড়াবার বেলা কেওড়াতলা পার করে নিমতলায় ঠেলে একসা!



এই মওকায় আবার অন্য সিনেমার স্লোগান ‘কাকার মার দুনিয়ার বাড়’ ছপাছপ দেওয়াল দখল নিয়ে নিল। স্ট্রেট ঝাঁপু! পাশেই ‘নার্সারি থেকে শুরু, হাফপ্যান্টে গুরু, ফুলপ্যান্টে মহাগুরু’। ‘মহাগুরু’ ছবির এ পোস্টারের অবিশিষ্ট ইতিহাস হ্যাজ। বহুদিন পূর্বে কলেজ ফেস্ট-এ গাইবার জন্য দেবাশিস ভট্টাচার্য লিখেছিলেন অসামান্য ফক্কড় সংগীত ‘আর পারছি না যে গুরু, সেই নার্সারি থেকে শুরু’ (মূলত সেক্স-স্টার্ডেশন আর কী, নার্সারি থেকে চনচন কচ্ছে, আর

চাপতে পারছে না), সে গান শহর-গাঁ-গলিময় রইরই, পরে
টিভিতে কী যেন একটা অ্যাডে লাইন দুই উদ্ধৃত, আজ এই
অপভ্রংশ। আর 'যারা বৃষ্টিতে ভিজেছিল'-র পোস্টারে 'আপনার
বাড়ি থেকে কতদূর, টেলারিং পাড়া?' বা 'একজন কামশীতল
অন্যজন পুরুষত্বহারা' নিয়ে তো কথা হবে না। তবে
পঃবঃপাবলিক তো সোজা না, সেই নার্সারি থেকে শুরু, ও সব
'শীতল' বা 'হারা' আপসেই ফটাফট ফেড আউট হয়ে, জাঁকিয়ে
জেগে থাকবে শ্রেফ কাম ও পুরুষত্ব, এবং নাচতে নাচতে ভিড়।
বোধহয় সেটাই ফন্দি। কিন্তু 'পথে টাঙানো পদ্য' বিভাগে
প্রশ্নাতীত চ্যাম্পি: কলকাতা ট্রাফিক পুলিশ। মোটরসাইকেলে
চড়ে যেতে যেতে বাচ্চা বলছে 'বাবার মাথা ভীষণ
দামী/হেলমেটেতে ঢাকা/ ছোট্ট মাথার নেই কোনও দাম/
আমার মাথা ফাঁকা'— ইহার মধ্যে মাল্টিস্তর বিবেকবাইট কড়াং
কড়াং বাজন্তি। আইন ফাঁকি+শিশুর প্রতি অরহেলা=থারাপ
নাগরিক ও যাচ্ছেতাই বাবা, মানে একদম অমানুষের ঝাড় যাকে
বলে, লজ্জায় মুড়ু ঝুলে পড়ার মতো এ প্রহার টপ করে ছন্দে
বাঁধা সহজ না। সঙ্গে অবশ্যই দেখুন 'এক হাতে steering/cell
ধরা ও হাতে/এ ভাবে চালানো, জেল-এ/ রাত হবে—
পোহাতে।' ভাবা যায়! 'ওহাতে/পোহাতে'! একে তো 'এই দেখ
পেনসিল, নোটবুক এ হাতে,/এই দেখ ভরা সব কিল্‌বিল
লেখাতে'-র চেয়ে সরেস মিল। তদুপরি, নীরস পুলিশীয়
হিতোপদেশমূলক চৌপদী কী ভাবে অন্ত্যমিল-উদ্যানে ফাস্ট-রেট
রাঙা কুসুম খিলাচ্ছে, ভাবলে হাঁ বোজে না।

চিনতে পারছেন? ডিলান নয়, কেট ব্ল্যাঞ্চেট





কলকাতা টিভি বব ডিলানের জন্মদিনে (২৪ মে) স্পেশাল অনুষ্ঠান করল রান্তিরে, ডিলান-সংগীত গেয়ে-বাজিয়ে শ্রদ্ধা জানানেন কবীর সুমন, অমিত দত্ত, নন্দন বাগচী, অঞ্জন দত্ত, নীল দত্ত, জ্ঞান সিং। ব্যাকডম্যাকড সেট: সামনে টুনি আলোর মালা এবং কতিপয় সানগ্লাস ঝোলানো, পেছনে ক্যাটকেটে লালের ওপর সাদা দিয়ে ‘রেবেল’— বোকা-বোকা ব্যাকপট এবং নন্দনবাবুর ভয়াবহ বেসুরো গলা সত্ত্বেও অনুষ্ঠান যে মসৃণ উতরে গেল, তার ম্যান অব দ্য ম্যাচ: গুচ্ছ গুচ্ছ ফুটেজ। ডিলানের পঁচিশ বছর বয়সে তাঁকে নিয়ে তৈরি খ্যাত তথ্যচিত্র ‘ডোন্ট লুক ব্যাক’ থেকে ডিলান আসছেন- যাচ্ছেন-গাইছেন-ছুটছেন সিনসিনাদি তো বটেই, এমনকী সে ছবির গোড়ায় দেখানো ‘সাবটেরেনিয়ান হোমসিক ব্লুজ’-এর মিউজিক ভিডিও (যেখানে ডিলান ওই গানের কিছু শব্দ লেখা একের পর এক কার্ড তুলে দেখান আর ফেলে দেন অদ্ভুত নির্বিকার মুখে), আরও বহু বিরল গান-দৃশ্য, ডিলান ও জোন বেজ-এর যুগলে গাওয়া ‘ব্লোয়িন ইন দ্য উইন্ড’, অনবদ্য। তবে অঞ্জন দত্ত-কে কেন মাত্র একখানি গাইতে দেওয়া হল কে জানে, এই আসরে উনি তো সুপার-ওস্তাদ হয়ে ওঠার যোগ্য। এ দিকে আন্তর্জাতিক ঘনঘটা: আসছে ডিলানকে নিয়ে তৈরি ছবি ‘আয়্যাম নট দেয়ার’, যেখানে তাঁর ভূমিকায় অভিনয় করবেন সাত জন, এবং তাঁদের মধ্যে এক জন মহিলা! মানে, একই চরিত্রে উত্তম, সৌমিত্র, সুচিত্রা! বুনুয়েল ১৯৭৭-এই অকল্পনীয় কাণ্ড রচেন, এক নায়িকার চরিত্রে দু’জন নারীকে দিয়ে অভিনয় করানো। তার পর ব্রডওয়ে মিউজিকাল হয়েছে ‘লেনন’ যেখানে জন লেনন সেজেছেন ন’জন, ‘নর্মা জিন অ্যান্ড মেরিলিন’ ছবিতে মেরিলিন মনরো-র ভূমিকায় দু’জন, ‘প্যালিনড্রোম’ ছবিতে নায়িকার ভূমিকায় আট জন, কখনও শ্বেতাঙ্গিনী, কখনও কৃষ্ণাঙ্গী, এক বার সাদা চামড়ার ছেলেও! ‘আয়্যাম...’-এর সাত চরিত্র নাকি ডিলানের জীবন ও সংগীতের সাতটি আলাদা আলাদা দিক ফুটিয়ে তুলছে (তা-ই তোলে, এক চরিত্রের অনেকগুলো সত্তা দেখাতেই জিনিয়াস/গিমিকপ্রয়াসী পরিচালক অন্তরটি ব্যবহার করেন)। মুশকিল, বুনুয়েল এক জনই। একই চরিত্রে প্রৌঢ় বৃষস্কন্ধ রিচার্ড গেয়ার-ও করবেন, তব্বী কেট ব্ল্যাঞ্চেট-ও করবেন, সাত সন্ন্যাসীতে ডিলান না ভ্রষ্ট হয়!



বুদ্ধদেব বসু কবে সেই ‘তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগ’ খুলেছিলেন, আজি অনুরূপ বৌদ্ধিক বিস্ফোরণ ঘটাল ‘ইনকোডা’, মেট্রোর গহুরে নেমে গোলা চোখ ও হাঁ সহ টিভিতে দেখুন ‘কৌন কিতনা পানি মে’: একই টেক্সটের বিভিন্ন ভাষ্য একেবারে পাশাপাশি ফেলে, ব্যবচ্ছেদ করে দেখানো হচ্ছে। এই দেখলেন বচনের পুরনো ‘ডন’ থেকে একটা সিন হচ্ছে, তক্ষুনি সেটা কেটে দেখানো হল শাহরুখের নতুন ‘ডন’-এর ওই দৃশ্যটিই। মানে, এই ইফতিকার বচনকে ডনের ছবি

দেখিয়ে প্রস্তাব দিচ্ছেন, তুমি গুল্লা সাজো। পর মুহূর্তে বোমান ইরানি ওই সাজেশনই দিচ্ছেন শাহরুখকে। একই গল্প থেকে করা দুটো ফিল্মের সদৃশ দৃশ্যগুলো একদম পিঠোপিঠি দেখতে পাচ্ছেন। দিলীপকুমার দেবদাস হয়ে কাঁদছেন তখন টালিগঞ্জের ট্রেন এল, দমদমেরটা আসতে না আসতে শাহরুখ একই মর্মে ভেউভেউ। তুলনামূলক চলচ্চিত্র স্টাডির এ নতুন দিগন্ত, এবং আমদর্শকের জন্য তার গেট হাট করে খোলা। অফিস-পথে বুঝুন, আলাদা পরিচালক বা অভিনেতা যখন একই কাহিনি-অংশ, এমনকী প্রায় হুবহু সংলাপ ব্যবহার করেন, তা কী ভাবে পাল্টে যায়। দেখতে দেখতে আপনি অংশ নিতে বাধ্য, যাচাই করতে, পয়েন্ট দিতে বাধ্য, কোনটা কীসে ভাল, কোনটা ইস্‌ বুলে গেল, এবং সুতরাং বাধ্য সিনে-ভাষা কিছুটা হলেও ভাবতে-বুঝতে। নিরাসক্ত ল্যাংগুয়ে পথচলতি টিভি-দর্শনে এ নিঃশব্দ তুলকালাম আনার জন্য মেট্রোকে 'যথার্থ আন্ডারগ্রাউন্ড মুভমেন্ট' শিরোপা, প্লাস উচ্ছ্বসিত তালি।

১০ জুন, ২০০৭

ক বি সে দো ক লা কাঁ দে

কবিদের পেটানো হয়েছে, গুলিতে এফোঁড় ওফোঁড় করা হয়েছে, রাষ্ট্র থেকে ঘাড়ধাক্কা দিয়ে তাড়ানোর ঢালাও ফতোয়া জারি হয়েছে। কিন্তু এতে কবির মোটে অসম্মান হয়নি, কারণ যত তার টুটি টিপে ধরবে, তত মিথ ফেঁপে উঠবে। কবিকে ঠিকঠাক অট্ট-অপমান করতে যদি চাও, তার একটি লেখা নাও, প্রচণ্ড শ্রদ্ধাসহকারে সে লেখাকে কুপিয়ে, কুচিয়ে, লেবড়ে খুন করো, তার পর গদগদ হয়ে বলো, ক্যাসা ট্রিবিউট দিলুম! কল্যাণী নাট্যচর্চা কেন্দ্র নাটক করছে ‘বাবরের প্রার্থনা’, শঙ্খ ঘোষ-এর কবিতাটির ‘অনুপ্রেরণায়’। প্রকাণ্ড অনুপ্রাণিত ওঁয়ারা, বোঝা যায়, যখন নাটক জুড়ে পৃথিবীর তাবৎ বদ জিনিসের বিরুদ্ধে গ্যাদাড়ে নামতা-কাটিং প্রতিরোধ আওড়ানো হয়। এ নাটক জানায় সম্ভ্রাসবাদ খারাপ, সাম্প্রদায়িকতা খারাপ, যুদ্ধ খারাপ, ফাঁসি খারাপ, ধর্মের নামে জালিয়াতি খারাপ, এমনকী পলিগ্যামিও হদ্দ খারাপ, কিন্তু কিছুতে বলে না: সবচেয়ে খারাপ হল লোককে ডেকে এনে ভয়াবহ বোর করা। ঝাপ, উপদেশের কী তোড়! যেন এক একটা অভিনেতাকে লাইন দিয়ে দাঁড় করিয়ে বলা হচ্ছে, ‘লেঃ, এ বার তোর প্রবন্ধটা আওড়া।’ একটা চড়া মতো ডেলিভারির সুর বের করেছেন এঁরা, শঙ্খ মিত্রের আবৃত্তি আর মমতা-র বক্তৃতার মাঝামাঝি, তাতে প্রচুর লোক আমাদের পূর্ণাঙ্গ শুভবোধ শেখান। হুঁ, স্বয়ং বাবর আছেন, তাঁর প্রার্থনাও আছে, হাতটাত তুলে তিনি ঠায় বহু ক্ষণ বসে থাকেন শেষ সিনে। এ নির্বোধ আক্ষরিক আহরণের পাশে, গুচ্ছ পরিস্থিতির কোলাজ, যার প্রতিটি নীরস, একঘেয়ে, পাতি। এই নাটক একটা জরুরি তত্ত্ব প্রচার করে, আর্ট-গণতন্ত্রের সূত্র: শিল্প তৈরির জন্য প্রতিভার কোনও প্রয়োজন নেই। শুধু কিছু ফুলস্কেপ কাগজ, একটা কলম, আর গাঁতিয়ে খেটে জিনিসটাকে নামিয়ে দেওয়ার খ্যামতা। ব্যস। শিল্প মানেই যে আসলে ঘুরিয়ে নাক দেখানো, যে কথাটা সকলেই জানে তাকে অন্য ভাবে, মৌলিক ধরনে, নিদেন আকর্ষক ঘরানায় বলার চেষ্টা, সে সংজ্ঞাকে উড়িয়ে দেয় এই প্রোজেক্ট। এর মূল ম্যানিফেস্টো: যা বলছি তা যদি ‘ন্যায্য’ হয়, তা হলেই তা শিল্পোচিত। যদি বলি, ‘মুসলিমকে ঘৃণা কোরো না’, সে কথা এতটাই দরকারি ও নিশ্চিত ভাবে ঠিক, যে এই ‘ঠিকতা’-ই শিল্পটাকে দাঁড় করিয়ে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট, কোনও আশ্চর্য কৌশল/কায়দা বাগাবার প্রয়োজন নেই। অনর্থক মশলাদারিতে না গিয়ে, উচিত-কথাটা হড়হড় করে বলে দাও। মুশকিল, তা হলে শিল্প আর ক্লাস ফাইভের রচনাবইয়ের মধ্যে পার্থক্য রইল কোথায়? উত্তর: রইল না। গুলিয়ে গেল সারল্য ও নিবুদ্ধিতা, চিরন্তন সত্য ও ক্লিশে। এক সহজমারুয়া-র ভুলে, এক মহাপৃথিবীর ভুলচুক হয়ে গেল। তাই পালাটিতে অর্ধেক কথার বলেন গ্রিকে, বিস্ময়ের ঘোর তাঁদের ‘স্নায়ুকে সম্ভ্রান্ত বৈকল্যের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয়’, বাকিরা ন্যাপি-পরা ন্যাকামির

কেতন তুলে ‘হিজলগাছে পাখির ডাক কিচিরমিচির নেই’ বলে ককিয়ে ওঠেন। শুধু এক বার, প্রখর বুদ্ধির ঝিলিক দেখা যায়। নাটক শুরুর আগে, ক্যাসেট বাজিয়ে শঙ্খ ঘোষের গলায় ‘বৃষ্টি’ কবিতার আবৃত্তি শোনানো হয়। নাটকটার সঙ্গে নাকি কবিতাটার ভাষ্য হেঁচকি মেলে। তা, কবিতাটা তো পরে চরিত্ররা বলবেনই, তা হলে পর্দা ওঠারও আগে হঠাৎ এ আয়োজন কেন? আসলে, ওতে বলা হল, দাদারা, বুঝুন, স্বয়ং শঙ্খবাবু কিন্তু এ নাটক অ্যাটেন্স্ট করে দিয়েছেন। এ শঙ্খধ্বনির পর কি আর অবকাশ আছে ভাবার, যে আমরা ফার্স্ট-বেঞ্চি নই? ভালয় ভালয় এখন থেকেই মুগ্ধ হয়ে যান, মুগ্ধবোধ শুরু করি।



জয় গোস্বামীর কাব্যোপন্যাস ‘যারা বৃষ্টিতে ভিজ়েছিল’ ফিল্ম হল। ফ্রেমে ফ্রেমে তেড়ে বৃষ্টি, এবং ছবি টোটাল জোলো। সিনেমায় তিনটে গল্প: ১) কিঁউ কি সাঁস ভি কভি বহু থি, ২) বড় ভ্যাম্প মেজ ভ্যাম্প মিলে, টেনে নিল অঁথে সলিলে, ৩) শার্টেও ফুটো, হার্টেও ফুটো। প্রথমটিতে জঘন্য শাশুড়ি আর গামবাট স্বামী মিলে পবিত্র বধূকে ছিঁড়েখুঁড়ে দেন, দ্বিতীয়তে প্রচণ্ড স্মার্ট ও সাংঘাতিক বড়লোক দুই শয়তান নারী গরিব কবির প্রেম নিয়ে ছিনিমিনি খ্যালে, তৃতীয়তে এক আলাভোলা অসুস্থ প্রতি দিন, নিয়ম করে, জামার বোতাম উন্টোপান্টা লাগিয়ে অফিসে আসেন। তাঁর শার্ট-বিপর্যয় আর হার্ট-ব্যাদি দৌঁছে মিলে রমণীর মায়া পেড়ে ফ্যালে। ছবিটি বড় পর্দায় বাংলা টেলিফিল্ম। না, তার মানে ইনডোর ও সংলাপ-অধ্যুষিত নয়। তার মানে, লোকে কথা বলে থেমে থেমে, দম নিয়ে। চোখ তুলে তাকাতে ক’য়ুগ ফুটেজ খায়। বিরহী নায়ক গোধূলিলগনে কুলুকুলু নদীধারে দাঁড়িয়ে থাকে। মানে, ট্যালটেলে ঝোল, চাড্ডি পটল চেয়ে আছে। আর সর্বাধিক মানে, প্রতিটি চরিত্র ফিনফিনে পিচবোর্ডের তৈরি। ভিলেন হলে অষ্ট-খারাপ, মল-ঘিনঘিনে, রান্ধস। ভাল হলে হোমোজেনাইজড, পাস্তুরাইজড, নাক্স ভোমিকা থার্ট। আর কবি তো ল্যাডাড্‌সের গাছ। প্রায় মানসিক প্রতিবন্ধী। আগে পাড়ার নাটকে হত, কবি=মিয়োনো মুড়ি। এখানে টিপিকাল ট্যালা কবি শৈশব জুড়ে শুধু ছবি আঁকে, বেলুন ওড়ায়, আর নদীতে এতগুলো কাগজের নৌকো ভাসায়, কোনও ছোট ছেলের অঙ্ক খাতার সব পাতা ছিঁড়ে ফেললেও ওর অর্ধেক নৌকো হয় না। বড় হয়ে সে হয় পূর্ণ হাবা, ভেবড়াগণেশ, ভাল করে কিছু বুঝে ওঠে না, ‘ইয়ে...মানে...আমি তো... মানে...’ মার্কী তুতলে অস্থির হয়, আর ফাঁকা বাড়িতে স্বাস্থ্যবতী প্রেমিকা নিজে থেকে ওষ্ঠ এগিয়ে দিলে বলে ‘তোমার চোখের পাতাটা একটু ছোঁব?’ অন্য দৃশ্যে প্রেমিকাকে স্যাড দেখে তার উক্তি: ‘কারও বিষণ্ণ মুখ দেখলে আমার খুব কষ্ট হয়। তখন আমি চেষ্টা করি নিজের মতো করে তার বিষণ্ণতার কারণ খুঁজে বার করতে।’ ভ্যানতাড়া ছেড়ে স্বাভাবিক একটি ‘তোমার কী হয়েছে গো?’ জিজ্ঞেস করা তার সাধ্যে কুলোয় না। কবি তো। ও দিকে ডার্ক অঞ্চলে? হাড়বজ্জাত

কাকা ভাইঝিকে বেচতে রাজি থাকে, কাকি জা-কে নিংড়ে খাটায়, স্বামী ফুলশয্যার ঘরে ঢুকেই হড়াস করে পাশবিক সঙ্গম স্টার্ট দেয়, বড়লোকের মেয়ে আজ এর সঙ্গে শোয় কাল তার সঙ্গে শোয় পরশু অন্যকে বিয়ে করে, সিগারেট-মদ খাওয়া ট্যাশ মহিলা তেতো গলায় বলে, ‘প্রেম? ভালবাসা? হুঁ!’ শটে: স্বপন সাহা, তৎসম ভার্সন। আর কবিকে ডিচ করা ডাইনিটা কী করে? কবি যে ঘরে ঘুমোয়, সে ঘরেই প্রাণপণ লেসবিয়ান আদর খায় সঙ্গিনীর কাছে। লাও। অথচ বাড়িভর্তি ঘর। লোকে দশ বছরের বাচ্চা শুয়ে থাকলেও অন্যত্র সেক্স করে। কিন্তু এরা নিজেদের ‘দমন করেনি’, ইচ্ছে করেনি বলে। আরে, ভদ্রতা বলে একটা জিনিস নেই? পরিচালক বলবেন, লেখক হবু এ-ই লিখেছেন। তাতে কী? জয় তো অতুলনীয় ছন্দ ভাষা কালোয়াতি দিয়ে কাব্য উতরে দেবেন। সিনে-মাধ্যমে অনুবাদ-সময়ে পরিচালককে তো ব্যাপারটাকে কংক্রিটায়িত করতে হবে, সিনেমার ‘প্রত্যক্ষতা’র কথা মাথায় রাখতে হবে, আক্ষরিক খেলতে গিয়ে ধেড়িয়ে ফাঁক করলে চলবে না। ‘চারুলতা’ করার সময় ‘নষ্টনীড়’-এর ছ’টা অধ্যায় সত্যজিৎ স্ট্রেট ফেলে দিয়েছিলেন, কারণ, ওই ঘটনাগুলি বা চরিত্রের ব্যবহারগুলি ছবিতে বিশ্বাসযোগ্য মনে হত না। লম্বা মানুষ লিখেছেন, ‘...ভাষার গুণে পড়ার সময় এসব খটকা মনে লাগে না; কিন্তু চিত্রনাট্য রচনাকালে যখন মূল কাহিনীর নির্মম বিশ্লেষণের প্রয়োজন হয়, যখন চরিত্রগুলিকে রক্ত-মাংসের মানুষ হিসেবে কল্পনা করতে হয়, গল্পের পরিবেশ চোখের সামনে মূর্ত করে তুলতে হয়...— তখনই এ জাতীয় ত্রুটি চোখে পড়তে থাকে। কাহিনীর অদলবদল যে হয়, তা এই কারণেই...।’ ঝামেলা হল, ভয়েস-ওভারে পদ্য লড়িয়ে দিয়েই কেউ যদি ভাবে, ওয়া, অর্ধেক কৃষ্টি তো মার দিয়া কত্তা, বাকিটা কাঁচা সিরিয়ালের পুর আর ফিটফাট ফোটোগ্রাফির ফোড়ন সাঁতলে দিলেই গরমাগরম আর্ট ফিলিম রেডি, তার মাঝাপনা রোধিবে কে? এই অঝোর জ্যাবড়ামোর মধ্যেও রূপা গঙ্গোপাধ্যায় যা অসামান্য অভিনয় করেন, তাক লেগে যায়। ওইটুকু বাদ দিলে, কবির অবিমিশ্র ঝাড়-সিজন। শঙ্খ ঘোষের বিখ্যাত লাইন ‘কবি সে একলা কাঁদে।’ এই আঘাতে, কবির দোকলা কাঁদার স্কোপ অনন্ত।

৮ জুলাই, ২০০৭

সো লি দে ও গ্লো রি য়া

পৃথিবী গ্রহের সর্ব কালের সর্বশ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র-পরিচালক মারা গেলেন। তাঁর নাম ইঙ্গমার বার্গম্যান। সুইডেনের মানুষ। তিনি জানতেন আত্মার তপতপে ঝিল্লির রং লাল। তাই একটি ছবিতে পর্দা জুড়ে দৃশ্যগুলোকে বার বার লাল টকটকে রঙে ফেড আউট করে দেন। সে ছবিতে এক জন মহিলা মরে গেছে, কিন্তু কিছুতেই যেতে পারছে না। চলে যেতে পারছে না। গুণ্ডিয়ে গুণ্ডিয়ে কাঁদছে।

বার্গম্যান তাঁর আঙুল নির্ভুল রাখেন আমাদের বেদনাদাগে। উনি জানেন, আমাদের ভয়ানক একা লাগে। ভয়ানক। আমাদের হাড়হিম করা ভয় হয়। একা থাকার। সারা জীবন একা থেকে যাওয়ার। আমরা নিজেদের চেপে থাকি। যে ভাবে মানুষ পূজোর গম্ভীর আরতির মাঝখানে বাথরুম চেপে থাকে। আমরা থরথরে ফ্যান্টাসিগুলো, কাঁউকাঁউ আত্নাদগুলো চেপে, ঠুসে, পুঁতে পাতকুয়োর পাঁকে পাঠিয়ে দিই। হাঁপাতে হাঁপাতে উর্ধ্বশ্বাস দৌড়ে নিজেদের প্রেমে ফেলি। তার পর যৌনতায়। চুমু খেয়ে ভাবি, এই তো, দোকলা হলাম, না? কাপড় খুলছি, তার মানেই তো নগ্ন। চামড়ার তলায় আমরা ক্রমাগত নিজেদের লুকিয়ে যেতে থাকি আর ভাবি, কই না, সবই তো ঠিকঠাক, আর তো চিন্তা নেই, এই তো, কোঁচকানো মুখ নিয়ে এসেছে আমাদের বাচ্চা। তা হলে আমি প্রেমের প্রীতির স্নেহের মশারিতে সেফ তো? এই যে ভালবাসার দারোয়ান দিয়ে ঘিরলাম নিজেকে, এ-ই তো চেয়ে গেছি, না? তার পর এসপ্লানেডে চড়া দুপুরে হাঁটতে হাঁটতে আমরা সহসা দাঁড়িয়ে পড়ি। সূর্যের ভল্লের মতোই আমাদের বুকের ভেতরটায় শার্প, ক্ষমাহীন আলোর থাপ্পড় প্রবেশ করে যায়। ‘আমার ভাল লাগছে না’, বিড়বিড়িয়ে বলি। আমার ভাল লাগে না। কিচ্ছু না। বউয়ের মুখ আমার ছাইয়ের গাদায় গুঁজে দিতে ইচ্ছে করে। রিসেপশনের ওই মেয়েটার সঙ্গে প্রকাশ্যে সঙ্গম করতে ইচ্ছে করে। আমার সমস্ত টান মেরে ফেলে একেবারে অন্য জীবনে চলে যেতে ইচ্ছে করে। লাথ খাওয়া কুকুরের চেয়েও একা লাগে আমার। ওই অরক্ষিত মুহূর্তগুলোয় আমাদের পড়ে ফেলেছেন যিনি, ভয়ের তাড়া খেয়ে পালাতে পালাতে ধোঁকার টাটি আঁকড়ে থাকা মানুষকে পরম নিষ্ঠুরতায় ও চরম দরদে কেটে হিঁড়ে খাবলে টুকরো করে তার দাপাতে থাকা কলজে টিপে যিনি বলেন, ‘এইখানে?’ তিনি বার্গম্যান।

হ্যাঁ, মৃত্যুভয় নিয়েও ছবি করেছেন। আপনিও শুনেছেন, কোন একটা ছবিতে যেন মৃত্যু এসে একটা লোকের সঙ্গে দাবা খ্যালে? আবার বিরাট বিষণ্ণ মেঘের নীচে মৃত্যুর হাত ধরেই নেচে চলে সবাই। ট্যাক্সিতে যাওয়ার পথে সৎকার সমিতির গাড়ি দেখলেই সাঁৎ করে আমরা চোখ সরিয়ে নিই না? ওই দৃষ্টি তত ক্ষণে করতলে লুফে নিয়েছেন যিনি,

তিনি বার্গম্যান। বালিশে আমাদের লালা লেগে যাওয়ার নিরালা মুহূর্তটি তাঁর চোখ এড়ায় না।

একলা মানুষের আদুড় গলায় গানের মতো তাঁর আভরণরহিত ছবি আমাদের শেখায় ঈশ্বরসন্ধান। না, এর মানে যিশুবাবার জয় না, এর মানে গম্ভীর পিয়ানোর রিডের মতো দবদবে, প্রহারের মতো মনোযোগী প্রশ্ন: এ জীবনের মধ্যে দিয়ে কোনও উদ্দেশ্য কি প্রবাহিত? এই যে পিলপিলিয়ে চলেছি— হলো বেড়ালের চেয়ে বেশি, কেন্নোর চেয়ে বেশি এর কোনও মানে আছে? কোথাও কি একটা ন্যায়, একটা অভিপ্রায়, একটা শুশ্রূষা বিছিয়ে আছে ছাদের মতো? না কি পুরোটা খামখেয়াল, এলোপাথাড়ি? শুক্রাণু ছিল, ডিম্বাণু ছিল, আকস্মিক গিনিপিগ আছে। ব্যস। তা হলে! এই অনন্ত তছনছের মধ্যে নিজেকে নিয়ে কী করব? কীসে ভর দেব? নীতি-নোঙর নেই, দায় নেই, স্রেফ অনির্দেশ্য আলুথালু? এই থরথরে উদ্বেগ নিয়ে বার্গম্যান যখন নিজেকে তিরের মতো আকুল ছুড়ে দিয়ে অকল্প ছবি করেন— কখনও বলেন ঈশ্বর থাকলেও তিনি লোমশ মাকড়সার মতোই বীভৎস, যুক্তিরহিত, ক্ষতিকর— কিংবা না না, মানুষের ভালবাসার ক্ষমতাই তো ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ— বা দাঁড়াও দাঁড়াও, অ্যাটম বোমের সামনে দাঁড়িয়ে তো ভালবাসার কথা বলা যায় না, তা হলে ভেতরঅন্দর অসহ টাটিয়ে উঠলেও নিজের কাজ করে যাওয়াটাই একমাত্র সমাধান— তা দেখে বহু পণ্ডিত চোঁট মচকান। বলেন, ‘মনস্তাত্ত্বিক সমস্যাকে খামখা ধোঁয়াটে আধ্যাত্মিকতায় ঢেলে দেওয়ার মানে কী? যত প্রফেটীয় ভুজুং! এতে তো জরুরি সামাজিক প্রশ্নগুলোই এড়িয়ে যাওয়া হল!’



সেভেস্থ সিল : মৃত্যুর সঙ্গে হাত-ধরাধরি নাচ

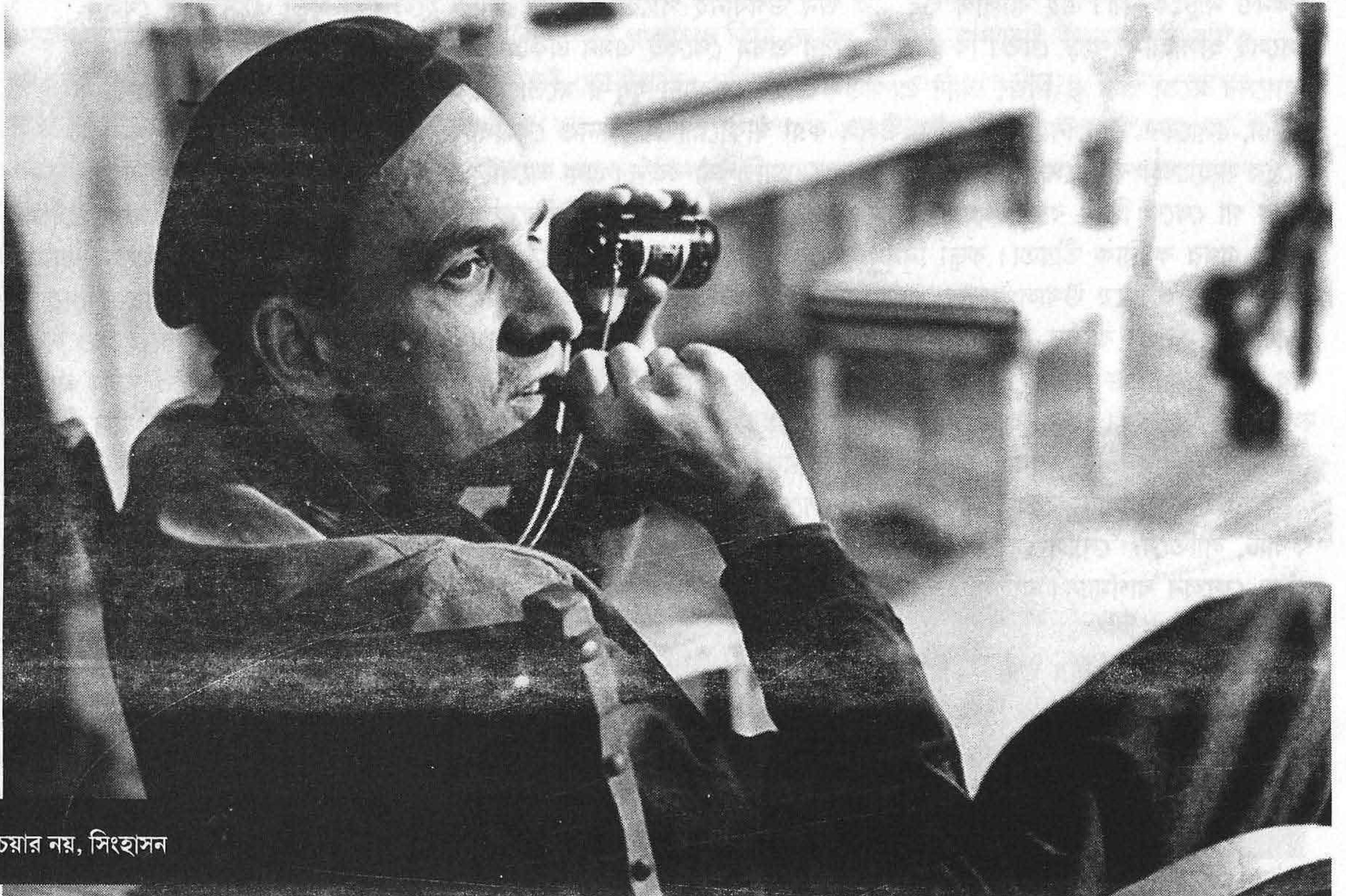
বার্গম্যান বলেন, ‘যে সমস্যাটা আপনি বলছেন রাজনৈতিক, আমি বলছি নৈতিক।’ তিনি তীব্র ইলেকট্রিক শকের মতো ব্যক্তিগত সঙ্কটকে সমষ্টিবাচক প্যারেডে ডলে দিতে চান না। তিনি আমাদের কলঘরে চৌবাচ্চার পাড়ে, নগ্ন, ঘাড় লটকে বসে থাকাটা ধরছেন। আমাদের সত্তার দানাটাকে বুড়ো আঙুল আর তজনীর মাঝখানে চিপছেন। হেডলাইটের আলোয় ধাঁধিয়ে যাওয়া হরিণের মতো, বেপথু, খড়ি-ওঠা লোকের চোখের ডিমের সাদাটা ক্রোজে দেখাচ্ছেন, তা স্থির চেয়ে আমাদের দিকে, যারা নিজেদের দুধু খাইয়ে ভুলিয়েভালিয়ে নিয়ে চলেছি এক সকাল থেকে অন্য সকালে। মিছিল বা ছৌ নৃত্যের শটে কস্মিনে এ জিনিস জন্মাবে না।

এ সব ছবি করতে বার্গম্যান লেখেন অবিশ্বাস্য ডায়লগ। তুরীয়। সে সংলাপ উঁচু তারে বাঁধা, নাটকীয়, কিন্তু কক্ষনও নাটুকে নয়। এই ব্যালাস শুধু এক জন ভগবানই পারেন। এমনি লোক হলে তো মৃত্যু এসে দাবা খেলব বললেই হাসাহাসি পড়ে যেত। কিন্তু উনি ছবির প্রথম থেকেই এমন একটা প্রেক্ষিত তৈরি করে দেন, এমন আশ্চর্য সন্ন্যাসের মতো শুদ্ধ ও রিক্ত, আদি প্রাকৃতিক এবড়োখেবড়ো ধুধু-র মতো নিরলঙ্কার, যাতে একটা গম্ভীর, দার্শনিক সমস্যা, লোকের মুখে নিজেদের ছেঁচে উলঙ্গ করা স্বীকারোক্তি কক্ষনও বেমানান না-মনে হয়। কাজটি করা হয় দু’টি অস্ত্রের সাহায্যে। বহিরঙ্গে পূর্ণ অতিরেক-হীনতা, আতিশয্য-বর্জন। এক অলৌকিক ন্যূনতমতা। ক্যামেরা, সংগীত, সেট, সবার গা থেকে তিনি বাড়তি গয়না কেড়ে নেন। আর একইসঙ্গে, অভিনেতাদের মধ্যে, তাদের সংলাপের মধ্যে, যোগ করেন প্রখর কাব্যিক তীব্রতা। কড়া নির্মম আলোর নীচে তাদের চোখ ঠোঁট দাঁত খুঁজ পুঁজ ঝকঝক করতে থাকে। তারা পর্দাজোড়া মুখ নিয়ে উথালপাথাল, একাচোরা চিঠি বলে যায়। ব্যক্তিগত, তাই সবচেয়ে পবিত্র, মোচড়ান খায় তাদের তলপেট, মেটুলি। বাঘের সাহস লাগে, এ জিনিস করতে। কারণ এখানে সিনেমা করা হচ্ছে না। সত্যি করা হচ্ছে। সত্য। যার জন্য সব ত্যক্ত হয়েছে। সব। শুধু অশ্লীল দেখতে পিণ্ডটা পড়ে আছে, পিছল, ধ্যাবড়া, লাবডুব করতে থাকা একটা দলা। অন্ধ, আতুর। অন্য যে কোনও নশ্বরের হাতে এ প্রোজেক্ট গদগদে, নিঘিন্বে হয়ে উঠত। আর এই জিনিয়াস কী অসামান্য লীলায় তাঁর তরবারি দিয়ে স্বাক্ষর করেন!

আর হ্যাঁ, বার্গম্যান তাঁর স্ক্রিপ্টের শেষে লেখেন SDG। বাখ তাঁর সংগীত লেখার পর এটি লিখতেন। সম্পূর্ণ কথাটি, লাতিনে: ‘সোলি দেও গ্লোরিয়া।’ ‘মহিমা কেবল ঈশ্বরেরই।’ আর, ৬৮ বছর বয়সে, বন্ধুর কাছে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলেন বার্গম্যান। বলেন, ‘জানিস, বাখ এক বার বহু দিন ধরে ঘুরে এসে দেখেন, তাঁর স্ত্রী ও দু’টি সন্তান মারা গেছে। বাখ সে দিন ডায়রিতে লেখেন, ‘ঈশ্বর, আমার আনন্দ যেন আমায় পরিত্যাগ না করে।’ সেই নিঃশর্ত আনন্দ বোধহয় আমাকে এ বার ত্যাগ করছে রে!’ এই আনন্দ=আমোদ নয়, এর মানে প্রতিটি মুহূর্তে, উদগ্র জন্তুর মতো, প্রাণ চেটে নেওয়ার ক্ষমতা। এই প্রাণের প্রতিভা যাতে সহমানুষদের ত্যাগ না-করে: সে পসরা সাজিয়ে বিদায় নিলেন। যাতে, যদি এমন আঁধার দেশে হঠাৎ জেগে উঠি, যেখানে কেউ, কেউই, আমার একটি উচ্চারণও বুঝতে পারছে না, সেখানেও

আমি পেয়ে যাই একটি আঁকড়ে ধরার টেবিল, একটি শিস দেওয়ার সুর, একটি স্বমেহনের মতো একান্ত কখন। বার্গম্যানের ছবি কখনও না-দেখলে, হোমো স্যাপিয়েন হয়ে এই টাইম-স্পেসে বাস করার একটি আশীর্বাদ হারাবেন। তাঁর স্মরণে এই কলামের পক্ষ থেকে, পতাকা অর্ধনমিত।

১২ অগস্ট, ২০০৭



আর্গম্যান : চেয়ার নয়, সিংহাসন

সি রি য়া লে র বা চ্চা কা চ্চা

সাবধানে চলবেন, চোখফোখ ঢেকে, কারণ হাওয়ায় অনিবার উড়ে আসছে রবীন্দ্রসংগীতের গুঁড়ো। কী করা, গ্যাদগেদে বাংলা ছবিতে রবীন্দ্রগানের বান ডেকেছে। ন্যাকা-ল্যাবড়া চিত্রনাট্যকে ‘বিশুদ্ধ উচ্চমার্গ’ ছাওয়া দিতে সহজতম শর্টকাট। নিজে ধেড়িয়ে ফাঁক করব, আর মাঝে মাঝে ডিঙি মেরে তাক থেকে চরণান্মতো নামিয়ে চুবিয়ে নেব, দাড়িভগবান বুকে আছে করবি আমার কী। একটি ছবিতে ব্যর্থ আত্মহত্যা-প্রয়াসের পর এক নেকুয়া বলে, ‘পারলাম না, পাখির মতো উড়তে পারলাম না’, একটু পরেই আবহে রবীন্দ্রসংগীত, আর এক ছবিতে তো সেরিব্রাল অ্যাটাক-ই হয় ‘তবু মনে রেখো’ গাইতে গাইতে। তবে ওই গানটার জন্যই অ্যাটাকটা হল কি না, বলা শক্ত।

‘অনুরণন’-এ নায়কবাবু ছুকুমুনা কাব্যশিশু। শুধু যে রোদ-বৃষ্টি দেখে ক্ষণে ক্ষণে হরষে শিউরে ওঠেন তা-ই নয়, আবার গাছের গা শৌকেন, অনন্তের গন্ধ পাওয়ার জন্য! নাকে কাঠপিঁপড়ে কামড়ে দেয় না, বাপের ভাগ্যি। ‘বালিগঞ্জ কোর্ট’-এও, কী আশ্চর্য— গাছবুড়ো! ছেলে বিদেশ চলে যাওয়ার দুঃখে দিবারাত্র প্রাণপণ গাছ পৌঁতেন, কারণ ‘গাছই শুধু সরে সরে যায় না। কখনও ছেড়ে যায় না।’ সত্যি, বেচারি গাছ! প্যানরপ্যানর থেকে বাঁচতে পৌঁ দৌড় দেওয়ার জো-টি নেই। আর জো নেই ফিলিম-সমালোচকের। ওই নির্বোধ হাজারির মধ্যে সিটে পেছন সঁটে বসে থাকা যে কী অভিশাপ! গাছ-কপাল!

তবে, কলমটির প্রতিবাদের একটা রাস্তা আছে। কিছুটা না-লেখা। ইগনোর দেওয়া। কুট কোশেচনটি কুট করে কামড়ানো: একটি নগণ্য, অগা বস্তু নিয়ে কাঁড়ি লিখলে, উন্টে তাকে পেলায় পাত্তা দেওয়াই হয় না কি? শুনেছি ফ্রাঁসোয়া ত্রুফো একটা ফিল্ম-রিভিউ লিখেছিলেন: ‘নষ্ট করার মতো তিন ঘণ্টা হাতে থাকলে, ছবিটি দেখুন।’ ব্যস। হালফিল বাংলা সংস্কৃতির ক্ষেত্রে পস্থাটি ফলোযোগ্য। যে সব আর্টছবি গজাচ্ছে, তার জন্য সামারি বাড়াবাড়ি, প্রেসিও বেশি। শ্রেফ দু’কথায় প্রকাশ: ‘দেখবেন না। এরা সিনেমা নয়।’

তার চেয়ে আসুন হোর্ডিং-এ মোবাইল কোম্পানির বিজ্ঞাপন নজর করি, ছোট্ট মেয়ে সুপের বাটি উপুড় করে শেষটা খাচ্ছে, মুখটা পুরো ঢেকে গেছে। আহা, খুকির বাড়ির লোকের কী কষ্ট! বুক ফুলিয়ে বলবে কী করে, ‘আমাগো মেয়ে মডেল ছয়া’? মুখই দেখা যাচ্ছে না! তার চেয়ে, যা মোবাইল ফাটার জমানা পড়ল, কালীপুজোর আগে বরং নয়া অ্যাড। ‘অমুক মোবাইল: বুড়িমা চকলেট বোমের চেয়েও জোরে ফাটে।’

আঃ, কী হল? খোঁচাচ্ছেন কেন? বল্লম না, বাংছবি নিয়ে লিখব না? শ্রেফ জেনে রাখুন ‘অনুরণন’ গালগলা ফুলিয়ে

তুমুল বৈপ্লবিক থিম ছাড়ল: নর ও নারীর মধ্যে এমন সম্পর্কও হয়, যেখানে যৌনতা নেই, কিন্তু মানসিক নৈকট্য আছে! ভাবা যায়! প্লেটোনিক! মানে, প্লেটো নিক, অ্যারিস্টটল নিক, আমি নেব না! কী অভিনব, ছলোছল, ডিপ! আর ‘বালিগঞ্জ কোর্ট’ এক আশ্চর্য বিল্ডিং, যেখানে প্রতি ফ্ল্যাটে বাপ-মা’কে ফেলে সন্তানরা বিদেশ গিয়ে ফুর্তি মারে, আর সবক’টা বুড়োবুড়ি সারা দিনমান, প্রতিটি মুহূর্ত, সেই দুঃখু ঘেনিয়ে জাবর কাটে, কাঁদে, দেখন-হাসি দিয়ে বেদনা চাপে, টানা বিলাপ গায়। এমনকী প্রতিবেশীরও উক্ত দশা! সিনেমার খাতিরে গোটা পাড়াকে ম্যাদা বৃদ্ধাশ্রম বানানো সোজা কথা না। দুটি ছবিতেই অভিনেতাদের মধ্যে থেকে খারাপতম অভিনয় ছেঁচড়ে বের করা হয়েছে (সব্যসাচী চক্রবর্তী অতটা পারেননি, ভাল করে ফেলেছেন)। ‘অনুরণন’ স্মরণকালের মধ্যে সবচেয়ে জঘন্য সংলাপের ট্রফি নিতে না নিতে তার ঘাড়ে ঝাঁপিয়েছে ‘বালিগঞ্জ’, হেথা কেউ ডায়লগ বলে না, বলে হিতোপদেশ-নিবন্ধ, ওয়াল-ম্যাগাজিন টাইপ বালখিল্য হেঁচকি।

‘অনুরণন’-এ নবীন দম্পতি যেন হাতিবাগান থেকে কেনা জোড়া বদ্রিপাখি। পেঁয়াজ বা মাজন নিয়ে তাদের মাথাব্যথা নেই, সারাখন পদ্য বলে, গান গায়, মহান উপন্যাস পড়ে, এ না-খেলে ও হাতে করে খাইয়ে দেয়, এ বলে ‘তুমিই আমার পৃথিবী’, ও বলে, ‘তোমায় প্রাণভরে খেতে দেখলেই আমার কেমন খাওয়া হয়ে যায়।’ ‘বালিগঞ্জ কোর্ট’-এ স্টারিং প্রবীণ দম্পতি, এ স্যাড ‘দিনগুলি মোর’ শুনলে ও থামিয়ে দিয়ে ‘আনন্দধারা বহিছে ভুবনে’ শুরু করে, এ বলে ‘আমাদের গেছে যে দিন একেবারেই কি গেছে’, অমনি ও সন্মোহে টাকে হাত বুলিয়ে, ‘রাতের সব তারাই আছে...।’ এ রবীন্দ্র-প্রবন্ধ জোরে জোরে পড়ে শোনায় সনতারিখ রচনাস্থানসুদ্ধ, ও তক্ষুনি র্যাক থেকে চৈতন্যচরিতামৃত পেড়ে আনে। তা ছাড়াও হেভি ফিলজফি হ্যাজ, শ্বশুর বলে ‘টাকাপয়সা থাকলেই কি ধনী হওয়া যায় বউমা’, বিদেশ গিয়ে বউমা বলে, ‘মানুষ ঘড়ি আবিষ্কার করেছিল, আজ ঘড়িই মানুষকে শাসন করছে।’ ডিপ, বলিনি?

থাক এ সব, নয়া সংবাদ: আগাথা ক্রিস্টি-র ৮৩টা গল্পকে কমিক্স করে বাজারে ছাড়া হচ্ছে, চিনের কমিউনিস্ট পার্টি-র ১৭তম কংগ্রেসের প্রাক্কালে রাষ্ট্র থেকে বলে দেওয়া হল এটা ‘আউটস্ট্যান্ডিং গোল্ডেন ডোমেস্টিক ফিল্ম এগজিভিশন মাস্ট্র’, চিনা দেশপ্রেমমূলক ছবি ছাড়া কিছু দেখানো যাবে না!

ফের কী জিগেস করছেন? বঙ্গুছবি দেখে লোকে কী বলছে? আরে ভাই, লোকের নেত্র ডবডব কচ্ছে, একট্রা রুমাল কিনতে হচ্ছে। না, তার মানে এই নয় যে বাঙালির রুচি নেমে গেছে। কক্ষনও না। যা কুয়োর তলানিতে ছিল, তা আর নামবে কী করে? চিরকালই ‘পথের পাঁচালী’র চেয়ে ‘বেদের মেয়ে জোসনা’ অনেক বেশি লোক অনেক বেশি আনন্দ নিয়ে দেখেছে। তফাত হল: অ্যাডিন কেউ ‘বেদের মেয়ে’কে অপূর্ব/গভীর/ভাবনা-জাগানিয়া ছবি বলেনি। আস্তে আস্তে সে পচনটাও ধরছে। সিরিয়াল চলে এসেছে যে। এই ফিল্মগুলো সিরিয়ালের অবৈধ সন্তান। সিরিয়াল-সংস্কৃতি শুধু যে বাহ্যবিচার না-করে লাল ফেলতে ফেলতে সমস্ত মালই গিলতে শেখায় তা-ই নয়, সে দেয় এই ভয়ানক

আশ্বাস: ছবি তৈরির জন্য আর মগজ খাটানোর দরকার নেই। ক্যামেরা কোথায় বসবে, অভিনয় কোন পর্দায়, সংলাপ কী করে লিখতে হয়, কী ভাবে দৃশ্য মৌলিক হবে— গুলি মারো। জাস্ট স্টার দাঁড় করাও, কথা বলাও। বাড়তি পয়েন্ট চাও? বাঙালিকে ‘মেসেজ’ দাও। আধো-আধো, মুখে-দই-উঠে-আসা সারল্য, ট্রেনের ভিথিরি যেমন কুঁতিয়ে কুঁতিয়ে কাঁদে, গোদা, হড়হড়ে বাণী। ব্যস, ও-ই দর্শন বলে চলে যাবে। ভয় কী, তুমিও অশিক্ষিত দর্শকও অশিক্ষিত, একেলা গাথাটির নহে তো ছবি!

যাক, বলেছি না, এ সব নিয়ে আদৌ লিখব না? বরং স্পেনের ‘টোম্যাটিনা’ উৎসবে...

৯ সেপ্টেম্বর, ২০০৭

স ক ল কে পু জো র :-)

চরাচর চার্জড! প্রখর অন্ত্যমিল হোর্ডিং-এ: ‘পুজো মানেই গতানুগতিক আড়ম্বর? সময় এসেছে নতুন কিছু আরম্ভ-র’! বাইকের বিজ্ঞাপনও জুলজুল: গণেশ ড্রাইভ করছেন, পেছনে মা দুগ্ধা। ফেমিনিস্টরা খেয়াল করুন, অসুরদলনী মহিলাকেও স্পিডে যাতায়াত করতে গেলে হতে হবে পুরুষের পিছে পিলিয়নায়িত, আর পুলিশের গোচরে আসুক, দু’জনের কারও মাথাতেই হেলমেট নেই! একটি শপিং মল তো জিন্স পরা দুর্ধর্ষ নওজোয়ানকে ময়ূরের গায়ে হাত বোলনরত কাঙিক, হাফপ্যান্ট পরে খেলনা-গদা নিয়ে মায়ের কোলে গ্যাঁট বালককে গণেশ রূপে তোড়ে উপস্থিত করছে, দারুণ। এ জিনিস শারদীয়ার কভারে বছর বছর দাপাচ্ছে— এক পুজোসংখ্যায় এ বার যে ভাবে নিম্নবর্গীয় তরুণী দুগ্ধা কাঁখে বাচ্চা সামলে আক্রমণাত্মক কাস্তে হাতে ঘনায়মান, মনে হয় অসুরগণের টিকি পশ্চিমবঙ্গের নির্দিষ্ট স্ট্রিটে দিব্যি মিলবে! কিন্তু হায়, এ হর্ষসিজনে আমাদের সবার প্রিয় থ্যাভড়া কুকুর বোধহয় বাতিল হয়ে গেল— লাল পাপোশে গা কাঁপিয়ে জল ঝাড়িয়ে, প্রান্তরের ছোট্টাছুটি কেড়ে নিয়ে টকটকে লাল খোঁয়াড়ে কষে বন্দি করে— ঘাড়ে ধরে তার ‘দি এন্ড’-এর জোগাড়যন্ত্র চলছে মনে লয়। কী অত্যাচার! পুজোর আগে যে কাউকে ছাড়িয়ে দিতে নেই, বিদেশি কোং সে ঐতিহ্যটুকু হোমওয়ার্ক করেনি? তবে আশা করা যাক, বাথরুম গেছে, পরে আনন্দিত থাবায় ছুটে ফিরে আসবে!



শহরে মাত্র ক’দিনের জন্য ভিজিট দিল এক বাঘা-স্পর্ধিত ব্রিটিশ ‘মকুমেন্টারি’ (মানে, ‘মক-ডকুমেন্টারি’, যে ঘটনা আদৌ ঘটেনি তা নিয়ে নির্মিত ‘তথ্যচিত্র’), নাম: ‘ডেথ অব আ প্রেসিডেন্ট’, যাতে দেখানো হল জর্জ বুশ ১৯ অক্টোবর ২০০৭-এ একটা হোটেলে বক্তৃতা দিয়ে বেরোবার সময় গুলি খেয়ে খুন হলেন! হত্যাকারীকে ধরা গেল না, সামনে দিয়ে একটা যুদ্ধবিরোধী মিছিল যাচ্ছিল, সেখান থেকেও কেউ এ কাজ করতে পারে। খুনের পর যা হয়, গ্রেফতার চেয়ে উত্তাল হয়ে ওঠে দেশ: ভাই, একটা ভিলেন দাও। থুতু ছেটাই। শেষে ধরা হয় হোটেলের পাশের বাড়িতে কাজ করা এক জনকে, সিরিয়া-র লোক, নাম আবু জিকরি, খুঁজেপেতে দেখা যায় সে এক সময় আফগানিস্তানে ছিল, আর তার বন্ধুবান্ধবের মধ্যে কেউ কেউ হয়তো উগ্রপন্থী। ব্যস, আর পায় কে, একে মুসলিম তায় গেছিলি আল-কায়দার দেশে, তুই খুনি না তোর বাপ খুনি! কোনও প্রমাণ নেই, তবু নিশ্চিত আসামী ঠাউরে তথ্য জোগাড়ে ব্যাক-ক্যালকুলেশন জারি, মিডিয়ায় গণঘেন্না উদ্দীপন চালু, ডিক চেনি নয়া প্রেসিডেন্ট, এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সিরিয়া-কে আক্রমণের



রামায়ণ ৩৩৯২ এ ডি : একটি সংখ্যার প্রচ্ছদ

আটঘাট বাঁধা শুরু। সে অপারেশনের নাম ‘পেট্রিয়ট অ্যাক্ট-III’। ফিল্মটিতে সত্যি ফুটেজ, কল্লিত ইন্টারভিউ এবং বাস্তব ফুটেজের কম্পিউটার-রূপান্তরিত বয়ান, সবের মিলমিশ পেকে উঠে একেবারে থমথম। এফেক্ট-টেফেক্ট দিয়ে খোদ বুশের শটকেই ব্যবহার করে তাঁর হত্যা দেখানো হল, এই স্টান্টবাজি নয়— ছবিটার মেরুদাঁড়া হল তীব্র চোখে-আঙুলপনা: মানুষের মৌলিক অধিকারকে কত অনায়াসে খেঁতলে দেওয়া যায়, কী সহজে জাতীয় ট্রাজেডিকে ব্যবহার করে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের পথ পরিষ্কার করা যায়। আমাদের অসহিষ্ণু অশিক্ষিত অঞ্চলে ভাবতে হবে অন্যও: জলজ্যান্ত রাষ্ট্রপতিকে কোতল করা দেখানো হল, অথচ কেউ কিন্তু এ ছবি ব্যান করার দাবি তুলল না! হ্যাঁ, আমেরিকায় কিছু জায়গায় প্রভূত নিন্দেমন্দ, গুচ্ছ গালি, কিন্তু মিছিল বেরোয়নি, পুলিশ নামাতে হয়নি, সিনেমা হল ভাঙচুর হয়নি। আমাদের এখানে ছাদের সমান লাফ দিয়ে গাঁজলা তুলে পেটাত: হুঁ! আস্পদা! কল্লিত ঘটনা ডকু-স্টাইলে দেখাস কী করে! সত্যের অপমান, শিল্পের অপমান, দেশের অপমান! ডিক চেনি, সিরিয়া, আফগানিস্তান, মুসলিম, কৃষ্ণাঙ্গ, বডিগার্ড ইউনিয়ন— হোলসেল অপমান! মিছিল-পাটকেল-খিস্তি, কুশপুতুল ব্ল্যাকে বিক্রি, এবং মহান জেহাদে পরিচালকের দেশের বিরুদ্ধে ‘পেট্রিয়ট অ্যাক্ট ফোর’!



রাম আদৌ ছিলেন কি না আর বানররা হেঁইয়োপূর্বক সমুদ্রে সেতু বানিয়েছে কি না নিয়ে বিজেপি কিড়িমিড়ি, ও দিকে গত বছরেই রামায়ণ-কে শেখর কপূর আর দীপক চোপড়া মিলে নিয়ে ফেলেছেন ৩৩৯২ সালে! এবং ইহা আঁক্স-যোগ্য। যে কেউ রামায়ণ নিয়ে নিরীক্ষা করতে চাইলে, বড়জোর তাকে টেনে আনবেন বর্তমানে। কিন্তু তার চেয়েও প্রায় চোদ্দোশো বছর বনবাস দিয়ে, ভবিষ্যৎ একটা পৃথিবীতে, যা প্রকাণ্ড পারমাণবিক যুদ্ধের পর ছিন্নভিন্ন, রুক্ষ, সন্ত্রস্ত, সেখানে মহাকাশযান আর ‘পিতাশ্রী’ সন্সোধনকে মিলিয়ে এক আশ্চর্য কমিক্স-জগৎ তৈরি করা, সোজা কথা

না। এতে আছে কাব্যটির সার+কল্পবিজ্ঞানের আশ্চর্য ম্যাজিক! উপাদানগুলোকে ইচ্ছেমত নাড়াচাড়া ছাঁটকাট করা হয়েছে, যা যে কোনও মৌলিক পুনঃকথনের শর্ত। এখানে রাম অমরগড়ের রাজপুত্র। অমরগড়ই একমাত্র শহর, যা সূর্যের আলো পায়। বাকি পৃথিবীটা কালচে, আঠালো, বিষাক্ত। রাবণ ও তার সহচররা কেউ মানুষ, কেউ অর্ধজন্তু, কেউ যন্ত্র। হাবভাব দেখে আন্দাজ হয়, রাবণ আদতে এক সুপার-কম্পিউটার, যা একটা প্রাণে পরিণত হয়েছে। তার ক্ষমতা অনন্ত। সে ও তার সন্তানেরা শুধু শারীরিক ভাবে নয়, চেতনার দিকে থেকেও সংযুক্ত। মানে, তার ছেলেকে মারলে, রাবণ তক্ষুনি তা নিজের ভেতর 'টের পায়'। এবং মুহূর্তে পৌঁছতে পারে সেই স্থানে, কারণ 'লোকদ্বার' তার আয়ত্ত, যে কোনও 'লোক'-এ সে মুহূর্তে আবির্ভূত হতে পারে। রাম অসামান্য যোদ্ধা, কিন্তু অমরগড়ের খর দুর্নীতি বুঝে, এবং বাকি বিশ্বের প্রবল অন্ধকার দেখে সে কিছুটা অবসাদগ্রস্ত। লক্ষ্মণ অতি দুর্মুখ, রামকেও সর্ব ক্ষণ ঠেস দিতে ছাড়ে না। লক্ষ্মণের কাছে সবচেয়ে বড় হল ক্ষাত্রধর্ম, বীরের মতো লড়াই করা। রামের কাছে সবচেয়ে বড় হল, বাঁচা। তার কাছে নীতি একটা অনড়, আখ্যান জিনিস নয়। তাই, 'জনস্থান'-এর সঙ্গে ভয়াবহ রাক্ষসবাহিনীর যুদ্ধে, পরাজয় নিশ্চিত জেনে, সেনাপতি রাম আপস-চুক্তি করে: সমস্ত অধিবাসীকে অক্ষত চলে যেতে দাও, আমরা এ জায়গা তোমাদের সারেভার করে দিচ্ছি। লক্ষ্মণ রামকে বলে 'অ-ধার্মিক', 'ভিতু', অমরগড়ের কাউন্সিল (যার এক জন সদস্য কালনেমি!) রায় দেয় রাম 'বিশ্বাসঘাতক', এবং শাস্তি: চোদ্দো বছরের নির্বাসন। কিন্তু বিশ্বামিত্র ক'দিন পর রামকে এবং লক্ষ্মণকে (যে তদ্দিনে বহু মার্ডার-চেষ্টার ঘা খেয়ে অমরগড় ছেড়েছে) নিয়ে আসেন নতুন মিথিলায়। প্রাচীন মিথিলাকে রাবণপুত্র মেঘনাদ ধ্বংস করার পর এই নয়া মিথিলা তৈরি হয়েছে জলের তলায়, অলৌকিক 'জীবনবৃক্ষ'-র বীজ থেকে। রাজা জনক একইসঙ্গে পেয়েছেন বসুন্ধরার কন্যা সীতাকে, যে 'মায়াবিদ্যা'র আধার। কথিত, সে-ই নাকি পৃথিবীকে বাঁচাবে। তাই রাবণেরও সীতা-অভিযান। কলকাতার ছেলে শমীক দাশগুপ্ত যে এই সাংঘাতিক অন্য রকম, পেলায় পরিণত, অভিনবত্বে উপচে পড়া কমিক্সের স্ক্রিপ্ট-লেখক, গর্বের। বিজেপি ইংরিজি কমিক্স পড়ে না, এ আশ্বাসও ভাল।



শুধু একটা কোলন, একটা হাইফেন, আর একটা ব্র্যাকেট দিয়ে তৈরি সরল ফুটিচিহ্ন :-) ২৫ বছর পূর্তি মানাচ্ছে। তার নাম 'স্মাইলি'। '৮২ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর দুপুর ১১.৪৪-এ কার্নেগি মেলন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক স্কট ই ফহ্লমান একটি মেল পাঠান, সেইটায় তার জন্ম। স্কটবাবু লেখেন, এটা মাথা হেলিয়ে দেখলে, বোঝা যাবে, একটা মুখ হাসছে। আজ এ তিতকুটে জগতে কয়েক কোটি লোক একে দেখেই মাথা হেলিয়ে হাসি-হাসিমুখো হন, স্কট নির্ঘাত মনে মনে তা ভেবেই :-) :-) :-) !

ক ল র তো লা ছ বি

প্রচণ্ড জোর আওয়াজ করুন, উৎসব পালন করুন। বাজি ফুরিয়ে গেলে জোরে দরজা-জানলা ফেলুন। সংস্কৃতিতে ওর বেশি অবদান বাঙালির আর হবে বলে মনে হয় না। এখন একটা খারাপ হিন্দি সিনেমাও একটা ভাল বাংলা ছবির তুলনায় নতুন, আধুনিক। না, শুধু টেকনিকের ব্যাপারে না, সে তো আকাশ-পাতাল পার্থক্য হয়ে গেছেই, চমকে দিচ্ছে মানসিকতার তফাত। বাঙালির একটি সবেধন গৌরব ছিল, আইডিয়াগত দিকে তার শ্রেষ্ঠত্ব বাঁধা। পয়সা নেই, কিন্তু মাথাটা শার্প। সাঁইসাঁই ক্যামেরা চালাতে সে না জানতে পারে, কিন্তু অভিনব চিত্রনাট্য লিখতে হাত তরতরিয়ে তৈরি। এখন সিন টোটাল উন্টো। হিন্দি ব্যাপারে এটা প্রতিষ্ঠিত: অন্য রকম রাস্তার খোঁজ করার লাইসেন্স তোমার আছে। গাদা গাদা ছবিতে প্লট, ট্রিটমেন্ট-এ পেলায় নয়া লাফ। ‘মেনস্ট্রিমেও আছি, মার্জিনেও’ গোছের ছবি মার্শ্টিপ্লেস দাপিয়ে হুপায় হুপায় জন্মাচ্ছে, অনেকে মুখ খুবড়ে পড়ছে, অনেকে ক্ল্যাপ পাচ্ছে, কিন্তু লক্ষণীয়, ট্র্যাপিজে উঠতে কেউ ভয় পাচ্ছে না, সিঁটিয়ে যাচ্ছে না। আর চিন্তার জগতে দেউলে হয়ে একই গাধা পিটিয়ে একই ঘাঁকো সেধে যাচ্ছে নোবেল-নাচন বাঙালি।

না, হিন্দি মাত্রেরি ভাল, তা বলিনি। সে তো প্রদীপ সরকারের ‘লগা চুনরি মে দাগ’ সামনেই রয়েছে। কী আর বলব, ‘পরিণীতা’র চেয়েও খারাপ। না, তা তো হয় না। পরিণীতার মতোই। চমৎকার গান, দারুণ ফোটোগ্রাফি, যাচ্ছেতাই ফিল্ম। এই পরিচালক মনে করেন দেখতে-সুন্দর-সিন আর শুনতে-ভাল-গান অনেকগুলো পর পর জুড়ে দিলেই যোগফল হচ্ছে একটা ভাল সিনেমা। ছবিতে নায়িকার বেশ্যা হয়ে যাওয়ার গল্পটি চমৎকার। সে বাড়িতে ফোন করে মা-কে বলে, মুম্বইতে এমন সব খারাপ লোক, এরা চাকরি দেওয়ার বিনিময়ে রাত কাটাতে চায়। কিন্তু মা তখন কী করেন, স্বামী আই সি ইউ-তে, পয়সা নেই, তাই একটা চেন বেচবেন, কিন্তু সেটা মেঝেতে পড়ে গেছে। এক হাতে সেটা হাতড়াতে হাতড়াতে অন্য হাতে রিসিভার ধরে কি ঠিক করে কিছু শোনা যায়? মেয়ে কী বলছে তার গুরুত্ব না-বুঝেই মা অন্যমনস্ক হয়ে জবাব দেন, ‘যা করার করো, যথেষ্ট সেয়ানা হয়েছে।’ ব্যস, মেয়ে অভিমানে সেই রাতেই এক পিশাচের সঙ্গে শুয়ে পড়ে। বসানো ব্রতকথা, না? মা’র এক পিস হ্যান্ডস-ফ্রি মোবাইল থাকলেই মেয়ের চরিত্র শুদ্ধ থাকত। ইস!

তার দু’দিন পরেই, নিপীড়িতাকে একটি মেয়ে শেখায়, ওরে, পুরুষদের খেলটাতেই পুরুষদের হারা। ওদের সঙ্গে যথেষ্ট শুয়ে পড়, আর পয়সা লোট। ওরা তো আর তোর আত্মাকে স্পর্শ করতে পারছে না। হক কথা। আত্মাই যখন ছুঁতে পারছে না তখন অন্যান্য প্রাইভেটস্ থরলে দোষ কী? তক্ষুনি সে হাইক্লাস ইয়ে হবে বলে, মন দিয়ে দুর্দান্ত হাঁটা, চলা, পোশাক পরা, ইংরিজি বলা, সমস্ত দারুণ শিখেপড়ে, আয়ত্ত্ব করে নিল। আহাঃ, এই প্রগাঢ় ট্রেনিংটা আর এটু আগে দিলি না মা? তা

হলে বেচারী তো বিরাট চাকরিই পেয়ে যেত, এই করে খেতে হত না।

তবে এ সব ছাড়ন, ধাঁ করে দেবে ‘নো স্মোকিং’। এ ঘরানার ছবি ভারতে এই প্রথম। গোটা ছবিটা একটা অ-বাস্তব গল্প বলে, এবং কোথাও সেটার বাস্তবসম্মত ব্যাখ্যা দেওয়ার প্রয়োজনই বোধ করে না। বহু ছবি পৃথিবীতে হয় যাতে বাস্তব-ফ্যান্টাসি মেশানো, অনেক ক্ষেত্রেই বিভাজনটা বোঝাবার একটা চেষ্টা থাকে। কিন্তু এ ছবির কলার তোলা। কী তীব্র রেলা, কী প্রখর স্টাইল! কতগুলো ভিনরঙা আঙ্গিকের বেপরোয়া বিবাহ! এই ফুটে উঠছে কমিক্সের ‘চিত্তা-বাবল’ তো ওই সাইলেন্ট ছবির কার্ড। ফোটোগ্রাফি পুরো বিদেশমায়িক, স্পেশাল এফেক্ট নিখুঁত, আগাগোড়া ঝক্কাস— কিন্তু এ সব কিছু না, আসল: ছবিটা যা ভেবেছেন অনুরাগ কাশ্যপ, কল্পনাভীত। পুরো গল্পটা একটা স্বপ্নের মতো, বা দুঃস্বপ্ন বলা ভাল— যেখানে এক জন চেন-স্মোকার লোক যেই না তার নেশা সারাতে সংশোধন-ক্লিনিকে যায়, তার জীবন আআআআ আর্তনাদে পড়ে যায় এক যুক্তিরহিত অদ্ভুত ঘূর্ণিতে, যেখানে সকলেই বোধহয় তার বিরুদ্ধে, সমস্ত লোক গোপন করছে কিছু না কিছু ষড়যন্ত্রাংশ, এবং সে যা-ই করুক, যেখানেই যাক, নিশ্চিত ভাবে থেকে যাচ্ছে ক্লিনিক-কর্তাদের নজরাধীন।

কাফকা-র প্রভাব যথেষ্ট (নায়কের নাম ‘কে’, এখান থেকেই ‘ট্রায়াল’ মনে পড়া শুরু), ক্লিনিকে গিয়ে সে দ্যাখে একটি ভিডিও ক্যাসেটে তার জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত রেকর্ড করা আছে এবং তা কর্তৃপক্ষের মুখস্থ। এও বোঝা যায়, দ্বিধাদিক ভুলে, এমনকী সচেতন ভাবে গন্তব্যহীন হয়ে পালিয়েও সে কোথাওই যেতে পারবে না, কোথাও না, যেখানে সে সিগারেট ধরালেই বেজে উঠবে না মোবাইল, এবং ঘোষিত হবে না পরবর্তী শাস্তি। গোটা পৃথিবীটাই তার কাছে হয়ে যায় ক্লিনিক, প্রতিটি আচরণ হয়ে যায় কর্তৃপক্ষের অণুবীক্ষণের তলায় নড়াচড়া করা একটি পোকের হাস্যকর পলায়ন-প্রয়াস।

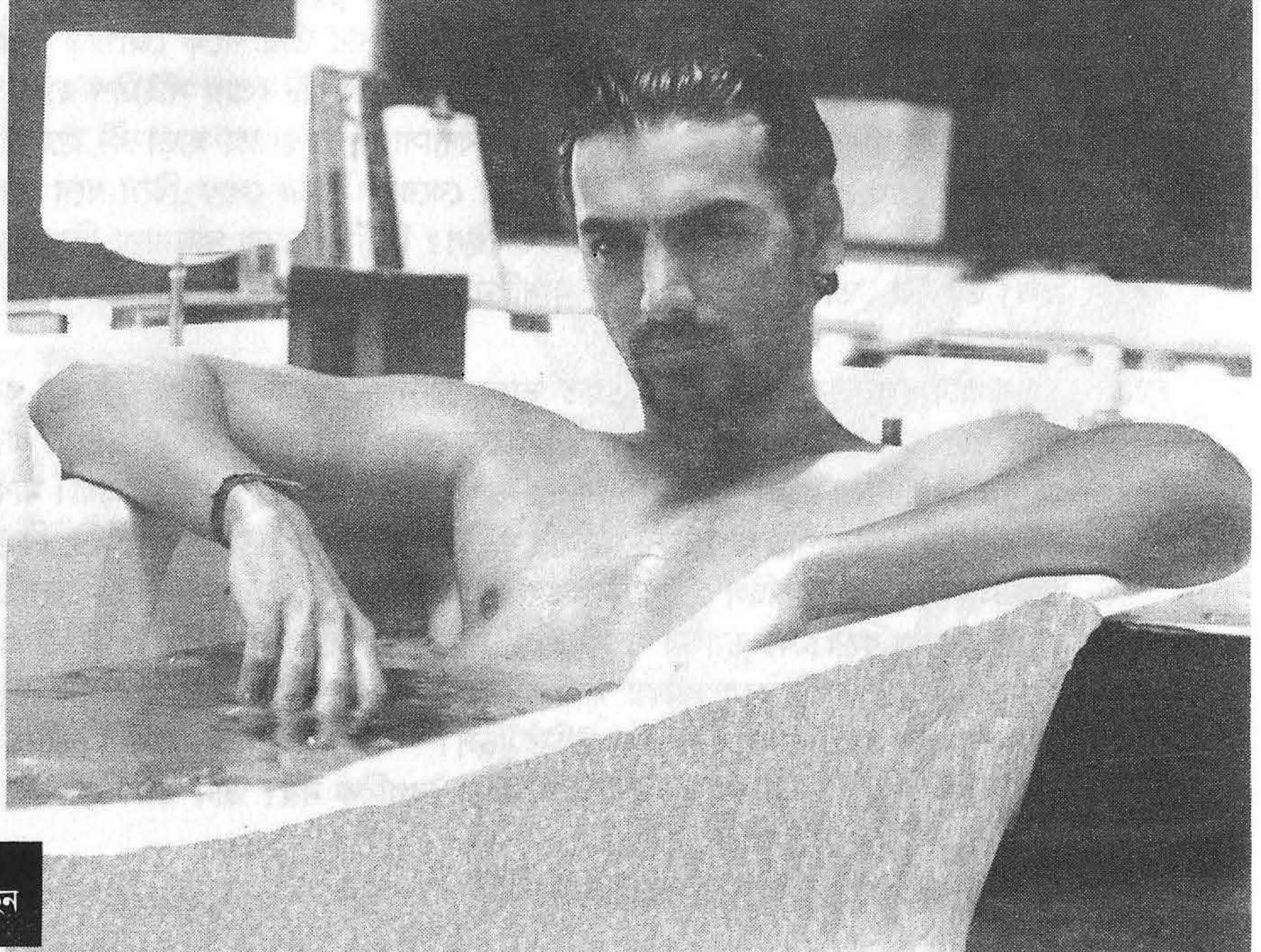
হ্যাঁ, অরওয়েল-এর ‘১৯৮৪’ মনে পড়বে, কিন্তু সবচেয়ে মনে পড়বেই কাফকা-জাত দমবন্ধ টুটিচাপা অন্ধকার, যেখানে সর্ব ক্ষণ অসহ্য বিপন্ন লাগে, বাস্তব মাঝে মাঝেই গুলে যায় উদ্ভট অব্যাক্ষাত আতঙ্কময় পরিস্থিতিতে, টানা, চেনের মতো চলতে থাকে দুঃস্বপ্নের পর আর একটা দুঃস্বপ্নের মধ্যে জেগে ওঠা, যেন একটা ভয়ের সুড়ঙ্গ থেকে পালিয়ে আলো দেখতে পেয়ে আর একটা ভয়ের সুড়ঙ্গে ঢুকে পড়া, খুব, খুউব শিউরানি হয়, চেনা মানুষরা চোখের কোণে হাসতে থাকে ও কাদের যেন ইশারা করে যায় নিরন্তর।

সিগারেট খাওয়ার মানে এখানে সিগারেট খাওয়া না-ই হতে পারে। এর মানে হতে পারে একটি সম্পূর্ণ অন্য ধাঁচের মতাদর্শ/ একটি নিজস্ব কবিতা লেখার স্টাইল/ প্যাশনেট সমকামেচ্ছা/ স্রেফ নিজের শর্তে বেঁচে থাকার চেষ্টা। যার আওতায় লোকে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে বলতে পারে, ‘কেউ আমাকে উপদেশ দেবে না আমার কী করা উচিত, কেউ না।’ তার পর, যেই না সে মেজরিটি-মিডিয়োক্যারের পাল্লায় পড়ে এবং আবেগগত ব্ল্যাকমেলের চোটে (এত সিগারেট খেলে তোমায় ছেড়ে চলে যাব: বউ) নিজেকে সমাজের কর্তা-সেকশনের হাতে এক বার সাঁপে দেয়, ব্যস, তার শক্ত ঘোঁটি ভাঙার খেলা শুরু। প্রথমটা সে ভাবে, বোধহয় উপকে পালিয়ে যেতে পারবে, তার প্রতিজ্ঞা, প্রতিভা, নাছোড় প্রতিরোধ দিয়ে, কিন্তু এক চুক্তি-

সইতেই সে আমূল হেরে বসে আছে। কর্তৃপক্ষ ঠোটের কোণে হেসে তার সমগ্র স্বাতন্ত্র্য আর অহংকে দলে মুচড়ে অসহায় আতুর সমর্পিত পিণ্ড করে ছাড়ে, যখন শেষমেশ অন্যদের মতোই ফুঁপিয়ে ঘষটে একই খেলায় নামা ছাড়া তার আর উপায় থাকে না। অন্যদের কাছে নিজেকে গ্রহণযোগ্য ও নিজের কাছে নিজেকে ঘৃণ্য করে তোলার শুরু হয়। তখন সে বন্ধুদের সিগারেট ছাড়াতে চায়, ফোন করে, তাদের হয়ে ওই ক্লিনিকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে দেয়।

ইতিউতি চুরি আছে। একটি ফ্ল্যাশব্যাক-কে দেখানো হয় ‘সিটকম’ হিসেবে, যার শেষে এন্ড-ক্রেডিটও ওঠে, ধারণাটি টোকা অলিভার স্টোন-এর ছবি ‘ন্যাচারাল বন কিলার্স’ থেকে। ‘অ্যানিভার্সারি-তে কী চাও?’ ‘ডিভোর্স’। ‘অত বাজেট নেই!’ — পুরোটো তোলা গ্রে ও শ্যাক-এর ‘আপ অ্যান্ড রানিং’ কমিক স্ট্রিপ থেকে। মেয়ের লিপে ছেলের গান? অ্যালাঁ রেনে-র ছবি ‘সেম ওল্ড সং’-এ ভূরিভূরি (উল্টোটোও)। কিন্তু কী এসে যায়? এতগুলো জায়গা থেকে উপাদান এক জায়গায় জড়ো করাও সহজ না, আর সব ছাপিয়ে অনুরাগের দুরন্ত মৌলিকতা যে ভাবে জেগে থাকে, তাতে এগুলি বরং অলঙ্কার হিসেবেই চিকচিক করে।

যে কোনও দেশেই এ ধরনের ছবি হলে তা গৌরবের, ভারতের মতো মূলত অশিক্ষিত বাজারে তা যে করা সম্ভব হয়েছে: বিস্ফোরক। প্রতিভা অনেকেরই থাকে, কিন্তু তার সঙ্গে কলজের বাঘা-জোর মিশ্রিত হলে তবে পাঁচিল ভাঙা যায়। ছবিটির যে আকাঁড়া নিন্দে করছেন পণ্ডিতরা এবং ইভনিং শো-য় দেখছে জনা কুড়ি দর্শক, তাতে প্রমাণিত, এটি হজম করা এখনও লোকের পক্ষে শক্ত, কিন্তু এই যে ফলকটি পুঁতে দিলেন অনুরাগ, নিশ্চিত, ইতিহাস তা স্মরণ করবে। যদি ছবি বোঝেন, হাততালি দিন, যত ক্ষণ না চেটো ব্যথা হচ্ছে।



১১ নভেম্বর, ২০০৭

নো স্মোকিং: সিগারেট খেও না, ভগবান দেখছেন

মৌ ল বা দা নু বা দ

একটা কথা দারুণ উড়ছে, ঈষৎ উদারতার পারফিউম আর হাতালিসহ। ‘বাক্‌স্বাধীনতা নিশ্চয়ই মানব, কিন্তু সব কিছুই একটা সীমা আছে। কারও তো অন্যের ধর্মীয় ভাবাবেগকে আঘাত করার অধিকার নেই’! কে বললে? আলবাত অধিকার আছে। যত ক্ষণ না সে প্লেন থিষ্টি দিচ্ছে, যত ক্ষণ তার বক্তব্যকে যুক্তি দিয়ে সমর্থন করছে, তত ক্ষণ এক লেখকের যত খুশি সংখ্যক লোকের, এমনকী পৃথিবীর বাকি সকলের, যে কোনও রকম ভাবাবেগকে আক্রমণ করার পূর্ণ অধিকার আছে। এক সময়, প্রায় প্রত্যেকেই ভাবতেন, বিধবা মেয়ের যদি আবার বিয়ে হয়, তার চেয়ে নোংরা, পারভার্ট ব্যাপার আর কী? যে নারী এক বার এক জনকে শরীর দিয়েছে, ফের অন্য পুরুষকে শরীর দিলে তো সে বেশ্যা! কিন্তু এক জন লোক ১৮৫৫ সালে দু’টি বই লিখলেন, যাতে তিনি বললেন: বিধবার ফের বিয়ে করা উচিত। লোকের ধর্মীয়-সামাজিক-নৈতিক ভাবাবেগে কী প্রকাণ্ড আঘাত! মেজরিটির কথা বলছেন? বিদ্যাসাগর তাঁর পক্ষে জোগাড় করেছিলেন ৯৮৭টি (প্রায় এক হাজার) সই। আর রাধাকান্ত দেব বিপক্ষে জোগাড় করেছিলেন ৩৬,৭৬৩টি (প্রায় সাঁইত্রিশ হাজার) সই! অর্থাৎ, শুধু এই হিসেবেই, সাঁইত্রিশ গুণ মানুষের ভাবাবেগ মনে করছে বিদ্যাসাগর ভুল! তা ছাড়া কী হচ্ছে? রাজ্য জুড়ে বিদ্যাসাগরের নামে কুৎসিত ছড়া কাটা হচ্ছে, গান বাঁধা হচ্ছে, উনি বাইরে বেরোলে প্রচুর লোক ঘিরে ধরে মারার হুমকি দিচ্ছে, অনেকে গুন্ডা লাগাচ্ছে। তা হলে? ব্রিটিশ সরকারের কী করা উচিত ছিল? বিদ্যাসাগরকে ঘাড়ধাক্কা দিয়ে রাতারাতি বাংলার বাইরে পাঠানো উচিত ছিল। উঁহু উঁহু, ‘তা হলে কি তসলিমা নাসরিন বিদ্যাসাগরের সঙ্গে তুলনীয়?’ মার্কো বোকা-বোকা মন্তব্য করবেন না। কথাটা তা নয়।

কথাটা হল: এক বার যদি নীতিগত ভাবে মেনে নিই ‘বেশির ভাগ লোকের আবেগকে যা আঘাত করে তা প্রকাশ করা যাবে না’, তা হলে এই যুক্তিতে, পৃথিবীর কোনও পাঁচিল-ভাঙা, নতুন, বিপ্লবী ধারণাই প্রকাশ করা যাবে না। কারণ যে কোনও অপরিচিত ধারণাই প্রথমটা বেশির ভাগ লোককে আঘাত করতে বাধ্য। মার্কস-এঙ্গেলস-এর কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো, যে বলেছিল, আয় পুঁজিপতিগুলোর টেংরি গুঁড়িয়ে সর্বহারার রাজ্য স্থাপন করি, কিছু কম লোককে আঘাত করেছিল? ডারউইন-এর বই বলেছিল মানুষকে ঈশ্বর গড়েননি, মানুষ বাঁদর থেকে এসেছে! ফ্রয়েড বলেছিলেন সমস্ত পুংবাচ্চা তার মা’কে কামনা করে। কী ভয়ঙ্কর সব অশ্লীল, ঘিনঘিনে, আঘাতকারী কথা! এদের প্রত্যেককেই তা হলে মেরেধরে, যত ক্ষণ না পুরো বইটাই কুটিকুটি করে লুটিয়ে ক্ষমা চাইছেন, হারাস করা উচিত ছিল! নিদেন ‘গভর্নেন্স’-এর দোহাই দিয়ে ‘চল ফোট, অন্য জায়গায় পণ্ডিতি ছড়াবি’ বলা উচিত ছিল।

কী বললেন? তসলিমার লেখা এঁদের মতো বৈপ্লবিক নয়? উনি ভাল লেখকই নন? তাতে কী? বাজে লেখকের

মানবাধিকার ভাল লেখকের মানবাধিকারের চেয়ে কম না কি? আসল কথাটা হল: তুমি যদি আঘাত লাগলেই ব্যান করো, তা হলে তো শিল্প জিনিসটাকেই, মতামত প্রকাশ জিনিসটাকেই বাতিল করে দিতে হয়। ডিসটার্ব করার, উত্তেজিত করার, প্রতিষ্ঠিত বেদীতে ধাক্কা মারার অধিকার শিল্পের আবশ্যিক অধিকার। অধিকাংশের মতামতের সঙ্গে একমত না হওয়ার অধিকার চিন্তাশীল মানুষের প্রাথমিক, মৌলিক, সর্বশ্রেষ্ঠ অধিকার। এক লেখককে ‘তুমি এত দূর অবধি লিখতে পারো, কিন্তু তার বেশি এগোবে না’ বলা, আর ‘তুমি কিছুই লিখবে না’ বলার মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই। কারণ আসলে বলা হচ্ছে: ‘তুমি বাপু বাক্পরাধীন, তবে আমার ন্যাজে পা না-দেওয়া অবধি বাক্‌স্বাধীন।’ এই থ্রেট-সহ ছাড় স্বাধীনতা নয়। খাঁচার মধ্যে পায়চারি করার অনুমতি। বাক্‌স্বাধীনতার কোনও চৌকাঠ হয় না। সীমা হয় না। কারণ তা হলে যে কোনও ক্ষমতামালা গোষ্ঠী (রাষ্ট্র/ মৌলবাদী/ ফাটাকেস্ট ও চ্যালারা) যখন খুশি ইচ্ছেমত চৌকাঠ নির্মাণ করবে, এবং পৃথিবীর যে কোনও শিল্পকেই নিজের সুবিধামত কারও না কারও ভাবাবেগ-আঘাতকারী হিসেবে চিহ্নিত করবে, তার পর গুলি। হিটলারের বিরুদ্ধে প্রতিটি লেখাই নাৎসি-আঘাতকারী। ‘মোরা ভোরের বেলা ফুল তুলেছি’ জগদীশ বসু-আঘাতকারী, কারণ ফুল তোলার মধ্যে নিজ আনন্দের জন্য গাছের অঙ্গ ছিঁড়ে নেওয়ার নির্মম আখ্যান আছে। বিশ্বের প্রতিটি শিল্পীকে অশিক্ষিতের পক্ষ থেকে পর্যাপ্ত লাথ মারার অজুহাত উপ্ত এ যুক্তিতে। তাই মৌলবাদী রাবিশ দাবির পক্ষে যে স্বররা চিল্লান দিচ্ছে, সেগুলো আসলে পচা ডোবার স্থিতাবস্থা বজায় রাখার সমর্থক স্বর। ‘বাঞ্ছাট এড়াও, চলতি মূল্যবোধের আওতায় ক্ষীর খাও, যার যার আখের গুছিয়ে থাকো নিজ কোটরে মিডিয়োকোরিয়ে’ এই ঝামেলা-ভিত্তি, প্রথা-চোতা, অপদার্থ স্বর। ক্ষমতার পা-চাটা স্বর। আজ যদি



ডারউইন-কে নিয়ে ‘লন্ডন স্কেচবুক’-এ ১৮৭৪-এর কার্টুন।
পদ্ধতি বিবর্তিত হয়ে আজ গাড়ি-জ্বালানিয়া!

সরকার দাঙ্গার ভয়ে এক জনের মৌলিক অধিকারের টুটি টিপে দেয়, এবং তথাস্থ পেয়ে যায়, তা হলে কাল মৌলিক অধিকারের টুটি টেপার জন্যই সে ওই দাঙ্গাভয়ের অজুহাত ব্যবহার করবে। তাই বাক্‌স্বাধীনতার অপমান কক্ষনও, কোনও পরিস্থিতিতে, আলিঙ্গনযোগ্য নয়।

‘যার ক্ষমতা আছে আমাকে চুপ করাবার, তার পছন্দের বাইরে আমি কিছু লিখতে পারব না’ এই সেন্সর মেনে লিখলে আর লেখার কী মানে? তার চেয়ে বাঙালির ট্রেডমার্ক: সেফ টার্গেট আক্রমণ করে বিপ্লবী সাজা প্র্যাকটিস করলেই হয়। যত ক্ষণ বই লিখে জর্জ বুশ-কে ঝেড়ে কাপড় পরিয়ে দিচ্ছি, বহুত আচ্ছা, কারণ বুশ ও তাঁর সমর্থকরা দূরে থাকেন, কোঁতকা মারতে পারবেন না। সিপিএম-বিরোধী জনগণকে তোড়ে গাল দিয়ে লিখলে, কেয়াবাত, কারণ তারা সংগঠিত হতে পারবে না। তখন আমি দুর্দান্ত প্রগতিশীল ও স্বাধীন। আর যেই মুসলিম মৌলবাদীরা গাড়ি পোড়াবে দাঙ্গা বাধাবে, অমনি তাদের ভাবাবেগকে আক্রমণ করতে পারব না। এটা তত্ত্ব হতে পারে না। এটা চামড়া-বাঁচানো সুবিধাবাদ। পেটানির ভয় থেকে তত্ত্ব প্রণীত হয় না।

যা বুঝতেই হবে, তা হল, পছন্দসই হয়ে ওঠার সাধনা আর শিল্প এক নয়। কেউ কেউ কাউকে না-চটিয়ে শিল্প করতেই পারেন। কেউ না-ই পারেন। এবং ‘বাক্‌স্বাধীনতা’ ধারণাটির যত্ন করতে হবে বিশেষত দ্বিতীয় ক্ষেত্রেই, কারণ, চমকি: ‘বাক্‌স্বাধীনতা মানে আমার অপছন্দের জিনিস অন্যকে বলতে দেওয়ার স্বাধীনতা।’ আরে বাবা, পছন্দসই কথা বলার জন্য আর স্বাধীনতার দরকার কী? ‘স্যর, আপনাকে সুড়সুড়ি দেব’ বলতে কি বাক্‌স্বাধীনতা তৈরি হয়েছে না কি? ‘মা মরে গেছে কালকে। বা পরশু। কে জানে, জানি না’ বলে এমনকী মা-কে ভালবাসার মতো বিশ্ব-আদৃত গুচি আবেগকেও তেড়ে আঘাত করার স্বাধীনতা দিতে, ও জিনিসটির জন্ম।

স্মর্তব্য: ১) বহু বদমাশ হিন্দু মৌলবাদী সংগঠন আছে, বহু বদমাশ মুসলিম মৌলবাদী সংগঠন আছে। ‘অসাম্প্রদায়িকতা’ মানে দু’জনকেই সমান তিরস্কার করা। এক জনকে ভয় পাওয়া নয়। ২) তসলিমার লেখা যদি খারাপ হয়, যুক্তিগুলো ভুল হয়, পান্টা লিখুন, কাউন্টার-যুক্তি দিন। কার্টুন এঁকে, পথনাটক করে ফাটিয়ে দিন, ওঁর গুপ্তির তুষ্টি করে ছাড়ুন। ঢিল ছুড়ছেন কেন? মনে রাখবেন, আজ কোনও অলৌকিক উপায়ে যদি তসলিমার পক্ষে আপনার চেয়ে বেশি লোক দাঁড়িয়ে যায়, এবং তাদের হাতে বেশি ঢিল থাকে, তখন মারের যুক্তিতে সে ঠিক আর আপনি ভুল হয়ে যাবেন। ওটা সভ্য সমাজের পস্থা নয়। ৩) এই যে এক বার মস্তানির জয় সূচিত হয়ে গেল, ব্যস, ফ্লাডগেট খুলে গেল। এ বার যথেষ্ট ভোটের জুটিয়ে জম্পেশ হাঙ্গামা যদি পাকাতে পারো, তাবৎ শিল্পী যখন খুশি পিংপং বলের ন্যায় বাংলা হতে উৎক্ষিপ্ত। সাপ্তাহিক উৎসব। আজ কার মুন্ডু চাই রে? শাঁওলীর নাটক আমার অপছন্দ, ওঁকে রাজ্য থেকে হাটাও। সুনীলের লেখায় অকারণ যৌনতা থাকে। ওঁকে দেশেই রাখা যাবে না। কালিদাসের বই পোড়াও। ল্যান্ডোয়েজ বুঝতে পারছি না। আর হ্যাঁ, আমাদের নিজস্ব ব্যাপারে তত্ত্ব-টত্ব কপচে যাঁরা নাক গলাচ্ছেন, প্রত্যেকের নাক আমাদের বেজায় অপছন্দ। সরকার নিজ খরচে দ্রুত প্লাস্টিক সার্জারি করিয়ে দেবেন, প্রত্যাশা।

হ্যা প্লি হা তা হা তি

ফ্যাংকলি, যৌনতাহীনতায় কে বাঁচিতে চায়। তাই নয়া বছরকে উলু দিতে রাশিয়া-ব্রাজিল-শনিগ্রহ, ভেগাস ও অন্য ভেগ অঞ্চল, কাঁহা কাঁহা মুল্লুক থেকে এ-ইটুকুনি কাঁচুলিময় মহিলা আমদানি হল, এ রড ধরে বনবন মারে তো ও পেটের ত্রিবলীভাঁজে কয়েন ওন্টায়। সঙ্গে কানের পর্দা রাঁদা ঘষে ফাটিয়ে দেওয়া সংগীত ও চোখ খিমচে ছিঁড়ে দেওয়া আলো-শলাকা: বায়োলজিগত ভাবেই খতরনাক, নান্দনিক-টিক তো ছাড়ন। বছর সাত অ্যায়সান চললে অন্ধ ও বধির যুবভিড়ের জন্য স্পেশাল ‘কানা-কাল গালা নাইট’! সে কী নাচ! কানারা যথেষ্ট পা মাড়াচ্ছেন আর ‘সরি’ বললেও কালারা শুনতে পাচ্ছেন না। হ্যা প্লি নিউ হাতাহাতি। আড়ে তাকান: এদান্তি আমাগো স্নিগ্ধ শ্যামলা পার্টিমগিরাও দুরন্ত ঝটকাপ্রবণ, বয়ফ্রেন্ডের অ্যাব্স-লগ্ন হয়ে তেড়ে ডিসপ্লে দিচ্ছেন ‘উইল পাওয়ার ড্রেস’ (অর্থাৎ পোশাকটি ক্যায়সে সোনার অঙ্গে লেপ্টেসাপ্টে আছে বোঝা দায়, সম্ভবত ‘ইচ্ছাশক্তি’র জোরে)! বঞ্চিত মেজরিটির চক্ষু টাটিয়ে জয়বাংলা, তন্মধ্যে বড় গ্রুপ এখন হবি বলতে ইভটিজিং ধরেছেন, স্বপ্ন মাতাল হয়ে র্যালি নং ওয়ান গতিতে বাইক চালিয়ে বোঁ-ও পার্ক স্ট্রিট ও নারীদের শারীরিক বিরক্তি উৎপাদন স্টাইলদুরন্ত ইয়াংবাবুর ফেভারিট সংস্কৃতি। হরমোনের মন কিছুতে মানে না দিনরজনী, স্পেশালি রজনী, তার মধ্যে আরও একটি বছর গাব্লাস! ইদিকে বুভুক্ষারাজ্যে বিজ্ঞাপন আকাঁড়া আমিষ-মর্মে: ক্লাবে ৩৬-২৪-৩৬ আসিছে পনেরো পিস, আয় তেড়ে লোফার-শিস! আঁশটে উল্লাসের মুক্তাঞ্চলে স্লাইট দুঃখু: এত বিদেশের বেবি কেন স্বদেশের দেবী ফেলিয়া? আমাগো প্রেম কি মেম অপেক্ষা হীন? পুরাকালে আড়খ্যামটা হেল্পেদুল্লে মদীয় স্বজাতীয় রমণীরাই ঝলমলাতেন, নিখাদ বঙ্গআলি বিভঙ্গে পিছলি যেত কামুক পুং রেটিনাজ্যোতি, বিদেশি লাস্যের শরণ নিয়ে তেজ সংগ্রহের দুর্দশা এ জাতের ছিল না। কলকাতার ফুটবল বা বঙ্গের বিনিয়োগের প্রায়, এতেও যদি গুচ্ছ ফরেন ভাঁজ বা ডজ ছাড়া চলতে নারি, প্রাচীন বাইজিমহীর অয়েলপেন্টিংগুলি হাসিতে লাগিবে হাসি।



ইতিমধ্যেই আমরা নন্দীগ্রাম ছেড়ে আমূল ঢলে পড়েছি পিকনিকের দিকে। গণজাগরণের আঁচ দশ-বিশ দিনের বেশি এ জাতের আধারে সম্ভবে না সে শোক-সিন তো প্রমাণিত, ততোধিক দুঃখু: টিভি-র ভাঁড়িয়া নেতৃ হাপিস। আহাঃ, কী ডগডগে চিকুর কেটেছিল কেবল-দুনিয়া! চ্যানেল গাদা গাদা, কিন্তু দু’টি ‘দ’ ও ফের ডবল ‘জ’ লাগানো ‘বিদজ্জন’

আর ক'টি? ফলে এই দেখলেন এই চ্যানেলে অমুক সাঁইসাঁই আগুন ওগরাচ্ছে, অ মা অন্য চ্যানেল ঘুরিয়ে দেখেন হুবহু ওই ভিআইপি, ফের পুনরায় আর একটিতেও সেম! অবিশ্যি শার্ট বদলে যাচ্ছিল। বোঝা গেল, বিদ্রোহীদের কতগুলো জামা! আর বচন, এটিকেট? বাপ! এক কবি তো অনুষ্ঠান শুরুর সময়, অ্যাক্টর যখন সবে আমন্ত্রিতদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছেন, সব থামিয়ে 'আমার একটা কথা আছে কথা আছে' বলে হামলে পড়লেন। কী সে অমোঘ ঘোষণা, যা পরিচয়পর্ব অবধি শেষ হওয়ার তর সয় না? না, তাঁর আজ একটা বিয়ের নেমস্তন্ন খেতে যাওয়ার কথা ছিল, এই অনুষ্ঠানে আসার জন্য তিনি সেখা যেতে পারলেন না, তাই নিমন্ত্রণকর্তার কাছে টিভির মাধ্যমে এক্সকুসে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছেন। কী অশিক্ষিত ঔদ্ধত্য, কী বেআব্রু অভদ্রতা! নন্দীগ্রাম গেলি গেলি এ তামাশা লয়ে ডুবিলি?



শব্দেরও জাতিভেদ হাজ, 'পরিপ্রেক্ষিত' বা 'বিনির্মাণ' যেমন 'খাঁদা' বা 'ওয়াক'-এর চেয়ে বহু উচ্চে বিরাজিত। কিন্তু সবাইকে ভেংচে সহসা টপ-গুরুত্বে লাফিয়েছে 'বাঁদর'। যুগ যুগ ধরে বাপ-মা ছেলেদের বাঁদর বলে থাবড়ালেন, কে জানত তার উকুন বাছলে বর্ণবৈষম্য বেরোবে! অ্যালান বর্ডার আদি জপছেন, 'এটা সংস্কৃতির তফাত!' ঘন্টা। বাঁদর রেসিস্ট কথা নিশ্চয়ই, কারণ প্রাণীটি তো হোমো স্যাপিয়েন রেস-এর নয়। কিন্তু অ্যাদুর মনোযোগ যদি তার কৃষ্ণবর্ণের প্রতি ধাবিত, সেও তো 'অঙ্গবৈষম্যমূলক', কারণ মুখ ছেড়ে তার নিতম্বের দিকে ফোকাস করুন: গোরা কেন, টকটকে লালচে রটাতেও ক্ষতি নেই। উন্টে এ বার যদি 'পার্থ-এ দাপিয়ে খ্যালো' বাক্য শুনে 'ভারতের মহাকাব্যিক ঐতিহ্যকে অপমান!' বলে চিল্লান শুরু করি, (অর্জুনের বুকে দাপাবে কোন শালা বিদেশি ম্লেচ্ছ?), বাউন্ডারি পেরিয়ে কাঁহা পড়বি, জানস?



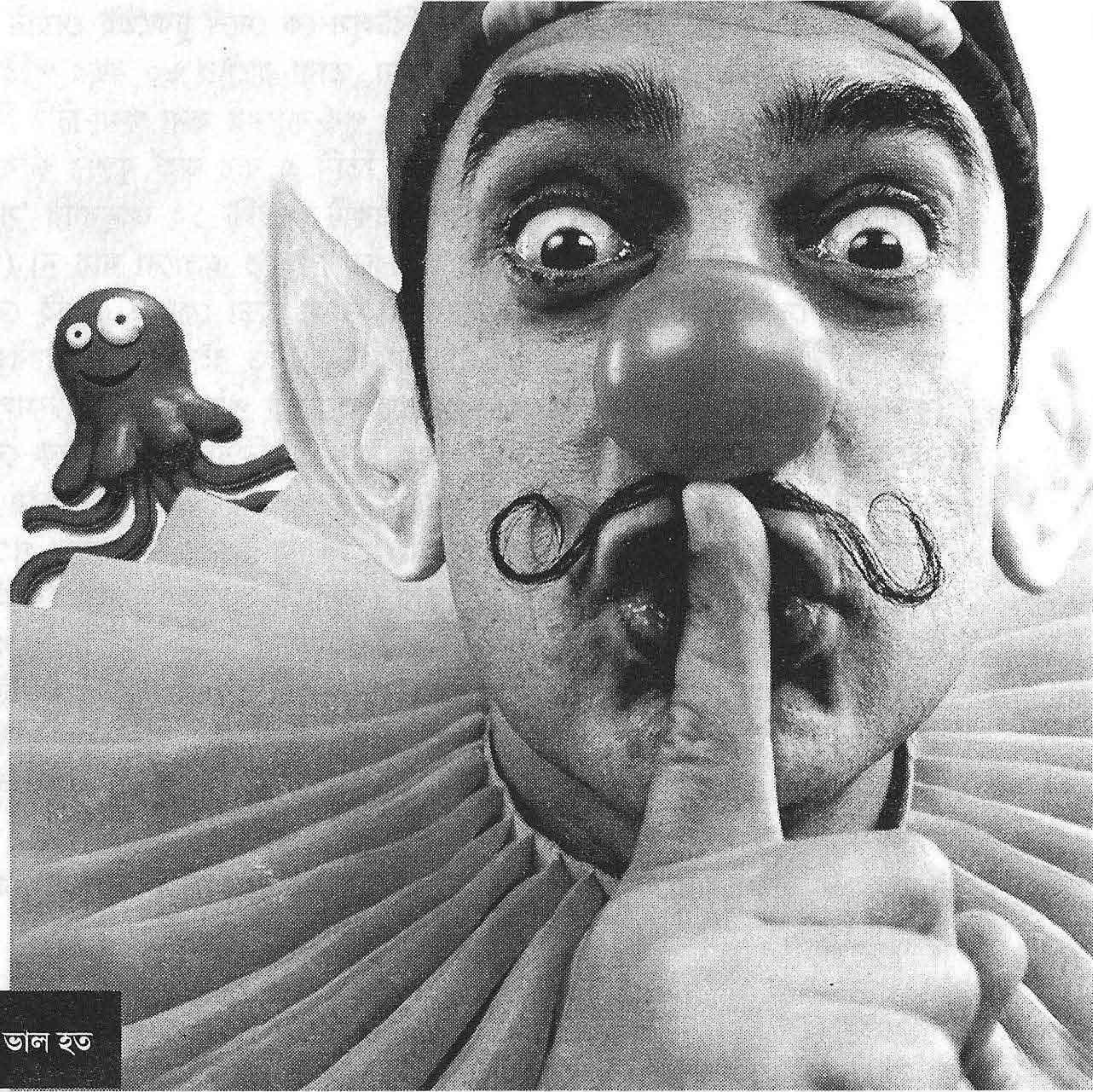
'তারে জমিন পর' দিব্যি চমৎকার, যত ক্ষণ না আমির গোলা লাল নাক লাগিয়ে পর্দায় হেঁইয়ো। প্রথমার্ধে বাচ্চার অন্দর-জগৎ এমন দরদে+প্রতিভায় উন্মোচিত, কখনও চমক জাগবে, ইরানি ছবি বুঝি! গর্তে ভরা কাদাজল বুকে ধরে সূর্যকে, চাকা তার ওপর দিয়ে চলে গেলেই অমনি জল কেঁপে সূর্য টুকরো টুকরো: এ ডিটেল-চক্ষু মর্ডান ভারতে সম্ভবে! নায়কের ভূমিকায় দরশিল সাফারি যা অতুলন অভিনয় করেছে, অদ্যাবধি এ দেশে কোনও শিশুশিল্পী পারেনি (অপু/দুর্গা/মুকুল... মনে রেখেই)। তিন-চার রকম কেঁদেছে সে। হাউহাউ তীব্রতায় আক্রোশ/অসহায়তা/মা'র বিশ্বাসঘাতকতায় অসহ্য অভিমান/ স্বীকৃতি পেয়ে উছলে ওঠা, এমন নিক্তি মেপে নিখুঁত মিশিয়েছে, অ্যাক্টো-পাঠ নেওয়া

জরুরি ছিল আমিরের, যাঁর এন্টি নির্বোধ জোকারীয়, হাবভাব পুরুষ্টু শশার ন্যায় পুষ্টিকর ও পানসে, এবং তার পর থেকে মেসেজ-বাটখারায় ছবিটি ‘ডিসলেক্সিয়া কাহাকে বলে? কী তাহার প্রতিরোধ? ১২+৯’। ভীষণ মানবিক, বোরিং ও রদ্বি ফিলিমটির ঝাড়া আধ ঘন্টা কেটে, চিত্রনাট্যে মিশন গুললেই জ্ঞানগাম্বু হয়ে যায় না: হলিউডের কাছে শিখে, খুরপি হাতে বীজ রোপণ করতে করতে শিশু মানুষ করা নিয়ে বক্তিমের ছোঁচা-সিম্বল এড়িয়ে, একলপ্তে মানসিক প্রতিবন্ধী শিশু ও শিশুশ্রমিকের সমস্যা মেলাবার ল্যালা বুদ্ধিমি না করে, স্ল্যাপস্টিক ক্রমাগত দেখালে হাসি পায় না হাই ওঠে বুঝে, পরের ছবিটায় হাত দিলে— নক্ষত্র হয়তো জমিতে আছড়াবে না।



আজ, যখন রিকশার পিছনে লেখা হচ্ছে
‘ভোলার রকেট’, রাজনৈতিক দল প্রাণপণ
যুক্তি খাটিয়ে লিখছে ‘চীনের দেওয়া কাস্তে-
হাতুড়ি/পাকিস্তানের তারা/এর পরও কি
বলতে হবে/দেশের শত্রু কারা?’, টিভি-তে
শিক্ষিত লোক বলছে রবীন্দ্রবোধের
অবক্ষয়েই শেষ অবধি শান্তিনিকেতনেও
এমন কাণ্ড ঘটল, (যেন বাথরুমের বাইরে
দাঁড়িয়ে ‘খোলো খোলো দ্বার’ চুটকি-চর্চার
সন্তান এই প্রেম-জনিত মার্ডার!)— তখন
এ তুঙ্গ গবা-জমিতে নববর্ষে আর কী
ফলবার আশা, হ্যাপি নিউ হাদামি ছাড়া?

১৩ জানুয়ারি, ২০০৮



ন্যা নো ত ম ক্যা লি নে ই !

আজ, যখন একটা এস এম এস চুটকি ('মাংকি বলেনি, তেরি মা কি... বলেছে') বাঁচিয়ে দিল এক আস্ত বোলারের কেরিয়ার, মঙ্গলগ্রহে দেখা গেল থেবড়ে বসে আছে নগ্ন মহিলা (ফেমিনিস্টরা কাঁউকাঁউ ভিন্গ্রহীদের ওপর: 'প্ল্যানেট পান্টায় তবু মিনসেদের নাল পড়া থামে না!'), জেমস বন্ড পরের ছবিতে বিয়ে বসতে পারেন বলে হিন্ট দিলেন সহ-অভিনেত্রী, ৪৩ বছর আগে যে ইজরায়েল বিটল্‌স-কে দেশে ঢুকতেই দেয়নি তাদের উস্কো চুল ডেঁপো চলন চটুল গানের চোটে যুবসমাজ উচ্ছলে যাবে আশঙ্কায়, তারা রাষ্ট্রের ৬০ বছর পূর্তি উপলক্ষে আমন্ত্রণ জানাল বিটল্‌স-এর জীবিত সদস্যদের (ম্যাকার্টনি ও রিংগো) এবং পূর্ব-ব্যানের জন্য ক্ষমা-চিঠি দিল চার জনকেই (লেনন এবং হ্যারিসনের ক্ষেত্রে আত্মীয়দের), অলিভার স্টোন বললেন তিনি এ বার জর্জ বুশের জীবন নিয়ে ছবি করবেন এবং উঁহ মোটেই নেতিবাচক লেন্স সহকারে নয়, আমেরিকায় একটি কাউন্টি ১২ জানুয়ারি 'সংস্কৃত দিবস' উদযাপন করল, বলল হিন্দুত্ব যে ভাবে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ছে দেবভাষার গুরুত্ব কিছুতে এড়ানো যায় না (শুনে নির্ঘাত আমাগো বুড়োরা 'দ্যাখ দ্যাখ সাহেবদের দেখে শেখ উঃ সংস্কৃতকে স্যাংস্ক্রিট ডাকা ছাড়া কোনও দোষই নেই'), ব্রিটেনে যুগ যুগ জনপ্রিয় ছোটদের গল্প 'থ্রি লিটল পিগস' নিয়ে তৈরি ইন্টারঅ্যাক্টিভ থ্রি-ডি বইকে সটান খারিজ করা হল কারণ 'শুয়োর নিয়ে তৈরি কোনও কিছু একটি নির্দিষ্ট সম্প্রদায়কে আঘাত করতেই পারে' ও পলিটিকাল কারেক্টনেসের নচ্ছার ধ্বজা স্বাভাবিক বোধের পেটে গেঁথে দেওয়া হল আরও এক বার, ইউনিভার্সাল মিউজিক কোম্পানি মধ্যযুগীয় স্তোত্রগীতি 'গ্রেগোরিয়ান চ্যান্ট'-এর অ্যালবাম বের করবে বলে বিজ্ঞাপন দিল 'গাইয়ে সন্ন্যাসী' চেয়ে (যেন ভক্তিরসের ফিলিমে লতাকে ছেড়ে মা সঙ্গীতময়ীকে দিয়ে প্লে-ব্যাক করানো ভাল), সালমা হায়েক জানালেন পরের ছবি 'সার্কাস অব দ্য ফ্রিক্স'-এ তিনি অভিনয় করছেন দাড়িওলা মহিলার ভূমিকায় (ভয়ানক আঁতেল মহিলা বোধহয়!), বিল গেটস জুলাই মাসে স্বেচ্ছা-রিটায়ার করবেন বলে একটা ছোট সাড়ে আট মিনিটের মজার ছবি তৈরি করালেন যাতে দেখানো হল তিনি এ কাজ ছেড়ে কী আকুল হয়ে দোরে দোরে ঘুরবেন, স্পিলবার্গের কাছে অভিনয়-অডিশন দেবেন, বোনো-কে গিটার শুনিয়ে 'ইউ-টু' ব্যান্ডে ঢুকতে চাইবেন, হিলারি ক্লিন্টনের কাছ বায়না বাগাবেন ওরে পলিটিক্সে চাস দে, শেষমেশ কিছু তো জুটবেই না, এমনকী তাঁকে নিয়ে বানানো ফিল্মেও দেখা যাবে তাঁর ভূমিকায় জর্জ ক্লুনি, এবং অকল্প-বড়লোক হয়েও এই আত্ম-খ্যাখ্যা খ্যামতার জন্য গেটসবাবুকে আমাদের কুর্নিশ জানাতেই হল— তখন, এরোপ্লেনের রাস্তা অবধি আটকে অযুত নিযুত হৃদয়-শেপ লাল্লাল গ্যাসবেলুন লাফিয়ে ঘেমে নেচে ঘোষণা করল 'প্রেম দিবস পথার রহে হ্যা-য়' এবং ক্লিক শুরু

হয়ে গেল বৃন্দগান এই শুভদিনে অবিশ্বাস্য ছাড়ে সঙ্গীকে দিন এই আইপড ওই বোলাদুল সেই হাতঘড়ি অমুক চশমা তমুক বিটনুন কামুক কভোম, আর অমনি সমস্ত সোমন্ত যুগল ‘ঠিক ওই রকম করে প্রেম মানাতে বলেছে বিজ্ঞাপনদাতা ভাইয়া, নইলেই তুমি গাঁইয়া’ গাইতে গাইতে কাঁকাল ব্যাকাল আর টিভি চ্যানেল তাদের খপ পাকড়ে বলল রে দিওয়ানা এস এম এস কর স্ক্রিনের নীচে চলন্ত ব্যান্ডে তোর প্রেমবার্তা ডিসপ্লে ঘটবে এবং ঝটিতি লেখা হল দরদ-ডুবু ‘তুমি আমার প্রাণ, তুমি আমার মান, তুমি আমার ঘ্রাণ, তোমার ভালবাসায় আমার গঙ্গান্নান’, দড়াম করে বোঝা গেল: গঙ্গায় কেন পলিউশন বাড়ছে!



বাজার এখন নিঃশর্তে জিতে হুররে, আপনার বাড়ির পাশের বনতুলসীর ঝাড় ফুঁড়ে উঠে আসছে অতিকায় মহাকাশযানের মতো ধাঁ-টেকনো শপিং মল, মধ্যবিত্তের লোভের ভাপে ঝাপসা শো-উইন্ডোর কাচ, গরিবের দিকে তাকিয়ে আমরা বলছি, ছ্যাঃ, তোর ‘ন্যানোতম’ পয়সাও নেই! বোধহয় ওই চালু বাজার-বাজার খেলতেই, যাঁর আগের ছবি ‘মিক্সড ডাবলস’ (যা ভয়ানক ভাল, পরিণত, সংযমী, স্বচ্ছানিচুস্বর কিন্তু— বা সুতরাং— ফ্লপ), সেই রজত কপূর তৈরি করলেন অখন্ডে, একঘেয়ে, ভোঁদা ফিল্ম ‘মিথ্যা’, যা কমেডি হবে না ট্রাজেডি হবে তা ঠিক করে উঠতেই ভেবে আকুল, এ দিকে সিনেমা চকিতে এক ঘরানা থেকে অন্য ঘরানার লেনে ক্রি-ই-ই-চ টার্ন নিয়ে ঢুকে পড়বে, সে কায়দাবাজ স্টিয়ারিং রজতবাবুর অনায়ত্ত। স্ক্রিপ্ট অতি খারাপ, মেদ-থলথলে, এক-দু’টির বেশি বুদ্ধিদীপ্ত পরিস্থিতি/সংলাপ খুঁটে মিলবে না, কমেডি যেথা দু’ফোঁটা দিলে হয় সেখানে আধশিশি উপুড়ে ছেতরে লাট, নাসিরুদ্দিনকে অবধি ভাল লাগে না এমন ঘোলাটে মেজাজ রচিত! গল্প তো আদ্যিকালের, কুরোসাওয়া-র ‘কাগেমুশা’ হতে বচ্চন/শাহরুখের ‘ডন’ অবধি বইছে: এক আলাভোলা লোক দেখতে হব্ব বাঘা ডন-এর মতো, ডন-কে মেরে তাকে ওই জায়গায় ঢুকিয়ে দেয় একটি গোষ্ঠী। এ বার অন্যের বউ-ছেলে-গ্যাং কী করে এ সামলায়, সে ক্রাইসিস সবে ঘনাচ্ছে, অ মা, লোকটি দোতলার বারান্দা থেকে আআআ পড়ে যায় ও ঝপাং মেমোরি লস। তখন অন্য সংকট (মূলত প্রেমপ্রীতি-জাত) এবং ছবি আবোদা প্যাসেঞ্জারের ন্যায় এই থ্রিলিং কামরা তো ওই ফিলিং। স্মৃতিভ্রষ্ট লোকটি কী ভাবে নতুন স্মৃতি ‘শিখে’ অন্য একটি মানুষ হয়ে ওঠে (এবং মিশে যায় নকলনবিশ ও প্রকৃত ব্যক্তি, ভান ও সত্য, কখনও এই দর্পণছায়া হয়ে ওঠে মূল কাহাটির অধিক আদরণীয়, পরিজন, এবং প্রশ্ন জাগে কী বা মিথ্যা এবং কে বলে সত্য কাম্যতর), তা যে মোচড়ে ও মুন্সিয়ানায় ধরা উচিত, তার সিকিও এ চিত্রনাট্যে সম্ভবে না, রণবীর শোরি-র গজা

অভিনয় তদুপরি বিষফোঁড়া। সাথে বলে, সত্য ভাল, অর্ধসত্য-ও ভাল, মিথ্যা নিতান্ত বিচ্ছিরি!



অন্য সকলে যখন নেকিয়ে ন্যাকার তুলছে, ভ্যালেন্টাইন'স ডে উপলক্ষে একটি চ্যানেল অনুষ্ঠান করল 'ভায়াগ্রা ক্রনিক্লস', যার এন্ড-টাইটলে একসঙ্গে ব্যবহার করা হল কবিতা আবৃত্তি নারীর শীৎকার ধ্রুপদী বাজনা, ভেতরে রইল কবিদের স্বকণ্ঠে প্রেমপদ্য পঠন, তেড়ে সাহসী সিনে-দৃশ্য ('বেসিক ইনস্টিংক্ট' থেকে তারকভস্কি-র 'স্যাট্রিফাইস'), পেন্টিং, পাশ্চাত্য সংগীত, রবীন্দ্রনাথের অবদমিত কাম বিষয়ে, অসহ ছটফট নিয়ে রবি-চিঠি থেকেই উদ্ধৃতি, ওকাম্পো-বয়ান থেকেও, অসম্ভব থরোথরো আলো ও মিত অথচ প্রখর ক্যামেরায় অনুষ্ঠানটি হল মনোযোগী, ব্যতিক্রমী, সপাট, কাম-কেন্দ্রিক ও শ্রেয়। হাজার সাবাস। কারণ প্রেম নিয়ে সহস্র আতুপুতু যখন আবেগটিকে প্রথার ছাঁকনি মেরে অ-শরীরী করে তুলেছে, গোলাপি হার্ট আর নীল খামের ভুড়ভুড়ি কেটে কফ তোলার ন্যায় ঘোয়াৎ উগরে যাচ্ছে ক্লিশে, তখন কারও অন্তত এই ধাস্টামি থেকে বেরিয়ে এসে বুক ঠুকে বলা দরকার ছিল, ভাই, চোখ ঠেরো না, শুধুই হৃৎপিণ্ড দপদপায় না, প্রবৃত্তিকে প্রেমের আবশ্যিক অঙ্গ হিসেবে মর্যাদা দিতে শেখো। প্রিয় শরীরের প্রতি ধকধকে কামনা ছাড়া প্রেম হল আমাশাখন্ধ বাঙালির নিরামিষ ঝোল, তার মানসঝোলও বলা যায়, এবং সে বাটিকে লাথ মেরে উন্টে দেওয়া শিখতেই হবে।

১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০০৮

র শো ম ন কে ম ন

শাহরুখ করছেন লড়ছেন জিতছেন আ মরি বং ভাষায়, অবিকল ‘ওম শান্তি ওম’-এর হরফছাঁদ টুকে দিচ্ছে বাংলা ছবির নামলিপি, হোর্ডিঙে তনুজা-কাজল-অজয় দেবগণ মিলে তিনাঙুল তুলে বলছেন, বংশানুক্রমে তিন জন করে নাচবে, জাজ তাঁহারা। নাচ তো আজি উদয়শংকরাতিত, সর্বব্যাপী ক্রাউডপ্ল্যাগী, একা ড্যান্সারে রঞ্জে নেই দু’টির জুটি ছাড়িয়ে অ্যাহম্পর্শ ভি, এমন দিন কি দূরে মা তারা যবে গোটা ফ্যামিলি প্লাস কাজের মাসি ন্যাতা হাতে যথাযথ হিলা কে ঝটকা না ঝাড়িলে পড়শিরা একঘরে করবে, তাম্রর পাড়া ভাসার্স পাড়া, কে শালা ফাইনালের দু’দিন আগে আমাদের নাচুনি বউদিকে ফুসলে নিয়ে গেলি র্যা লাশ ফেলুম, শেষে ইভো-পাক ঝিংকুচাক, তাল ফসকালে বর্ডারে থাক। এমনিতেই এক নেচো-প্রোগ্রামে অ্যাংকর-বাচ্চার শৈশবকে তুবড়ে দুমড়ে নিত্য তৈরি হচ্ছে অসহ্য অশালীন নিতম্বপাকামি, মধ্যবিত্তের হ্যালহালে আবোদা জিভে সে ফুর্তির কোটিং পড়ে ছ্যাবড়া। দোসর: হিটের বাবা চুটকি-আক্কেল, ভোঁতার ডিম স্ল্যাপস্টিক ও গোদা ভেংচিবাজি দেঁতোম্যাপে বিছিয়ে বাটাম, সঙ্গে অশিক্ষিতদের দ্বারা অশিক্ষিতদের জন্য অশিক্ষা উদযাপনে হাল্লাক সিরিয়ালসাঁই, প্লাস হাত ঘুরুঘুরু নির্বোধের নাড়্ সিনেমাসিল্ল। অবিশ্যি আঁতেলদের জন্যেও গুড খবর, মাল্টিপ্লেক্সে নাকি শীঘ্রই ফরাসি ফিলিম! অর্থাৎ আমাশা ভাল নেই তো জাস্ট হেঁটে গিয়ে ঠ্যাংভর্তি সাবটাইটেল আর মুন্ডুভর্তি এক্সপ্রেশন দেখে আসুন। ওয়াঃ, বসন্তকাল!

ইংরেজি ছবি এসেছে, ‘ভান্টেজ পয়েন্ট’। স্পেনে বক্তৃতা দিতে গিয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট গুলি খাচ্ছেন, বোমাও ফাটছে। তার পর সে ঘটনা দেখানো হচ্ছে আট জন আলাদা আলাদা মানুষের দৃষ্টিকোণ থেকে। ব্যস, পণ্ডিতগণ ‘এ কী রশোমনি’ বলে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। ‘রশোমন’ হল ১৯৫০-এ কুরোসাওয়ার তোলা খ্যাত জাপানি ছবি, যাতে একটাই ঘটনা দেখানো হয় চারটি ভিন্ন মানুষের দৃষ্টিকোণ থেকে। তার পর থেকেই, সেম কাণ্ডের বিবরণে বিবিধ নেত্রপাত ব্যবহার করেছ কি করোনি, সে ‘সুরজ কা সাতওয়াঁ ঘোড়া’ হোক বা ‘ভান্টেজ পয়েন্ট’, ক্রিটিকদের হেবি রশোমনকেমন শুরু। কিন্তু ভায়া, তফাত হ্যাজ, এবং তা বোঝা প্রখর জরুরি। রশোমনে আমরা দেখি একই ঘটনার চারটে সম্পূর্ণ আলাদা আলাদা বয়ান, এবং বুঝতেই পারি না কোনটা ঠিক কোনটা ভুল, এবং পরিচালক আমাদের এতদ্বারা বলেন: চুড়ান্ত ও অব্যয় সত্য বলে কিছু হয় না, সত্য আপেক্ষিক, এবং সুতরাং বিস্তারণ ঘটান। আর ‘সুরজ’/‘ভান্টেজ’-এ আলাদা আলাদা দৃষ্টিকোণ থেকে ঘটনা-সিরিজ দেখানো হয় বটে, কিন্তু তা ভিন্ন বয়ান তৈরির জন্য নয়, প্রতিটি দৃষ্টিকোণে নতুন নতুন তথ্য দিয়ে গল্পটাকে অভিনব স্টাইলে উন্মোচন করার জন্য। রামের বয়ানে যা

জানতে পারিনি, শ্যামের বয়ানে তা জানি, যদুর
 বয়ানে ফের একটি আড়ালের কথা আলোয়
 আসে। এবং শেষকালে সব বয়ানের টুকরোগুলো
 যোগ করে, ধাঁধার গোলা-উত্তরটি মহার্ঘ ফলের
 মতো করতলগত হয়। হেথা যে আখ্যানটি বলা
 হয়, তা একটি নির্দিষ্ট, স্পষ্ট, সরলরৈখিক,
 একমাত্রিক গল্প। অর্থাৎ, সত্য এক ও একমাত্র,
 ঘটনা দ্ব্যর্থহীন ভাবে একটাই, আমি শুধু তোমায়
 কখনও এ-দিকটা আলো ফেলে কখনও
 ও-দিকটা আলো ফেলে, কায়দা করে দেখালাম।
 যোগে, 'ভান্টেজ' খুব অন্য ভাবে তোলা থ্রিলার,
 টানটান, সুস্মার্ট, গাড়ি-চেজ গুলিগোলা সাসপেন্স
 মিলমশলা গুলেও অভিনব, পরতে পরতে চমক,
 নাগাড়ে দৃষ্টিকোণ-সার্বিক-এর চোটে আঁকবাঁক সাঁ-
 নাটকীয়: আগে তিন বার ঘটনাটা দেখে ফেললাম,
 আর এত ক্ষণে বুঝলাম স্টেজের তলায় মেয়েটা
 বোম রেখে গেছিল!
 শিল্পের সঙ্গে যৌনতার সম্পর্ক কুস্তমেলায়
 বিছড় যাওয়া যমজ ভাইয়ের ন্যায়। বিরুদ্ধ রতি,
 বিরুদ্ধ রতি, রতি-উচ্ছ্বাস, দুই রতির মধ্যে তেড়ে
 বিরতি— এ থেকে কত না সার্থক শিল্প ছিটকে
 নির্গত হয়ে আমাগো আকাশ ঝলিয়েছে ইয়ত্তা নেই,
 কিন্তু অস্ট্রেলীয় টিম



প্যাচ-কে দেখুন ও ধাঁ চক্ষু গোলাবড়া। তিনি তুলি নয়, অঙ্গুলি নয়, পুরুষাঙ্গ দিয়ে ছবি আঁকেন! রঙে পুরুষাঙ্গ ডুবিয়ে, তা ক্যানভাসে বুলিয়ে। খড়খড়ে ক্যানভাসে খানিক বাদে ছড়ে গেলে, কাগজে। ব্যাকগ্রাউন্ড রং করার সময় অবিশ্যি, নিতম্ব ঘষেন। যদিও নানা ‘সেক্সপো’-তে হাজির, ছবিমাত্রে কিন্তু যৌনতালিপ্ত নহে, উঁহ, উনি আঁকেন বুশ, ব্লেয়ার, মেলামানুষের পোর্ট্রেট, নিসর্গচিত্র। হ্যাঁ, ফিমেল ন্যুড-ও। ভাবুন, পুরুষাঙ্গ দিয়ে নগ্ন নারী আঁকার চেয়ে সৎ প্রোজেক্ট আর কী?

বিশ্বখ্যাত পরিচালক মাইকেল হ্যানেকে নিজেরই ছবি ‘ফানি গেমস’-এর রি-মেক করলেন। দশ বছর আগের জার্মান ছবি দেখে হলিউড-রিমেকানুমতি নিতে যান প্রযোজক, হ্যানেকে বলেন, ধুর, আমার ছবি আবার কে করবে? আমিই করব। বখেড়া: তিনি করলেন মূল ছবিটার ‘শট বাই শট রি-মেক’। মানে, একদম পুরোপুরি ছব্ব অবিবল আগের ছবিটাই, শ্রেফ ভাষা ও অভিনেতা আলাদা। পূর্বছবির স্টিল দেখে দেখে প্রতিটি শট নেওয়া হল! সব মিলিয়ে নয়া ছবি মূল ছবির চেয়ে ১৫-২০ সেকেন্ড আলাদা। এ জেরক্সবাজির মানে কী? নিজছবি না বদলালাম না উন্নত করলাম, শ্রেফ নিজেকে টায়েটায়ে টুকলিফাই? এক চিত্রনাট্য এক ক্যামেরাকোণ এক কস্টিউম এক দেওয়ালে এক সংখ্যক গল্ফ-লাঠির এক ঠেস! হ্যানেকে বিরাট পরিচালক, তাঁর ছবি গ্রহ জুড়ে পরিচিত, গুচ্ছ পুরস্কার ব্যাগে, এ ছবিও আলোড়ন-ফেলা, নতুন করে হলিউড-হিট পেয়ে তাঁর কী শিং গজাবে? তদুপরি ওঁর ছবির যা ধাঁচ, বাপের জন্মে পপুলার হওয়ার নয়। যাকে বলে কাষ্ঠ-আর্ট ফিলিম। হ্যানেকে সমাজে হিংসা ও গণমাধ্যমে তার উপস্থাপনা নিয়ে বহু ছবি করেন, তাঁর আর এক ফোকাস: অ-কারণ হিংস্রতা। ‘ফানি গেমস’-এ দু’টি ছেলে সম্পূর্ণ অচেনা এক পরিবারকে (মা-বাবা-বাচ্চা) ২৪ ঘন্টা ধরে অসম্ভব অত্যাচার করে, খুন করে। এবং এ তারা করে কোনও মোটিভ ছাড়াই। টর্চারখেলাটির হাড়হিম-ভয়াবহতা থকথকে রঙে নহে, এখানে: এ পিশাচকাণ্ড তারা করছে টাকার জন্য নয়, প্রতিশোধের জন্য নয়, সেক্সের জন্য নয়। কিচ্ছুর জন্য নয়। এমনি। ইচ্ছে করছে। মজা। এই ব্যাখ্যাতে ভায়োলেস চরিত্রদের, এবং আমাদের, হাঁটু নড়বড়ে করে দেয়। যে কোনও শিল্পে আমরা একটা কার্য-কারণ সম্পর্ক খুঁজি, একটা ‘মানে’, একটা ভরকেন্দ্র, যা থেকে এই গোটাটা উৎসারিত ও যা গোটাটাকে রাঙিয়ে রেখেছে, তা না পেলে আমাদের প্রচণ্ড উসখুস জাগে, চুলকুনি বাড়ে। হ্যানেকে সে অস্বস্তি রেলিশ করে জিইয়ে রাখেন, মুহূর্মুহ আত্মতি দেন। সেই লোক হঠাৎ মার্কিন দলে ভিড়ে নিজের ছবির অধিক বাজারচলন চাইবেন, এবং ফ্রেম বাই ফ্রেম রিপ্রে ভজবেন, ভাল ঠেকে না। এর চেয়ে সাবটাইটেলগুলো বড় ও উজ্জ্বল হরফে টাইপ করে দিলে হত না, বস?

‘মাইকেল ক্রেটন’ থ্রিলার, কিন্তু ছবিতে গোড়া থেকে বিকোয়: এটি আদ্যন্ত সিরিয়াস, পূর্ণ তারল্যবর্জিত, এবং এ যুগের হলিউডেও, তা হতে ন্যূনতম লজ্জিত নয়। গোটা ফিল্মে ছটাক প্রেম নেই, যৌনতা নেই, ক্যামেরাচাপল্য নেই, ঠাস ডায়লগে ছাড় নেই। কথা, কথা, কথায় ভর্তি। আমাদের চলতি বাজারদুরস্ত ফিল্মবোধে অমনোযোগের প্রশ্রয়

চমৎকার, কথা শুনে বুঝে ভাবতে হলে মেজাজ ঝুঁকি চড়ে যায়, হেথা তো কেতাব-রিডিং শুনতে আসিনি, প্রধান সিনেমানুষ সত্যজিৎও ভাবতেন, কথাসর্বস্ব সিনেমা নিজ মাধ্যমের অঙ্গগুলোকে পূর্ণ ও ঠিক ব্যবহারই করছে না, তাকে বলতে হবে ছবি দিয়ে, ক্যালরব্যালর ফলিয়ে নয়। কিন্তু মাধ্যমটির নানাবিধ অঙ্গ ব্যবহারের মতো অ-ব্যবহারেরও স্বাধীনতা শিল্পীর আছে, এবং ‘কী করিতে হইবে’ ম্যানুয়ালকে খাবড়ে ‘সিনেমা তুমি যত রকম ভাববে তত রকম’ এ স্পর্ধা-চিরকুটসহ অমোঘ বাণ ক্যামেরায় গেঁথে থরথরায়। ফিল্মটির বিষয় পুরনো: টাকা ভাস্কাস মানবিকতা, মানুষ মেরে দুরন্ত মাইনে না কি মানুষের জন্য ঝাঁপিয়ে অপমান দারিদ্র এমনকী খুন হওয়া। দু’এসকালেটর যেমন পাশাপাশি কিন্তু হইহই-বিপরীত, দুই বন্ধুচরিত্র দর্শনে উন্টোবাগ, কিন্তু শেষে নকশি কাঁথায় ঈশ্বরের আগুনে-ফোড়: ব্রতী বন্ধুটি বেঘোরে কোতল, তাঁর স্মৃতিস্বে ধকাস জ্বলে ওঠে বিধাবিহিতের পাঁজর।



উত্তমমাধ্যম শেষ হয়ে গেল। না, ডুকরে উঠবেন না। পথের পাঁচালী-তেও ‘সমাপ্ত’ ভেসে ওঠে, খেলেনাদোকানে নেমে আসে অবধারিত শাটার। বরঞ্চ যাঁরা ‘যাআআক বাবা, টোটাল দুর্বোধ্য, গিমিকপ্রবণ, ভাষাজাগলিং-এর স্বফাঁদে ধঁধে বক্তব্য ভাসান দেওয়া তেএঁটে কলাম এন্তেকাল লভিল ওয়া ওয়া’ পুলক চাখছেন, তাঁদের তুরীয় স্বস্তি আন্দাজ করুন। উঠি তা হলে। সবাই আমোদে থাকবেন। ইদিক থেকে বিদায়বেলায় কিঞ্চিৎ হাতনাড়া ও হিহিহোহা, ব্র্যাকেটে ফুঁপিয়ে।

১৬ মার্চ, ২০০৮

আনন্দবাজারের রবিবাসরীয়
ক্রোড়পত্রে নিয়মিত প্রকাশিত এই
কলাম শুধু শিল্প-সমালোচনা নয়, এক
অন্য মনোভঙ্গি। সপ্রতিভ, ঝলমলে,
পরোয়াহীন, পারঙ্গম। ‘পরোয়াহীন’
দু’বার লিখলে ভালো। চারপাশে
মধ্যমেধার উত্তাল চাষবাসের মধ্যে
এমন একটি ধারালো শস্ত্র প্রয়োজন
ছিল, উত্তম ও মধ্যমের জরুরি তফাত
কাঁটা বেছে দেখিয়ে দেওয়ার জন্যই।
লেখাগুলির মূল বৈশিষ্ট্য—চলনসই,
ল্যাঙ্গুয়েজ বা ভানসর্বস্ব শিল্পের ত্রুটি
ঠিক কোথায়, তা প্রখর যুক্তি প্রয়োগে
শনাক্তকরণ ও ব্যবচ্ছেদ। সাধারণ
বাংলা রিভিউ বলতে আমরা বুঝি
ছবির/নাটকের গল্প-বর্ণন ও তার পর
সমালোচকের কিছু ব্যক্তিগত দেয়াল।
কিন্তু এই কলাম নিন্দা বা প্রশংসায়
অকুণ্ঠ থেকেছে বরাবর নিজমতের
সমর্থনে টায়ে-টায়ে যুক্তি পেশ করে। এ
শিক্ষিত ঠাট নিতান্ত বিরল। এবং এই

স্পষ্ট ও নির্দিষ্ট অঙ্গুলি নির্দেশের ফলে
লেখা-সিরিজে নির্ণীত হয়েছে
(সমালোচকের মতে) আধুনিক ও
সার্থক শিল্পের উচিত-লক্ষণগুলি।
লেখার পরিধি চলচ্চিত্র, টিভি-অনুষ্ঠান,
নাটক, বিজ্ঞাপন, কমিক্স পার হয়ে
জটিল ও জরুরি তত্ত্বের চৌকাঠে গেছে,
টাল খেয়েছে সামাজিক সংস্কৃতির
দিকেও। বার বার যে কোনো
রক্ষণশীলতার ঘোঁটি ধরে নেড়েছে।
বাকস্বাধীনতার পক্ষে, যৌনস্বাধীনতার
পক্ষে ঝান্ডা প্রোথিত করেছে। খর বুদ্ধি
ও তীব্র প্যাশন—এই দুই অশ্ব এর রথ
টেনেছে। এ লেখার গদ্য সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র
ও অনাস্বাদিতপূর্ব, কিন্তু তা তো
অলংকারের আখ্যান। এর আত্মায় ধরা
রইল এক নির্দিষ্ট সময়ের বহুরং প্রবণতা
ও তার নাছোড় বিশ্লেষণ। আর
বাজারসই মধ্যমান-কে কিছুতেই মান
না-দেওয়ার পবিত্র জেহাদ।

